মসলিন যুদ্ধের ইতিহাস

প্রশান্ত ঘোষ

সাহিত্যশ্রী
৭ ৩ মহাত্মা গান্ধী রোড ❑ কলকাতা -৯

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ❑ ২০০২
অগ্রহায়ণ ❑ ১৪০৯

প্রকাশক
শ্রীতপনকুমার ঘোষ
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

অক্ষর বিন্যাস
শ্রীঅশোক নাগ
আর্ট এণ্ড প্রিন্ট ক্রিয়েশান
৯০ বলরাম দে ষ্ট্রীট
কলকাতা-৬

মুদ্রাকর
শ্রীশ্যামল সাউ
দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন
কলকাতা -৬

আমি যাঁকে জ্ঞানে দেখিনি। সেই
আমার মহীয়সী জননীর প্রতি
শ্রদ্ধাঞ্জলী

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

নতুন যুগের ভোরে

সংঘাত

অমানুষের শেষ প্রহর

মনখুশির লাশ

দেশপ্রেমিক নিধন

গোলামী মুক্ত জীবনের সন্ধানে

পাণ্ডুয়ার ইতিহাস

সপ্তগ্রাম সভ্যতার ইতিহাস

ভূমিকা

বাংলার তাঁত শিল্প ও শিল্পীদের খ্যাতি এক সময় সারা ভারতবর্ষে এমন কি দেশের বাইরেও বিস্তৃতি লাভ করেছিল। বিশেষতঃ মসলিন বস্ত্রের প্রসিদ্ধি ছিল বিশ্বজুড়ে। যে হস্তচালিত তাঁত বস্ত্রের ভুবন জুড়ে এত খ্যাতি সেই শিল্পের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত শ্রমিকদের জীবন-যন্ত্রণার, তাদের কান্না-ঘাম-রক্তঝরা দিনগুলির কাহিনীর কথা খুব কমই শোনা যায়। সে যুগে বাংলার প্রতিটি পল্লীর প্রতি ঘরে তাঁত বস্ত্র প্রস্তুত হতো। তাঁত বস্ত্রের কৌলিন্য কাহিনীর পাশাপাশি শোষণ-বঞ্চনার আর তাঁতীদের বিদ্রোহ কাহিনীর ইতিবৃত্তের কিছু হদিস পাওয়া গেছে 'কটন উইভার্স ইন্ বেঙ্গল' (লেখক ডঃ ডি. বি. মিত্র) গ্রন্থে। তাছাড়া কোলকাতার কলেজ স্ট্রীট সংলগ্ন ভবানী দত্ত লেনে অবস্থিত 'রাজ্য লেখ্যাগার' গ্রন্থাগারে ও গবেষণা কক্ষে কিছু প্রামাণ্য নথি মিলেছে। জাতীয় গ্রন্থাগার এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারে সযত্নে রক্ষিত কিছু অমূল্য গ্রন্থের মধ্যেও মসলিন বস্ত্র তৈয়ারি এবং তাঁতীদের জীবনের ইতিহাস নিয়ে চর্চা ও অধ্যয়ন করার সুযোগ গ্রহণ করেছি। এসবেরই ফসল এই গ্রন্থখানি।

ব্রিটিশ আমলেই বাংলার গৌরব তাঁত শিল্পের সর্বনাশ সাধিত হয়। মুঘল যুগে বা বাংলার নবাব আলিবর্দীর আমলে তাঁতীরা গ্রাসাচ্ছাদনের যে সুযোগ লাভ করতো বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর এই সুযোগটুকুও তারা হারালো। বিদেশী বেনিয়াদের এই শিল্প ও শিল্পীদের প্রতি কোন বাড়তি দরদ ছিল না। যা দরদ ছিল তা মুনাফার স্বার্থে। বণিককুলের ভয়ঙ্কর লোভ তাঁত শিল্পের নাভিশ্বাস ডেকে আনে। অত্যাচারের ভয়ে তাঁত শিল্পী বা তাঁত শ্রমিকরা নিজেদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নিজেরাই কেটে বাদ দিয়ে দিত যাতে তাদের তাঁত বুনতে আড়ংয়ে যেতে আর না হয়। আবার ইংরাজরাও জোর করে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কেটে দিত যাতে শ্রমিকরা ফরাসী, ওলন্দাজ বা দিনেমারদের ডাকে চলে না যায়। ইতিহাস বলে ইংরেজ আর পর্তুগীজ ছাড়া অপরাপর বেনিয়ারা তাঁতীদের উৎপন্ন বস্ত্রের ন্যায্য দাম দিত। তাছাড়া হুকুম মাফিক সরবরাহ না করার জন্য তাদের বেত্রাঘাত সহ্য করতে হতো। ইংরাজ বণিক আর তাদের দালাল, মহাজন-পাইকারদের হাতে থাকতো

সর্বদা কাঁটা যুক্ত বেত। বেত্রাঘাতে জর্জরিত করা হত তাঁতীদের। এইসব অত্যাচার আর বিভিন্ন সময়ে ভয়াবহ মন্বন্তরের ফলে তাঁত শিল্পীরা ভিটাচ্যুত হয়ে পড়ে। বাংলার কৃষকদের প্রতি ইংরাজরা ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের সূত্রপাতকালে যে মনোভাব পোষণ করতো সেই একই মনোভাব ছিল গ্রাম বাংলার তাঁতীদের প্রতিও। তাঁতীদেরকে কৃষক থেকে পৃথক করে দেখা হতো না। কৃষকরা বিভিন্ন সময়ে বাংলার বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় যে ভাবে বিদ্রোহে ফেটে পড়তো সেই সব কৃষক বিদ্রোহগুলিতে তাঁতীরাও অংশগ্রহণ করতো। কৃষক-বিদ্রোহগুলির ইতিহাস যতটুকু জানা যায় তাঁতীদের বিক্ষোভে ফেটে পড়ার কাহিনী ততো শোনা যায় না। এই গ্রন্থটি রচনায় লেখক হিসাবে আমাকে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হয়েছে।

'মসলিন যুদ্ধের ইতিহাস' পাঠে পাঠকগণ যদি আরও উৎসাহিত হন, যদি হতভাগ্য চরম দারিদ্রে নিষ্পেষিত, হতদরিদ্র অতীতের সেই তাঁতী পরিবারগুলোর প্রতি চোখের জল নয়, কিছু সহানুভূতি এবং মমত্ব প্রকাশ করেন তবেই আমার পরিশ্রম সার্থক হবে। বর্তমান কালে সেই হতভাগ্য তাঁতী পরিবারগুলোর পরবর্তী প্রজন্মের প্রতি আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। আরো যত্নবান হতে হবে, বিশেষ সন্ধান চালাতে হবে।

সি. আই. টি. ইউ. পশ্চিমবঙ্গ কমিটির মুখপত্র 'শ্রমিক-আন্দোলন' পত্রিকার ডিসেম্বর ১৯৯৯ সংখ্যা থেকে পরপর দশটি সংখ্যায় 'মসলিন যুদ্ধের ইতিহাস' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এতে গ্রন্থটির অর্ধেক অংশ প্রকাশিত হয়েছে। বাকী অংশটি নিয়ে সমগ্র গ্রন্থটি প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অধ্যাপক কৃপা রুদ্র ধারাবাহিক পাঠে আমাকে বরাবরই উৎসাহিত করে গেছেন। তাঁকে এজন্য ধন্যবাদ।

বর্তমান কালে উদারনীতি ও বিশ্বায়নের যুগে হস্তচালিত তাঁত শিল্প ও শিল্পীরা অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম করে চলেছে। অতীত কালের শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস পাঠ বর্তমান প্রজন্মকে আশাকরি অনুপ্রাণিত করবে। পরিশেষে প্রকাশক 'সাহিত্যশ্রী'-র কর্ণধার শ্রীতপনকুমার ঘোষকে ধন্যবাদ জানাই তিন মাসের মধ্যে অসাধ্য সাধন করার জন্য।

পাণ্ডুয়া
২৫/০৬/২০০২

(প্রশান্ত ঘোষ)

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আক্ষেপ করেছিলেন, বাঙ্গালীরা ইতিহাস বিস্মৃত। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ মন্তব্যটি বিতর্কিত হলেও 'মসলিন যুদ্ধের ইতিহাস' পুস্তক প্রসঙ্গে মন্তব্যটি প্রাসঙ্গিক। অতীত ইতিহাস বর্তমান সময়ের ঘটনাবলীকে বুঝতে সাহায্য করে একই সঙ্গে ভবিষ্যতের পথনির্দেশক। বাংলা ভাষায় অদ্যাবধি বেশীর ভাগ ইতিহাস রাজা-বাজড়াব কাহিনী নিয়েই রচিত হয়েছে। অতীতে বাংলার শ্রমিক কৃষকের চরম দারিদ্রে নিষ্পেষিত হওয়ার ইতিহাস, তাদের উপর ধনীক শ্রেণীর, জোতদার, জমিদার, শোষকদের অমানুষিক অত্যাচারের ইতিহাস, এবং ঐ শোষণ, অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিষ্পেষিত শ্রেণীর সংগ্রামের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা খুব কমই হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনের আমলে নীলচাষীদেব উপর শোষণ অত্যাচারের কাহিনী দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পন উপন্যাসে লিপিবদ্ধ আছে। 'মসলিন যুদ্ধের ইতিহাস' বইতে বাংলার তাঁতী, রেশমচাষী এবং তাঁতশ্রমিকদের অবর্ণনীয় দুর্দশার কাহিনী এবং তাদের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের কাহিনী রচনার এই প্রচেষ্টা মহৎ।

'মসলিন যুদ্ধের ইতিহাস' বইটি রচনা শ্রীপ্রশান্ত ঘোষের নিঃসন্দেহে একটি সাহসিক প্রচেষ্টা যা প্রশংসার দাবী রাখে। বর্তমান যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চোখ ধাঁধানো অগ্রগতির প্রভাবে অন্যান্য অনেক কিছুর সাথেই ইতিহাস চর্চ্চা বা অতীতকে জানার আগ্রহ অনেকাংশে শিথিল। আর্থিক অগ্রগতির আশায় আমরা প্রত্যেকেই কমবেশী ইঁদুর দৌড়ে ব্যস্ত, এমত অবস্থায় শ্রীপ্রশান্ত ঘোষের 'মসলিন যুদ্ধের ইতিহাস' বইটি লিপিবদ্ধ বাংলার তাঁত বস্ত্রের গৌরবজ্জ্বল দিনগুলি, ঐ শিল্পের সাথে যুক্ত তাঁতী এবং তাঁত শ্রমিকদের শোষণ বঞ্চনা এবং তাদের রক্ত ঝরানো সংগ্রাম পাঠকগণকে উদ্দিপীত করবে বলেই আশা রাখি। লেখক বহুবিধ রচনা, ইতিহাস, মহাফেজখানা থেকে সংগৃহীত তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করার প্রয়াস পেয়েছেন এবং সেগুলিকে পর্যায়ক্রমে বইটির বিভিন্ন অংশে সুচারুরূপে সংযোজন করেছেন। বইটিতে বাংলার রেশমশিল্পের বিকাশ (মোগল আমলে এই শিল্পের চরম বিকাশ লাভ করে), পর্তুগীজসহ বিদেশীদের ভারতে আগমন এবং

এই শিল্প এবং তার বাজার দখলের ইতিহাস, ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের ঝাপটায় এই শিল্পের মৃত্যুঘন্টা, রেশম চাষী এবং রেশম শিল্প শ্রমিকদের উপর দেশী বিদেশী প্রভুদের আবর্ণনীয় অত্যাচার, বিশ্বব্যাপী রেশম বস্ত্রসম্ভারের বাজার দখলের জন্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির লড়াই, লেখক তত্ত্ব ও তথ্য সহযোগে বইটিতে উপস্থাপিত করেছেন। লেখক বইটিতে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে এবং তার কুফল, দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ান এডমন্ড বার্কের ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টের উচ্চসভায় বাংলার মসলিন শিল্পের দুর্দশা এবং তার সাথে জড়িত চাষী ও তাঁত শ্রমিকদের উপর ব্রিটিশ শাসকদের অমানবিক বীভৎস দৈহিক অত্যাচারের বিবরণ (তথ্যসহ) যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে। শ্রীপ্রশান্ত ঘোষ রচিত 'মসলিন যুদ্ধের ইতিহাস' গ্রন্থটিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষ ভাগে বাংলা দেশের তন্তুবায় শ্রমিকরা বাঁচার আকাঙ্খার যে আন্দোলন শুরু করেছিল তা যে সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনেরই অনুরূপ, তা প্রমাণিত হয়েছে।

শ্রীপ্রশান্ত ঘোষ, একজন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী, শ্রমিক কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ আছে। সেই অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে তিনি শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গীর নিরিখে এই পুস্তকটি রচনা করেছেন। 'মসলিন যুদ্ধের ইতিহাস' রচনার প্রচেষ্টা পাঠককূলে সমাদৃত হবে এবং বাংলার বিস্মৃত প্রায় এক বিরাট আর্থসামাজিক ঘটনা নতুন প্রজন্মকে অতীত বাংলার শ্রমজীবিদের সংগ্রামের সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করতে সাহায্য করবে।

(চিত্তব্রত মজুমদার)
১. ৯. ২০০২

মসলিন যুদ্ধের ইতিহাস

বাংলার সুপ্রাচীন হস্তচালিত তাঁতশিল্প আজ ভয়ঙ্কর সঙ্কটের মুখোমুখি। স্বাধীনতা প্রাপ্তির সুবর্ণ জয়ন্তী বছরে এবং তারপরে এই গৌরবমণ্ডিত শিল্পটির যে ছন্নছাড়া দশা ঘটেছে তা সবার জানা নাও থাকতে পারে। যাঁরা নানা উন্নত মানের তাঁত-সিল্ক বা সুতিবস্ত্র পরিধানে অভ্যস্ত তাঁরা কি জানেন একটি সিল্ক বস্ত্র উৎপাদনে কত শ্রমদিবস ব্যয় হয় আর তার জন্য শ্রমিক কত রোজগার করে। কি নিপুণতার সঙ্গে কি বিরাট ধৈর্য অবলম্বন করে শ্রমিককে এক নাগাড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁত কামানে বসে কাজ করতে হয় তার খবর কে রাখে? এই শিল্পের নাভিশ্বাস ওঠার মূলে শোষণ ব্যবস্থা। তার ভিত্তি এত দৃঢ় হ'লো কি ভাবে? অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত উত্তর হ'লো এই রাজ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারত আগমনের পরবর্তী ঘটনাবলীই তার কারণ। 'ফ্রি মার্কেট' বা মুক্ত বাজার অর্থনীতির দাপট তো ইদানীং কালের ঘটনা নয়। ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর শুরু থেকেই ইউরোপের স্পেনীয়, পর্তুগীজ, ডাচ্ বা ওলন্দাজ, ফরাসী এবং ইংরেজরা এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের দেশে বাষ্পীয় জাহাজ যোগে বাজার দখলের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে। নিজেরাই আবিষ্কার করে দেশগুলো। ইউরোপের বণিকরা বিদেশে পাড়ি দেবার পূর্বে সেই সব দেশের রাজামহারাজারা বিপুল অর্থ ব্যয় করে পর্যটকদের পিছনে। বিশ্ব ভ্রমণকারী এবং বিভিন্ন দেশ আবিষ্কারক এই সব পর্যটকগনের পর্যটনের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় রসদ, লোক লস্কর, জাহাজ, যন্ত্রপাতি রাজারাই বহন করতো। নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার ক'রে যাবতীয় তথ্যানুসন্ধান পর্যটকরা রাজার হাতে তুলে দেন। এরপরেই ইউরোপের দেশগুলোর বণিকরা রাজার অনুমতি নিয়ে নব্য আবিষ্কৃত দেশের রাজার সাহায্য গ্রহণ করে সেই দেশে অবাধ বাণিজ্য করার অনুমতি চায়। অনুমতি লাভও করে।

এশিয়া মহাদেশের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বাজার ছিল হিন্দুস্থান। তার মধ্যে আবার 'বেঙ্গলা' বা বাংলা। বাংলার মধ্যে চাটগাঁ, সাতগাঁও এবং ঢাকার সোনার গাঁ, জঙ্গলবেরী পরবর্তী কালে হুগলী। বাংলায় ছিল কাঁচামালের প্রাচুর্য্য। কি খাদ্যশস্য, কি বাণিজ্যিক শস্য বিভিন্ন উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মসলিন বস্ত্র ও সুতী বস্ত্র বা হস্তচালিত তাঁতশিল্প। তৎকালীন যুগে তাঁতী পরিবারের মধ্যে হস্তচালিত তাঁতবস্ত্র উৎপাদনই ছিল

প্রধানতম জীবিকা। তাঁতবস্ত্রের বাণিজ্যকেন্দ্র রূপে খ্যাতি ছিল ঢাকা, মালদা, চন্দননগর, শান্তিপুর, সোনামুখী ও হুগলী জেলার বহু শহর ও গ্রাম। তখন তন্তুবায়ীদের মধ্যে ছিল নিজেদের উৎপন্ন বস্ত্র-সম্ভার বিক্রয়ের জন্য অবাধ প্রতিযোগিতা, উৎপন্নবস্ত্র উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর করবার জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা। তাঁত শিল্প মধ্যযুগে এত গরিমাময় হয়ে ওঠে যে, যারা কখনও এই শিল্পে বা ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রবেশ করেনি তারাও সেই সব প্রক্রিয়ায় আত্মনিয়োগ করতে আরম্ভ করে। বাংলার প্রতিটি গ্রামের ঘরে ঘরে বা পরিবারের কেউ না কেউ সুতিবস্ত্র, সিল্ক-মসলিন, জামদানী তাঁতবস্ত্র উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিল। বাংলার ঘরে যখন মসলিনবস্ত্র হস্তচালিত তাঁতে প্রস্তুত হচ্ছে তখন ইংলণ্ডের তাঁতীরা তাঁত চালাতে সবে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে।

তাই ইংলণ্ড, স্পেন, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, পর্তুগাল, গ্রীস প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশে বাংলার হস্তচালিত তাঁত বস্ত্রের বিপুল চাহিদা। ইংলণ্ডের রাজা-রাণীরা বাংলার ঢাকা, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি নগরীর বাজার থেকে প্রেরিত বণিকদের সংগৃহীত মসলিন বস্ত্র নিজেদের ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখতেন। দিল্লীর বাদশাহ পরিবারের জন্য এবং পাটনা ও মুর্শিদাবাদের নবাব, বেগমদের জন্য তৈরী হতো বিশেষ যত্নসহকারে ঢাকাই মসলিন (Mulboos Calls) 'মলমলখাস' নামক বিখ্যাত বস্ত্র। বাদশাহ এবং নবাবদের হারেমের মহিলাদের জন্য বিশেষ ভাবে প্রস্তুত 'মলমলখাস' জমা হতো 'খাস কুঠি'তে (Suddar Malboos Calls Cooties)। বেগম নূরজাহানের অত্যন্ত প্রিয় পরিধেয় ছিল ঢাকায় প্রস্তুত মসলিন বস্ত্র এবং মালদার সিল্ক। বাদশাহের সভা (Imperial Court) মন্তব্য করে ঃ—"Such as cannot be imitated"! যার অর্থ কোন ভাবেই নকল করা অসম্ভব।

'সুদ্দর মালবুস খাস' বস্ত্রটি তৈয়ার হতো ঢাকার সোনার গাঁ, কিশোরগঞ্জ, বাজিপুর, আবদুল্লাপুর ছাড়াও তেজগাঁ এবং হুগলীর সপ্তগ্রাম, ধনিয়াখালি, বেগমপুর, রাজবলহাট, খানাকুল, হরিপাল প্রভৃতি স্থানে। এই সব এলাকায় বিরাট বিরাট গঞ্জও অবস্থিত ছিল।

'মালবুস খাস' মসলিন বস্ত্রটির তানায় সুতা থাকতো ১৮০০-২০০০ কাউন্ট পর্যন্ত। এর ওজন এত সামান্য হতো যে আঙ্গুলের অঙ্গুরীর মধ্য দিয়ে একখানা সম্পূর্ণ বস্ত্র টেনে অনায়াসে বার করে নেওয়া যেতো।

'সরকার আলি' নামক মসলিন বস্ত্রটি একমাত্র মোগল-বেগমদের জন্য ছিল নির্দিষ্ট। অন্য কোন ব্যক্তি যিনি পদমর্যাদাসম্পন্ন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হলেও তা পরিধানের অধিকার ছিল না। সম্রাট ঔরঙ্গজেব একদিন কন্যা জেবউন্নিষার অন্দরমহলে প্রবেশ করতে গিয়ে চমকে ওঠেন। দ্বারের সম্মুখে পর্দায় টান দিয়ে দেখেন কন্যা সম্পূর্ণ অনাবৃতা। এইরূপ পরিস্থিতিতে আবরণহীন কন্যাকে বস্ত্র পরিধানের নির্দেশ দিয়ে বাদশাহ দ্বারের বাহিরে অপেক্ষা করতে থাকলে কন্যা বিনীতভাবে পিতাকে জানান যে, তিনি সাতখানি বস্ত্র পরিধান ক'রে আছেন। এগুলো সবই ছিল ঢাকার তন্তুবায়ীদের দ্বারা প্রস্তুত মসলিন বস্ত্র।

'ঝিন-ঝুনা' ছিল 'ঝিন্নি মালবুশ খাস' নামে অপর একটি ঢাকাই মসলিন বস্ত্র। নির্দিষ্ট ছিল দিল্লী, অযোধ্যা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানের বাদশাহ ও নবাব পরিবারের নর্তকীদের ব্যবহারের জন্য। মহলের গায়িকারাও পরিধান করতো এই মসলিন।

ঢাকার জঙ্গলবেড়ী গ্রামে প্রস্তুত হতো 'জঙ্গল খাসা' মসলিন বস্ত্র। 'খাসা'র অর্থ 'উত্তম'। মসলিন 'আররোয়া' জলে নিক্ষেপ করলে বস্তুটি অদৃশ্য হয়ে যেতো। এত সূক্ষ্ম বস্ত্র উৎপাদন সম্ভব করতো পরিশ্রমী অতিদক্ষ অভিজ্ঞ তাঁত শ্রমিকবা। 'আর' এর অর্থ ভাল এবং 'রোয়া'র অর্থ 'প্রবাহ'। কুড়ি × দেড়গজ ঐ কাপড়ের ওজন সাড়ে দশ আউন্স। 'তানা'য় সুতার পরিমাণ সাতশ কাউন্ট (৭০০ কাঃ)।

মসলিন 'সুরনাম' (ঊষাব নীহার) বা 'সবনাম' (সান্ধ্য শিশির) অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র। দিবালোকে দুর্বাঘাসের ওপর বস্ত্রটি বিছানো হলে কিছুই দেখা যেত না। মসলিন 'নয়নসুখ' এর জনপ্রিয়তা ছিল তুঙ্গে। মোগল সম্রাট আকবরের বিখ্যাত সভাসদ আবুল ফজল এই মসলিনের নামকরণ করেছিলেন 'তনসুখ'।

মসলিন জামদানীর নামডাক ছিল আকাশচুম্বী। জামদানীব কয়েকটি শ্রেণীবিভাগ ছিল। যেমন (১) শুভ্র জমির ওপর ফল ও চিত্রকাটা। (২) রেশমের সাহায্যে ফুল ও চিত্র অঙ্কন। (৩) বিভিন্ন বর্ণের ঊর্ণার সূতায় ফুল কাটা। সাধারণতঃ তাঁত শ্রমিক পরিবারের মহিলা শিল্পীরা নিয়োজিত থাকতো জামদানী মসলিন তৈয়ারী করতে। বিভিন্ন প্রকার ঝুলেব জন্য জামদানীব নামকরণ করা হয়েছিল বিভিন্ন প্রকার। যেমন পান্না বজার, আগরদানা, গুলবদন, গোলবাতান, দুবলীজাল, আনারকলি, আলবাল্লা, তঞ্জাব, সুরবতী, হাস্মাম, বদনখাসা ইত্যাদি। জামদানী মসলিন প্রস্তুতে দক্ষ শ্রমিকরা এর জনপ্রিয়তার মূল্য ও বাজারের জন্য নিজেবা আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হযে উঠতো। বাংলা প্রদেশের সর্বত্রই মসলিনবস্ত্র প্রস্তুতে দক্ষ তাঁত শ্রমিকরা থাকলেও দুনিয়াজুড়ে খ্যাতি ছিল ঢাকার সোনার গাঁ ও জঙ্গলবেড়ী গ্রামে প্রস্তুত জামদানী মসলিনের।

ইংরেজ বণিকরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ছত্রছায়ায় মসলিন বস্ত্র তৈয়ারী করার প্রতি বিশেষ জোর দিত। কারণ তারা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই ভারত সম্রাটের কাছ হতে এবং পাশাপাশি অযোধ্যা, পাটনা ও মুর্শিদাবাদের নবাবেব কাছ হতে বিনা শুল্কে মসলিন বস্ত্রাদি ক্রয় এবং নিজ দেশে রপ্তানি বাণিজ্যের সনদ আদায় করে নিয়েছিল। বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ফরাসী বণিকদের মধ্যে অনেক সংঘর্ষ ঘটে যায়। ইংরেজরা এজন্য নিজেদের দেশের পার্লামেণ্টে একাধিক আইন পাশ করে যাতে তাদের নিজেদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকে।

ইংরেজদের ভারতে আগমনের বহুপূর্বে মরক্কোনিবাসী তুর্কী পর্যটক ইবন বতুতা ১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা প্রদেশের সপ্তগ্রাম ভ্রমণের পর যে ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখে যান তা থেকে কিয়দংশ নীচে উদ্ধৃত করা হলো যা থেকে মধ্যযুগে এতদ এলাকার পণ্যমূল্য সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণা করা যায়।

"সূক্ষ্ম কার্পাসসূত্রে প্রস্তুত অতি উত্তম বস্ত্র দশহাত মাত্র দুই দিরামে আমার সম্মুখে বিক্রয় হইয়াছে।" (A cloth of fine cotton of very good quality measuring thirty cubits was sold before my eyes for two dinars) —Harinath Dey's translation)

সপ্তগ্রাম বন্দর বাজারে তখন সমস্ত দ্রব্যই ছিল সস্তা এবং সহজলভ্য। ইবন্‌বত্তুতা তাঁর দীর্ঘ ভ্রমণ পথে এত সস্তার বাজার কোথাও দেখেননি। (I never saw in the world a country in which market rates are cheeper)

পর্যটক র‍্যালফ ফিচ (১৫৮৬ খ্রীঃ) সোনার গাঁ (Sinnergan or Sunargong)য়ের মসলিন বস্ত্রের বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন। ১৫৯৯ খ্রীঃ পর্যটক লিন্সটেন (Linsehoten) বাংলার মসলিন ও সূতি বস্ত্র সম্বন্ধে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছিলেন—"Much cotton Linen is made there, which is very fine and much esteemed in India, and all the East Parts, but also into Portugal and other places."

ষোড়শ শতাব্দীর শেষে সপ্তদশ শতাব্দীতে চিত্রটার পরিবর্তন শুরু হয়ে গেল। মুর্শিদাবাদের কাশিমবাজারে সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরেজরা ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর নামে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। তখন হুগলী বন্দর মারফৎ ঐ বণিকদের বাণিজ্যপোত যাতায়াত করতো। হুগলী বন্দর এবং হুগলী থেকে কোন্ কোন্ দ্রব্য কোন্ মাসে ক্রয় করা সুলভ তা কাশিমবাজাব কুঠির অধ্যক্ষ জন কেন ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সদর দপ্তরে প্রদত্ত একটি রিপোর্টে উল্লেখ করেছিলেন। যেমন,

মার্চ / এপ্রিল ❑ গম, চট ও চিনি
মে / জুন ❑ মাখন, ডোরাকাটা বস্ত্র, সাদা কাপড়, নানাপ্রকার ছিট ও ছাতা।
জুলাই / আগষ্ট ❑ চাউল, দড়ি, তিসি গাছের সূক্ষ্ম অংশের সূতায় প্রস্তুত বস্ত্র।
ডিসেম্বর / জানুয়ারী ❑ পিপুল তৈল, দ্বিতীয়বার উৎপন্ন চাউল।

এই সময়ে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী থেকে পূর্ব ভারতে ইংরেজ কোম্পানীর বাণিজ্য ব্যবস্থা পরিচালিত হতো। কোম্পানী হুগলীতেও একটি কুঠি নির্মাণের অনুমোদন লাভ করে। হুগলী কুঠির কর্মচারীগণকে সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র, সূতি বস্ত্র, কাপড়ের ছিট, লবণ ইত্যাদি সংগ্রহ করার নির্দেশ দেওয়া হয় মাদ্রাজ থেকে। এই সংক্রান্ত নির্দেশনামাটি নিম্নরূপঃ—
"On 31st December 1657, the Madras factory issued instruction to the Council in "the Bay" to procure at HUGHLY Cotton Yarne, Salt peeters, BANGALA SILKE, SAMDES ADATAY (Pices goods), Cynomon, Taffaties, BOUGEES (Cowries, Portugues BUZIES), Turmenrick and Gamlack."

বাংলার বস্ত্রশিল্পের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতি সম্পন্ন মসলিন কত প্রাচীন তার সঠিক সময়কাল নির্ধারণ সহজ কাজ নয়। গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণের পর বিজয় লাভ করে সহজেই ভারতে প্রবেশ করেন এবং পরে অবগত হন দেশের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত 'গঙ্গারিডয়' নামক রাজ্যের কথা এবং তার রাজধানী 'গ্যাঞ্জেস রিজিয়া' এর কথা। এই রাজ্যের রাজা পরাক্রমশালী ছিল এবং তাঁর সৈন্য সংখ্যার হিসাব জানার পর আলেকজাণ্ডার পূর্বদিকে অগ্রসর হওয়ার বাসনা পরিত্যাগ করেন। এই রাজ্যটি গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল এবং সমুদ্রের মোহনা ছিল সন্নিকটে। গঙ্গা এই রাজ্যে বহুধা বিভক্ত হয়ে সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হতো। এই রাজ্যের প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য ছিল মসলিন বস্ত্র এবং সমুদ্র পোতে বর্তমান ফিলিপাইন সহ পূর্ব এশিয়ায় ঐ মহার্ঘ দ্রব্য সওদাগররা রপ্তানী করতো। গ্রীক এবং লেখক-ঐতিহাসিকগণ যেমন Curtius, Rufus, Plutarch, Solonius এঁরাই প্রথম গঙ্গার পূর্ব প্রান্তে যেখানে সমুদ্রের মোহনা 'গঙ্গা রিডয়' রাজ্যের অবস্থানের কথা লিপিবদ্ধ করেন এবং Pliny, Ptolemy প্রমুখ গ্রীক ঐতিহাসিকগণের মতে 'গঙ্গা রিডয়' রাজ্যের মানুষ অধ্যুষিত ছিল ভাগীরথী সমেত গঙ্গার বিভিন্ন ধারাবিধৌত সমভূমি এলাকায়। ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ এই এলাকাকে 'সপ্তগ্রাম' রূপে চিহ্নিত করেছেন, কারণ প্লীনি তাঁর গ্রন্থে 'ত্রিবেণী'র কথা উল্লেখ করেছিলেন এবং টলেমি তাঁর গ্রন্থে 'গঙ্গা রিডয়' রাজ্যের বন্দর-রাজধানীর নাম 'গঙ্গে' (Gange) উল্লেখ করেছিলেন। খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে গ্রীক ঐতিহাসিব পেরিপ্লাসের বর্ণনা ছিল নিম্নরূপ ঃ—

"Turning toward the east again and sailing with the ocean to the right and shore remaining beyond to the left, Ganges comes into view and near it very last land toward the east-There is a river near it called the Ganges, on its bank is a market town which has the same name as the river Ganges. Through this place are braught malebathrum and Gangetic spikenard and pearls and muslins of the finest sort."

গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস পাটলীপুত্র নগরে মৌর্য সাম্রাজ্যের নৃপতি সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত গঙ্গানদী এবং পূর্বপ্রান্তে স্বাধীন 'গঙ্গা রিডয়' রাষ্ট্রের উল্লেখ করেছেন। গ্রীক ঐতিহাসিক টলেমির খুব নির্দিষ্টভাবে সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে গঙ্গার পাঁচটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার কথা এবং 'Ganga Regia' নগরটার কথা উল্লেখ করেছিলেন। পেরিপ্লাসের বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে 'muslins of the finest art' এর উল্লেখ।

ইংরেজদের বাংলায় স্থিতিলাভঃ—সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক কালে ভারতের সুরাটে ইংরেজরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মুখ্য কার্য্যালয় স্থাপন করে। এছাড়া মছলীপট্টম, মাদ্রাজ,

হুগলী, ঢাকা এসব এলাকায় স্থাপন করে 'আওরং' (Aurung) বা কারখানা (Factory)। এসময় ভারতের বাদশাহ্ ছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীর। ইংরেজ দূত স্যার টমাস রো তাঁর কাছে ইংলণ্ডের রাজা জেমসের পরিচয় পত্র প্রদান করে ভারতে ইংরেজদের শর্তহীন অবাধ বাণিজ্যের আবেদন জানান। টমাস রো তাঁর একাধিক পত্রে মুখ্য বাণিজ্য উপকরণ বাংলার সিল্কবস্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন।

'টমাস রো'য়ের উপাধি ছিল নিম্নরূপ ঃ Sir Thomas Roe, Knight, Lord Ambassador for the King's Majestic of ENGLAND

টমাস রো দুটি পত্র লেখেন ভারতে অবস্থান কালে তাঁর বন্ধুদের এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে। সম্রাটের কাছে আবেদনের বিষয়বস্তু ও পরিপ্রেক্ষিতের বর্ণনা আছে পত্র দুটিতে। বাংলার মসলিন যে আগ্রার থেকে সস্তা তার কথাও উল্লেখ করেছেন টমাস রো। সুরাটের এজেন্টকে তিনি আগ্রার পরিবর্তে বাংলা থেকে সিল্কবস্ত্র সংগ্রহ করার পরামর্শ দেন।

ইউরোপ থেকে বাংলায় সর্বপ্রথম করমুক্ত বাণিজ্যের জন্য আবেদন করে অবশ্য পর্তুগীজ বণিকেরা। সে প্রসঙ্গ আমরা পরে অবতারনা করছি। এখন পর্তুগীজ বণিকদের কথাই বলি।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পর্তুগীজরা প্রথম বাংলার সপ্তগ্রামে বাণিজ্যের জন্য ঘাঁটি গড়ে তোলে। সপ্তগ্রামকে তারা অভিহিত করতো Porto Piqueno নামে যার অর্থ হলো 'little port of this Ganges'। এই বন্দরে যে সমস্ত বাণিজ্য উপকরণ ওঠানামা করতো তা সমগ্র দেশে ভারবাহী পশু টানা গাড়ি সহযোগে রপ্তানী হতো, বেশিরভাগ অন্তর্দেশীয় ও বহির্বাণিজ্য চলতো অবশ্য সমুদ্র পোতে। ভারতে পর্তুগীজ পর্যটক ডি-ব্যারোজ (De Barros) ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গানদী ও সাতগাঁওয়ের মাধ্যমে নিজেদের দেশের বাণিজ্য সম্পর্কে এক গ্রন্থে লিখেছেন—

"Its first mouth, which is on the west, is called Satigaon, from a city of that name situated on its streams, where our people cary on their mercantile transaction"

ষোড়শ শতকে সপ্তগ্রামের গৌরব আকাশচুম্বী। পর্তুগীজ পর্যটক সিজার ফ্রেডারিক ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে এই বন্দর পরিদর্শনে এসে মন্তব্য করেছিলেন নিম্নরূপ ঃ—

"In the port of Satgaon every yeere I de thirte or thirhtefive ships great and small with rice, cloth of bombast of diverse sortes,

lacca, great abundance of sugar, mirabolams dried and preserved, long pepper oyle of zerzelins and many other sorts of merchandise, The citie of Satgaon is a reasonable fairy citie of the Moores abounding with all things."

পর্তুগীজরা ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দেই আনুষ্ঠানিকভাবে মোগল বাদশাহ্ কর্তৃক সাতগাঁও ও হুগলীতে নিজস্ব গোডাউন তৈয়ারী এবং বসবাসের অনুমতি লাভ করে। সমুদ্র জাহাজব্যবস্থা তখন পুরোপুরি পর্তুগীজদেরই করায়ত্ত ছিল। ১৫৯৬-৯৭ খ্রীষ্টাব্দে আবুলফজল রচিত 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে উল্লেখ আছে--"Hooghly had become the chief port through Europeans still caried on an import and export lode with Satgaon."

পর্তুগীজ বণিকরা যেমন সংগঠিতভাবে ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে আসেনি, ইংরেজরা কিন্তু এসেছিল রাজার সনদ বা অনুমতি নিয়ে এবং অত্যন্ত সংগঠিতভাবে 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' নামক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ইংলণ্ড থেকে এদেশে আগমন করে একের পর এক কুঠি নির্মাণ করে অসংগঠিত বিচ্ছিন্ন পর্তুগীজদের, ফরাসী বা ডাচদের মোকাবিলা করে। সুকৌশলে অন্যদের হঠিয়ে ভারতবর্ষের বাজার এক শত বছরের মধ্যেই দখল করে ফেলে।

স্যার টমাস রো জাহাঙ্গীরের কাছে ভারতবর্ষের বাজারে বাণিজ্য করার যে অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন তা তিনি তৎক্ষণাৎ পাননি। এজন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বিফল হতে জনৈক ডাক্তার বাউটন সেই উদ্যোগ নিজ স্কন্ধে তুলে নেন।

১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে জুলাই টমাস রো তাঁর বন্ধু মিঃ লুকাস অ্যান্ড্রিনাস এবং মশলীপত্তমে অবস্থিত ইংলিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রেসিডেন্ট মার্চেণ্টকে এক পত্রে জানান "I was requested to procure a firmaen or command for BENGALA : it being suppossed that some shipping would be this yeare diverted thither but have resloved as a firmer course, to send a copye of the strides vnder the seale of the King (which are more effectual and conteyne in them lardger priviliges and stricter commands then and firman vnto your factorie, that they may Lye to be delivere to any ENGLISH Commander, that shall go far BENGALA.

একই উদ্দেশ্যে স্যার টমাস রোয়ের লেখা অন্য একটি চিঠি নিম্নরূপ ঃ

Dated at December 1, 1616

"To my Honored friends, the Governor and Committees for the THE EAST INDIA COMPANY"

Whereas you write for new factoryes, except the silkes of BENGALA require yt, which yet in my opinion is had cheeper of AGRA, then you will I fynd it there, to maiteyne a factory for yt, being this people travell and Live hardlyer then you can, I am of opinion your residences are suffcient, and best chosen as they are, and the disposure of them I have mentioned in my last to the consulation at SURATT but what credit it will carry I know not"

ইংরেজগণের সুরাট বন্দরের এজেন্ট MANDOA ১৬১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২১ অক্টোবর ভারতবর্ষে সিল্কবস্ত্র ক্রয় সংক্রান্ত আরেকটি মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছিলেন। অবশ্য কোম্পানীর তরফ থেকে ভারত সম্রাটের নিকট বারংবার আবেদন নিবেদনের জন্য বিভিন্ন বণিকগণের মধ্যে শান্তি স্থাপনার্থে একটি শান্তিচুক্তি স্থাপিত হয়। ইংরেজগণের পক্ষে জনৈক ক্যাপ্টেন মিঃ রাসেল এক চুক্তিতে সম্রাটের প্রতিনিধির সঙ্গে স্বাক্ষর করেন। চুক্তিটিতে মোট চৌদ্দটি ধারা আছে। সেগুলি আমরা হুবহু ইংরাজী ভাষায় যেমন আছে তেমনি তুলে ধরছি। এই ইংরাজী ভাষা অত্যন্ত প্রাচীন। গভর্নর উইলিয়াম হেজেসের গভর্নর ডায়েরীর পৃষ্ঠা (XLXXIV) থেকে এই উদ্ধৃতি দেওয়া হল।

'A Contract of peace made with Mr. RASTELL, Captain of the English Nation, which we for the future do oblige ourselves exactly to observe.

1. It is agreed that the ENGLISH shall freely trade at their pleasure in the ports of SURATT, CAMBAYA BAROCH, GOGA, BENGALA, SCYNADA and in other of the cities of the King's Dominion and that they shall have liberty to import and export all sorts of goods excepting currall for 1 year, promising not to question than either touching the quantity or time, be it Silver or Gold or any other goods what so ever. They shall export from HINDUSTAN for their own country, excepting as (to) the said currall for one year, which being expired the import of that also shall not be prohibited.

2. That it shall not be lawful for either the government, the Officers, Daroga of Custom house, upon the pretence of the king or princess occasion to require the same of any goods unto them intended for their own profit. Onely what shall be indeed necessary for the kings use may be taken.

3. That the house belonging of COJA HOSSAN ALLEE wherein they formerly lived paying rent shall be continued vnto them.

4. That what ever carts shall be needful to the ENGLISH for bringing of their goods from the maryne of the towne SWALLY and for the transport of goods from the River TAPPEE and other places as also water and Provisions for their Ships Expences they shall be furnished of them without molestation or prohibition by the governours of WOORPAR either present or to come.

5 That if any other Christian shall offend any man belonging to the kings port the ENGLISH are not to be questioned for it but if any ENGLISH man doe commit any offence they are answerable for it.

6. That noe land customs at BAROCH : BORODERA : UNCIEASTAR : KURKEH : BERCHAW places belonging to this king, shall be demanded of them, nor any molestation for matter of Taggat offered, but BAROCH being a port town though they ship not their goods but bring them thence by Land the customs of that are payable, and order to be given that the ENGLISH receive noe trouble in that particular.

7. ....

8. That their coffelas shall pass freely through the country without molestation etc.

9. .. ..

10. That the ENGLISH shall have free excercise of their own religion (In case of quarrells between ENGLISHMEN the ENGLISH captain to decide it between ENGLISH MAN and MUSSULMAN the Captain and the Governor together shall decide etc.

11. (In case of an ENGLISHMAN's death his goods shall be taken in charge by ENGLISH people, if there no ENGLISH MAN to take charge, the Governor and "Cozzee" shall take an exact amount etc.)"

12. (The ENGLISH Ships to administer aid to the king's ships, never to pretend any right to claim to any ship pertaiming to the king etc.)

13. (When the captain and of other ENGLISH man desires to go on board their ships as an acknowledgement to the Governer they shall ask his licence etc.)

14. (About satisfaction to be done to the ENGLISH on their just demands etc.)

"Given the 25th Day of the Moone Shahur Noor Allee in the 25 year of the Reigne of SHAH JEHAN GEERE.

"ISSOFF CKAWN Governor
"KHOZZY MAHMUD KHOSS UM"
and 18 others

A note appears in the old India House Index as under :–

"The month intended appears toke ten sixth of the ancient Persion Kalender. But the year must be an Error. as JUHANGEER reigned only 22 years 2 month & 10 days.

This date is stated to be 1624, Sept. 7 which would fall in the 20th year of JUHNAGEER's Region and 3 months before President RASTELL sailed for England."

উপরোক্ত নির্দেশনামার পর বাংলা প্রদেশে বাণিজ্য বিস্তারের সূচনা হয় সুরাটে অবস্থিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাউন্সিলের নিকট উইলিয়ম মেথল্ড (WILLIAM METHWOLD) ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৬৩৩-৩৪ এক পত্র প্রেরণের পরিপ্রেক্ষিতে।

"The 2nd present we received from AGRA the Kings firmand which gives liberty of trade vnto Vs, in the wole country of BENGALLAE but restrains the shippinge only vnto the porte of PIPLYE

প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে যে, করমণ্ডল রাজ্যের মসলিপত্তম্ এর ইংরেজ এজেন্ট জন নরিস বাংলা প্রদেশে ফ্যাক্টরী নির্মাণের জন্য দুইজন বণিককে প্রেরণ করার জন্য জনৈক উইলিয়াম বার্টন (কোম্পানীর কর্মকর্তা) কে ১৬৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে মার্চ নির্দেশ দিয়েছিলেন।

কোম্পানীর প্রথম গভর্নর উইলিয়াম হেজেস তাঁর দিনলিপিতে উল্লেখ করেন যে, এই সময় বর্ষব্যাপী বাঙ্গালায় ভয়ঙ্কর অনাবৃষ্টির মতো ঘটনা ঘটে। এর ফলে কটন উলের দুষ্প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পায়। মনপ্রতি দামও বৃদ্ধি পায়। অনাবৃষ্টির জন্য প্রচুর শস্যহানির ঘটনা যেমন ঘটে তেমন দেশে কটন উল (Cotton wool) প্রচুর নষ্ট হয়।

(Such Abundance of Raine as Rotted not only a great part of the corne in the fields, erst was halft Ripe, But also spoyl'd most of the country.

বাংলা প্রদেশে বাণিজ্য বিস্তারের ফলে কোম্পানীর কি কি বিষয় প্রাপ্তিযোগ ঘটবে তার বিশদ তথ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সুরাট দপ্তর থেকে বণিকরা যাতে জানতে পারেন এমন ব্যবস্থাও করা হয়। যেমন—

"First for the trade' 'twixt that and this place, in Rice, sugar, butter, and divers other sorts of Provisions and course commodities.

"Secondly it affords store of white cloths at cheape prices such as suitable for ENGLAND, PERSIA and other south worlds.

"Silk may there be Baught like wise yearly, to a great summe at 4 in fenams the English pound.

"Divers other thing it affords for PERSIA, as shashes, stuffers, Allyjash, fine CHITE CLOTHS and like somewhere of is now in Action for that place and or better experience will doubtless brings the rest also within the campass of our future investements.

These are the staple commodities the BENGALA yields Shash, urban cloth, Alajah, a kind of sild stuff corded or striped with gold or colour.

"Spices of all sorts sells there to good profit,

"Tobacco, Iron, Tin and sundry other pety goods in yearly carried thither on the Juncks that sails from this place.

"Hitherto have we only shewed what commodities BENGALA does cheifly export and require............

ইংরেজ কুঠিয়ালরা মসলিন বস্ত্র তৈয়ারী করার প্রতি বিশেষ জোর দিত। কারণ তারা বিনা শুল্কে এই বস্ত্রের আভ্যন্তরীন ও বহির্বাণিজ্য করার অধিকার দিল্লীর সম্রাট, অযোধ্যা এবং বাংলার নবাবের নিকট হতে আদায় করে নিয়েছিল, উপরোক্ত তথ্যেই তা প্রমাণিত। বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে ওলন্দাজ, পর্তুগীজ এবং ফরাসীদের সঙ্গে অনেক বিবাদ, বিবাদ থেকে যুদ্ধেব ঘটনা ঘটে যায়। একই সঙ্গে ইংলণ্ডের রাজা ভারত সম্রাটের কাছ হতে হিন্দুস্থান বিশেষত বাংলা প্রদেশে মসলিন ও রেশমবস্ত্র বাণিজ্য করার সনদ প্রাপ্ত হয়ে ইংরেজরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বকলমে বাংলার তাঁত শ্রমিকদের ওপর নির্মম অত্যাচার শুরু করলো।

৩

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে বিভিন্ন মহাসাগরে বাষ্পীয়পোত নামিয়ে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় বিশ্বের বাজার দখলে এমনভাবেই উপনিবেশবাদী সাম্রাজ্যবাদীরা আস্তিন গুটিয়ে নিজেদের মধ্যে লড়াই করতে যুদ্ধের ময়দানে নেমে পড়েছিল। বাণিজ্যের স্বার্থে ইংরেজরাই সেদেশে উপনিবেশের জনগণের বিরুদ্ধে নানা প্রকার 'মুনাফা সর্বস্ব' আইন রচনা করতো।

ভারত সম্রাট শাহজাহানের আমলেই ইংরেজ বণিকরা বাংলায় ফ্যাক্টরী স্থাপনের অনুমোদন লাভ করে। এ সংক্রান্ত একটি সুন্দর উপাখ্যান ঐতিহাসিক ষ্টুয়ার্ট লিখিত 'History of Bengal' গ্রন্থে বর্ণিত আছে। কাহিনীটি নিম্নরূপ ঃ হিজরী ১০৪৬ অব্দে (১৬৩৬-৩৭ খ্রীঃ) সম্রাট শাহজাহানের দাক্ষিণাত্যের শিবিরে অবস্থানকারী তরুণী কন্যা হঠাৎ অগ্নিদগ্ধ হয়ে পড়েন। জনৈক আসাদ খানের পরামর্শমতো সম্রাট কন্যাকে বাঁচানোর আশায় সুরাটের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট ইউরোপীয় চিকিৎসক প্রেরণের জন্য আবেদন জানান।

সুরাটে অবস্থিত কোম্পানীর কাউন্সিল স্থির করে এই সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত হবে না। আরও স্থির করে যে, এমন একজন সার্জেন চিকিৎসক প্রেরণ করা হবে যিনি কেবল পেশাগত চিকিৎসক নন, কূটনীতিকও। ভারত সম্রাটের কাতর আবেদনে সাড়া দিয়ে কোম্পানী 'হোপওয়েল' নামক বিলাতী জাহাজের সার্জেন ডাঃ গ্যাব্রিয়েল বাউটনকে দাক্ষিণাত্যে বাদশাহের শিবিরে যেখানে অগ্নিদগ্ধ কন্যা অবস্থান করছেন সেইখানে দ্রুত প্রেরণ করে। ঐ চিকিৎসক অতি দ্রুত শাহজাহানের কন্যাকে বিপদমুক্ত করেন। সম্রাটও অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়ে বাউটনকে পারিশ্রমিক এবং কিছু পুরস্কার গ্রহণ করার অনুরোধ জানালে ধুরন্ধর ডাঃ বাউটন নিজের ব্যক্তিগত কোন লাভের কথা উচ্চারণ না করে যাতে ইংরেজরা এদেশে বিশেষতঃ 'বাঙ্গালায়' শুল্কহীন বাণিজ্যের জন্য বাদশাহী অনুমোদন বা ফরমান পায় তার জন্য আবেদন করে বসেন। সম্রাটও তৎক্ষণাৎ এই আবেদন মঞ্জুর করেন। বাংলা প্রদেশে ইংরেজদের হাতিয়ার সমস্ত ব্যবস্থাই এর ফলে পরিষ্কার হয়ে যায়। একই সঙ্গে এই রাজ্যে কারখানা বা 'ফ্যাক্টরী' স্থাপনের ব্যাপারেও কোম্পানী অনুমোদন লাভ করে। যদিও পর্তুগীজদের দ্বারা হুগলী কারখানা ইতিমধ্যে স্থাপিত হয়েছে। এরপর ইংরেজরাও স্থাপন করলো।

ফেব্রুয়ারী ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ বাউটনের জাহাজ প্রথমে উড়িষ্যার 'বালাসোর' (অথবা PIQLEY) বন্দরে, পরে হুগলী বন্দরে প্রবেশ করে। বাদশাহ্ শাহজাহানের কাছ হতে 'ফরমান' লাভ করার তারিখ ২রা ফেব্রুয়ারী ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দ। হুগলীর ফ্যাক্টরীতে এবং কোম্পানীর এজেন্টের কাছে কোম্পানীর সদরদপ্তর থেকে বাউটনের সঙ্গীসাথী সমভিব্যাহারে যাত্রা করার সংবাদ পৌঁছে যায়। ('The priviledgs granted to him negotiated the whole concerns of that vessel without the payment of any duty' (page CLXVII, From : William Hedges' Diary—Early History of the Company's Settlement in Bengal)। কিন্তু কোম্পানীর জাহাজ, কর্মকর্তাগণ এবং ডাঃ বাউটন ১০৪৮ হিজরী/১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম উড়িষ্যার বন্দরে পরে হুগলী বন্দরে পৌঁছান। 'Liberty to trades free of all duties in BENGALA and to establish factories in that country' সূত্রপাতের এটাই প্রকৃত ঘটনা।

সম্রাট শাহজাহানের আমলেই হুগলী বন্দরে ফ্যাক্টরী নির্মাণের জন্য ইংরেজদের তৎপরতা সাঙ্ঘাতিক পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এদেশে বিনা শুল্ক প্রদানে সুতীবস্ত্র বিশেষতঃ বাংলার মসলিন বস্ত্র নিয়ে উপনিবেশবাদীদের মধ্যে দ্বন্দ্বে ইংরাজরা অন্য সকলকে টেক্কা দিয়েছিল। এ বিষয়ে শাহজাহানের আমলে উইলিয়ম হেজেসের ডায়েরী গ্রন্থ থেকে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি আমরা তুলে ধরছি।

(Page CLXXVII, Letter of President Methwold announcing a Firman Concedeing trade in Bengala, 1634 A. D)।

Your opinion of sending A man to SUGERMAT Etsetra Places, there to procure cloth would very well become our implyment had we but on home we might truste in that business but you well know the fallsity and dedaytfullness of our new implyed servants in such that we dwest not depose confidence in them to the vallew of 10 roopees, I also therefoore myself intend so far as I can gett musters of cussayes (Khassa, a kind of muslin) which are now a macing to leave the over sight of this place into William BURTON and the broker, and A dress my sealfe for the great pogodo, there soposing likewise to put of part such Marchandise as heere lyeth ded on our hands.

The market of Saylls in HARRAPORE seimes at present as if there were no merchants in the Contry.

(HARRAPORE near MAHANADI DELTA)

These PROTIGALS whilome exspeeled from HUGLY huth found Greate fovor with SHAWJAHAN and rentered that place to the number of 20 persones how cavidall for their commensing A new investment is the third part of the goods, formerly cessed on which with large priveliges and tasharests (Comoplimentary presents) with honor, the king hath bestowed on them so that our expectation (of) HUGLY is furstrayt ;........"

মোগল আমলে বাংলা প্রদেশের গ্রামাঞ্চলে মসলিন বস্ত্রশিল্পের চরম বিকাশ প্রাপ্তি ঘটেছিল। বাংলার গৌরব-জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মসলিনের বাজার দখলের জন্য ইউরোপের উপনিবেশবাদীরা সেই সব দেশের রাজা-মহারাজাদের অর্থানুকূল্য গ্রহণ করে জাহাজ, রসদ ও সৈন্য বাহিনীর সাহায্যে যারা ষোড়শ শতকে মরীয়া হয়ে প্রবেশ করেছিল সেই পর্তুগীজরা ছিল তাদের পুরোভাগে। ইংরাজদের সঙ্গে সবচেয়ে বেশী সংঘর্ষ হয়েছে এজন্য পর্তুগীজদের। এসব কথা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। দক্ষিণ ভারত, পশ্চিম ভারত

এবং উত্তর ও পূর্ব ভারতে ঘাঁটিগুলি ছিল যথাক্রমে মসলিপটম, মাদ্রাজ, সুরাট, আগ্রা, হিজলী, চন্দননগর বা ফরাসডাঙ্গা, হুগলী, সপ্তগ্রাম ইত্যাদি। সপ্তদশ শতকে সমগ্র ভারতবর্ষের বাজার সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশবাদী ইংরাজদের দখলে চলে যায়। মসলিন বস্ত্র ব্যতীত ইউরোপীয় বণিকরা এদেশ থেকে সংগ্রহ করতো সীসা, লবণ, কাঁচ বা কাঁচ নির্মিত বস্তু, ছুরি-কাঁচি, লৌহ, রঙীন সুতার ডোরাকাটা বস্ত্র, নানাবিধ ছিট কাপড়, সোরা প্রভৃতি। মধ্য এশিয়া (PERTIA)র নানান দেশে এসব রপ্তানী হতো। ভারতবর্ষ বা হিন্দুস্থানের তৎকালীন আয়তন কি বিশাল, তাসত্ত্বেও কেবল বুদ্ধিমত্তার জোরে পরবর্তীকালে অস্ত্রের জোরে হিন্দুস্থানের তাঁত শ্রমিক, কৃষক, বণিকদের স্বাধীনতা হরণ করলো অত্যন্ত ক্ষুদ্রায়তনের ইউরোপীয় দেশগুলো। লড়াইয়ের শীর্ষদেশ থেকে পর্তুগীজ পতাকা নামিয়ে ওড়ানো হলো ইংলণ্ডের পতাকা। পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইংলণ্ডের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল ক্ষুদ্র ডেনমার্ক।

ইংরাজরা পূর্বভারতে প্রবেশ করে উড়িষ্যার বন্দরগুলো দিয়ে। বালাসোর (বর্তমান বালেশ্বর) বন্দরের উত্থান ঘটেছিল সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে। বালাসোর তখন থেকেই বাংলাদেশে প্রবেশের প্রধানদ্বার। বালাসোর থেকে হিজলী, হিজলী থেকে হুগলী ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি বন্দরে প্রবেশ। বালাসোর বন্দর গড়ে তোলা ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে অত্যন্ত জরুরী হয়েছিল এইজন্য যে পর্তুগীজদের ভারতের এইপ্রান্ত থেকে নিশ্চিত হঠানোর আবশ্যকতা। এই সংক্রান্ত একটি পত্র (Letter of Mr. Water Clavell written for Streynsham Master's information in 1676 regarding short account of the rise of Balasore) নিম্নে উদ্ধৃত করা হ'লো। বণিকদের তখনও পর্যন্ত লক্ষ্য বাণিজ্যবিস্তার এবং একটার পর একটা ক্রমান্বয়ে 'কারখানা' বা 'ফ্যাক্টরী' স্থাপন।

"BALLASORE begun to be a noted place when the PORTUGUEZ were beaten out of ANGENIN (Mod : HIJILI) begun to decay at PIPELY and to have a diminution in other places of these parts, and the Barr opening and the River appearing better than was imagined, the ENGLISH and DANES endeavoured to setle here, to be out of troubles PORTUGUEZE gave to the other nation and had themselves, the rather because the cloth of HARRAPORE, where our first factorye was settled was with our much difficultyes to be brought hither by land, and the River where our vessells usually had laine at being stop up it was noe easy mater to bring the cloth by Sea, nor soe safe have vessels ride before that place, as here in the Roads of BALLASORE."

পুনরায় ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 'হোপওয়েল' জাহাজের চিকিৎসক সার্জেন ডাঃ গ্যাব্রিয়েল বাউটন যিনি সম্রাট শাহজাহানের অগ্নিদগ্ধ কন্যাকে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়ে ইংরাজদের পক্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে শুল্ক মুক্ত স্বাধীন বাণিজ্যের ফরমান আদায় করে দিয়েছিলেন তাঁর প্রসঙ্গে পুনরায় দুএকটি ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন। ডাঃ বাউটন বাংলা প্রদেশে পৌঁছালেন সম্রাটের ফরমান (ফেব্রুয়ারী ২, ১৬৩৩-৩৪) হস্তগত করে। সেখান থেকে রওনা হলেন উড়িষ্যা (ORIXA) প্রদেশের পিকলে (PIQELY) বন্দরে। হিজরী ১০৪৮ অব্দে (১৬৩৮-৯ খ্রীষ্টাব্দে) প্রথম একটি ইংরাজ কোম্পানীর জাহাজ নোঙর করলো ঐ বন্দরে এবং ডাক্তার বাউটনের হস্তগত বাদশাহী ফরমান বলে ঐ জাহাজের পণ্য সামগ্রীর জন্য কোন শুল্ক প্রদান করতে হ'লো না।

ইতিমধ্যে প্রিন্স শাহ্ সুজা ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে ঐ সময় উপস্থিত হন রাজমহলে। ডাঃ বাউটন সুজার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের নিমিত্ত স্বয়ং উপস্থিত হন রাজমহলে। আবার ঠিক একই সময়ে সুজার অন্দরমহল বা হারেমের এক নারী শারীরিকভাবে কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়লে বাদশাহ পুত্র সুজা ডাঃ বাউটনের সাহায্যপ্রার্থী হন। এক্ষেত্রেও ডাঃ বাউটন চিকিৎসা ব্যাপারে সফল হলে ঐ মহিলা সম্পূর্ণ সুস্থ হন। খুশি এবং আনন্দে আহ্লাদিত সুজা ডাঃ বাউটনকে পুনরায় পুরস্কৃত করার বাসনা প্রকাশ করলে ডাঃ বাউটন আবদার করেন যেন বাদশাহী ফরমান অনুযায়ী সমস্ত প্রকার বাণিজ্য বিনা শুল্কে ইংরাজরা বাংলায় চালাতে পারে, সঙ্গত কারণ বিনা কোন বাধা প্রাপ্তির ঘটনা যেন না ঘটে বা কোন অদৃশ্য হস্তক্ষেপে সব কিছু যেন বানচাল হয়ে না যায়।

ডাঃ বাউটনের 'হোপওয়েল' জাহাজটি পূর্বে ইংলণ্ডে চলে গেছলো, ইতিমধ্যে ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে সেটি আবার ভারতে প্রত্যাবর্তন করে। ঐ জাহাজে আসে ইংলণ্ডস্থিত কোম্পানীর এক কর্তা মিঃ ব্রিজম্যান এবং তাঁর প্রচুর লোকজন। ডাঃ বাউটন এই সংবাদ রাজমহলে সুজার নিকট পেশ করেন এবং মিঃ ব্রিজম্যানের সঙ্গে প্রিন্সের পরিচয় ঘটান। প্রিন্সের নিকট থেকে এবার ডাক্তার সাহেব বালাসোরের পিপলে (উড়িষ্যা) বন্দরে ফ্যাক্টরী স্থাপনের সঙ্গে হুগলী শহরেও অর্থাৎ উভয় প্রদেশের উভয় বন্দর শহরে ফ্যাক্টরী স্থাপন এবং নিঃশুল্ক বিনা বাধায় বাণিজ্য চলাচলের যাবতীয় অনুমতি আদায় করে নেন। এরপরের মন্তব্য নিম্নরূপ ঃ—

"Sometime after this event, Mr. BOUGHTON died, but the Piince shall continued his liberality to the English. (Early History of Company's Settlement in Bengal-Hedges' Diary, page CLXVII) ওলন্দাজ কোম্পানীর জাহাজগুলো ভারতের বিভিন্ন বন্দরে সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে জাঁকিয়ে বসার পূর্বেই বাণিজ্য উপকরণ নিয়ে ঘোরাফেরা করতো। এ সম্পর্কে অর্থাৎ ওলন্দাজ কোম্পানীর জাহাজগুলির গতিবিধির ওপর ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রখর দৃষ্টি ছিল। এসম্পর্কিত একটি পত্রে 'Ship Jonna'

জাহাজের ক্যাপ্টেন ওয়েডেন (WEDDEN) ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯মে কোম্পানীর সদর দপ্তরে নিম্নোক্ত বার্তা প্রেরণ করেন।

The Dutch are never without 3 or 4 such vessells here, wherewith they trade from port to port all the yeare longe, sometimes buying Rice and other Provisions where they are cheepe and transport to Better Markets, other which they are imployed as men of war (but never idle) and by these means they cleare at years end, all the great charges, they are alt v pon this coast."

ডাঃ গ্যাব্রিয়েল বাউটন সম্পর্কে মোগলদের, ইংরাজদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অন্ত ছিল না। কেবলমাত্র সম্রাট শাহজাহান বা প্রিন্স সুজার কাছ থেকে নয়, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব মীরজুমলা যিনি ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় প্রথম প্রবেশ করেন তিনিও বাউটনের চিকিৎসার সাফল্যের জন্য ওঁর গুণগ্রাহী ছিলেন। উড়িষ্যা, বাংলা এবং পাটনায় ইংরাজদের বসবাস এবং নিঃশুল্ক বাণিজ্যের অনুমতি নবাব মীরজুমলার কাছ হতে অনুমতি আদায়ের ফলে অন্যান্য উপনিবেশবাদীদের তুলনায় ইংরাজরা তুলনামূলকভাবে অনেক নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। ডাঃ বাউটন তাঁর সাফল্যের ঘটনার নিম্নোক্ত বর্ণনা রেখে গেছেনঃ— "Our Nation are free from all Duties and taxes what ever these 3 Kingdomes."

"All which priviledge was acquired by that in gennous and kind hearted countrymen of ours Doctor GABL BOWDEN."

বাদশাহ্ শাহজাহানের আমলে আগত ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চিকিৎসক ডাঃ গ্যাব্রিয়েল বাউটন (অথবা বাউডন) যে কৌশলে হিন্দুস্থানে বিশেষতঃ উড়িষ্যা, বাংলা ও বিহারে ইংরাজ উপনিবেশবাদীদের সাফল্যের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তা উল্লেখিত আছে। এইভাবে বাংলা তথা ভারতবর্ষের শাসক নৃপতি-সামন্ত শ্রেণীর সঙ্গে উপনিবেশবাদীদের গাঁটছড়ায় স্বাধীনতাসূর্য মোগল আমলেই অস্তমিত হওয়ার প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল। ডাঃ বাউটন যেমন বাদশাহ্-নবাবদের প্রশংসা করেছেন শুল্কমুক্ত বাণিজ্যের অনুমতিদানের জন্য অনুরূপভাবে দিল্লী এবং পাটনা থেকেও ইংরাজ ডাক্তারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়েছে। বাদশাহ্-নবাবরা একবারও চিন্তা করেননি তাঁদের এই কৃতকর্মের বোঝা ভারত বা হিন্দুস্থানের জনগণকে পরে কিভাবে বহন করতে হবে।

হিন্দুস্থানে আগত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম গভর্নর উইলিয়ম হেজেস তাঁর দিনপঞ্জীতে লিখেছেন ঃ—

"All which was procured by the Ingernuitive Mr. GABRIEL BOWDEN (One of our owne nation) and a very Eminent Doctor

of Phisick some time Doctor in Ordinary to the great warriour EMIR JEMLA ; who took a very great Affection towards him, was most courteous and free to him, affection towards him, was most coureous to him and especially upon a notable cure of his owne lady performed (vnder god) by the Doctor, the Nabob callinge for him ordered him at that instant what he would have given him or had most likinge to and it should be granted in consideration of his Loyal service and care of the best of his familie. The Doctor highly serviced with this great person generosite, Some considered vopn it yet soe as not be greedy of any present gaine (only for himselfe) and now in the best of thing)".

জনৈক ফ্রানসিস ডে বালাসোর বন্দর থেকে ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা নভেম্বর এক পত্র কোম্পানী কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করেন। দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন বন্দর গঞ্জ থেকে ছুরী-কাঁচি-ছিটকাপড়-মসলিন-চিনি-সোরা-লৌহ ইত্যাদি মধ্যপ্রাচ্যের দেশে রপ্তানী করা হচ্ছে। ট্রাকের সাহায্যে আভ্যন্তরীন সংগ্রহ চলে তারও একটি ঐ চিত্র পরিস্ফূট হয়েছে। পত্রটি আংশিক প্রতিবেদন নিম্নরূপ ঃ—

Leter From FRANCIS DAY to the Company, dated. "BALLASARA NOVEMBEER the 3d, 1642"

"The 7th August" was left MESULA PATAM and arrived with the above said success at BALLASARA the 13th ditto, where having launded the remaines of what left at MADRASA PATAM and MESULA PATAM wee have since arrival hither made sale of the glasses, Knives, Lead and some 22 peral of cloth, the lead and part of the cloth have been put off in truck for sugar, gwras, Sannoes, cassoes. Iron and ginghams all but the last intended for PERTIA, for willingly I would leave nothing behinde, the returne being soe uncertaine there"

(Gurras (gara). annoes, cassaes all names of cotton piece goods or coarsest of cotton cloths etc.)

আগ্রার মুঘল বাদশাহ বা বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব সকলেই ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে ইংরাজদের সম্পর্কে উচ্চধারনা পোষণ করতেন যে কারণে অন্যান্য

বিদেশীরা 'মুক্ত বাণিজ্য' বা 'Free Market' এর সুযোগ লাভে বঞ্চিত হতো। এ সম্পর্কে ষ্টুয়ার্ট লিখিত History of Bengal গ্রন্থে যে স্বীকৃতি আছে তা নিম্নরূপ "In this before mentioned places in these 3 Kingdoms" ("ORIYA, BENGALA and PATTNNA" ie. BEHAR)" this ENGLISH nation in general hath freedome of inhabiting and tradinge, free from all manner of taxes and Customes in or noe this like priviledge hath noe Other nation besides."

ইংরাজরা নিজেরাও বোধ হয় চিন্তা করতে পারেনি হিন্দুস্তানের বিভিন্ন বন্দর শহরের অবাধ বাণিজ্য করার এমন সুযোগ লাভ করবে। মূলতঃ ডাঃ গ্যাব্রিয়েল বাউটনই তাঁর নিজস্ব বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ করে কোম্পানীর কাছে এ সুযোগ এনে দেন। হিন্দুস্থানের এক শহর থেকে আরেক শহরে সংগৃহীত পণ্য মজুত করা তারপর সে সব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিশেষত ইংলণ্ডে, মধ্যপ্রাচ্য, বার্মাদেশে তারা জাহাজযোগে প্রেরণ করতো। উন্মুক্ত শর্তে বাণিজ্য করার অনুমতি আদায়ের পাশাপাশি বস্ত্র প্রস্তুতের কারখানা, সোরা তৈয়ারী কারখানা ইত্যাদি চালু করতে অনুমতি আদায় করে। মুনাফালাভের সন্ধানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অর্থ বিনিয়োগ করতে পিছপা হয়নি। আন্তর্দেশীয় বাণিজ্য প্রসারে কখনও বাধা হয়ে দাঁড়ায় পর্তুগীজ বণিকরা কখনও বা ডাচেরা। তখনও ফরাসীরা এসে যে পৌঁছায়নি তার নিচে উল্লেখিত একটি পত্রই প্রমাণ করে। পত্রটির সময়কাল সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যকাল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সদর দপ্তরের এজেন্টকে এই পত্রটি পাঠান বালাসোর এবং হুগলীতে অবস্থিত ফ্যাক্টরীগুলির সহকারী কর্মীরা পরামর্শ লাভের জন্য। এই পত্রটি খুবই গুরুত্ব পূর্ণ।

"Instructions for Mr. JAMES BRIDGE MAN Cheife, Mr. STEPHENS Second, W. BLAKE and F. TAYLOR Assistant in the FACTORIES of BALLASORE and HUKLEY for this honoble : ENGLISH EAST INDIA COMPANY"

Dated at end "Ballasore 14th December, 1650"

Sirs,..................................

"Where as it is the designe of our Masters the honoble Company to advance, and increase the trade in these Parts of OREXEA and BENGALA you are by all possible meanes to endeavour more and more to informe yourselves how best and most profitably to carry out the trade thereof, especially for saltpeter, Silke and sugars. to this ende, That you endeavour the sale of those goods remaining the factories to the most advantage, there by assocone as may be to gett moneys into your hands

and see you may proceed to invest the same in the best time of buying the aforesaid goods".

ঐ পত্রে পরামর্শ ছিল এই যে, পাটনা যেহেতু সোরা (অর্থাৎ Salt petre) সংগ্রহের সর্বোত্তমকেন্দ্র ছিল সেইহেতু কোম্পানী যদি অর্থ বিনিয়োগ করে তবে লাভই হবে। তা ছাড়া হুগলী বন্দর শহরে যে কারখানা আছে তাইতে ঐ আকরিক সোরা রিফাইন বা পরিশোধন করে নেওয়া চলে। কোম্পানী এজেন্ট বা কাউন্সিল যদি সত্যই ঐ পণ্য সংগ্রহ এবং পরিশোধনের অর্ডার দেয় তবে অর্থ সংগ্রহের জন্য ঋণ গ্রহণও চলতে পারে তবে ঋণের পিছনে সুদের হার অত্যন্ত বেশী।

পত্রাংশ ঃ— "PATENNA being on all sides concluded the best place for procuring of Peter, therefore to make a try all how you can procure the same from hence wherein you make VSe of WB (William Blake or Wm Benis) who you know is able. You must order that business as may have thereby a may bee encouraged by which meanes you will soonest arrive to our desire. In this commoddity invest atleast one halfe of your Stock and endeavour this fineing of the same at HUKLEY. In case you runne into debt, left it bee for this commodity, yet I doe not advise you soe to do, untill you receive order from this Agent and councell, the interest being (as you know) soe exceeding high".

পত্রে ইংরাজদের বাণিজ্যের প্রতি যে গভীর মনোযোগ ছিল তা খুবই স্পষ্ট। সিল্কবস্ত্রের প্রসঙ্গেই ইংরাজ কোম্পানীকে ডাচদের সঙ্গে সবচেয়ে কঠিন প্রতিযোগীতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল তার সবিস্তার উল্লেখ আছে এই পত্রে। সিল্ক বা মসলিন সংগ্রহের জন্যই ইংরাজদের বাধ্য হয়ে কঠিন পরিশ্রম করতে হতো।

ওলন্দাজদের তবু একটা সুনাম ছিল যে তাদের বিরুদ্ধে ভেজালের অভিযোগ ছিল না। হুগলীতে পরিশোধনের সব ব্যবস্থাই কোম্পানীর ছিল। এরপরের কাজ কেবল জাহাজে চড়িয়ে সমুদ্র যাত্রা। কত হিসাবী ছিল কোম্পানীর কর্তাগণ ও কর্মচারীরা এইতেই প্রমাণিত হয়।

"In silke you know what great matters are to be done, therefore it doth import the company much, that you strive both by relation and your own experience to know how and where the best convenience are for forfitting preparing the same for the Sales of EUROPE, that so and if the Company shall require large quantities you may be in a porture to fitt them all at the first hand. I Suppose the order of the DUTCH is vey good and will

be free 1st from adulteration, the proper set way will bee three sorts, as Head, Belly, and Hoote each apart by themselves. You make also an experience of washing thereof at HUKLEY or elsewhere and send the company a maund of each sort apart by the next shipping for a Sample, with an exact amount of loose in washing and charge of the same. In this commodity you may invest neare either parts of your remaines. As for sugars, you know they are procured in many places! You make a small try all as each. Herein I suppose you need but inquire secretly into the order of the DUTCH, how where and when they proceed to buy the commodity, and how the seasons doe fall bringing the same out of the country or downe the River. I am informed that the quantity they last bought at PATENNA is well approved of, therefore I desire also that you procure some from thence by the same way or Instruments that you make use of to obtayne the peter".

ওলন্দাজ বণিকরা হুগলী বন্দরের সন্নিকটে দুর্গ নির্মাণ করে ব্যবসা বাণিজ্যের উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটাচ্ছিল, যাতে তাদের বাণিজ্যের গোপনীয়তা ইংরেজরা জানতে পারে তার জন্যও প্রয়োজনীয় কাঠামো গড়ে তোলা ইংরাজ কোম্পানীর পক্ষে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। বাদশাহ্ বা বাদশাহ্ পুত্রের ফরমান পাওয়ার যে কৃতিত্ব ডাঃ গ্যাব্রিয়েল বাউটন কোম্পানীর হাতে সঁপে দিতে সক্ষম হয়েছিল তার সদ্ব্যবহারের নিমিত্ত ওলন্দাজদের কুঠির সন্নিকটে ইংরাজরাও কুঠি নির্মাণে তৎপরতা শুরু করলো। হুগলী বন্দর শহরে Salt peter বা সোরা নিষ্কাশনের জন্য কারখানা স্থাপন ছাড়াও চিনি, সিল্ক বস্ত্র প্রভৃতি বাণিজ্যদ্রব্য পাটনা থেকে সংগ্রহের কাজে ওলন্দাজদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা মোকাবিলার জন্য ট্রেঞ্চ খনন করা কেম্পানীর পক্ষে প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেশীয় নবাবদের তোষণের পথ নিতেও পিছপা হয়নি। কটকের নবাবকে তুষ্ট করার জন্য উপহারসামগ্রী প্রদান করার পথও গ্রহণ করা হয়েছিল। ভারতীয় পণ্য সামগ্রী রপ্তানী করার অসীম আগ্রহের তৃষ্ণা মেটাতে ছল, বল ও কৌশলের পথে অগ্রসর হওয়ার সাফল্যের কারণেই ইংরাজরা এ দেশের বাজার দখলের সংগ্রামে বিজয়ী হয়েছিল পত্রের শেষাংশ এ সম্পর্কে অনেক তথ্যই সরবরাহ করছে।

"You know how necessary it will be for the better carrying on the trade of these parts to have prince ffirman, and that Mr. GABRIEL BOUGHTON Chirgeon to the prince promises concerning the same..........

"That either your selfe or NARRAND procure a donation of that land on the West side of the DUTCH house and soe downe to the River and the small creeke. soe that in case the Company resolve to enlarge trade here they may their build a mansion house and a house for refineing of peter close to the River. Where meet Convenience for negotiation of that nature do attend and let them digge a round about the said could of five or six Rupees charge to signify our bounds and interest in the same.

"I understand that Nabbob of CATACKE is to come downe this way. Desire if hee come that you present him with a remnant of fine of five cloth of the value of ten pounds or there about and a sword Blade or two of the best sort.

"These are what I thought needful to advise you by way of instruction, doubt not, but you will have such as are more ample by the way of instruction, doubt not, but you will have such as are more ample by the first form the Agent, with stock to your content from MASULAPATAM or PEGU, confiirms to the advice in my instruction. And Where with wishing you prosperity for present take leave and rest.

"Your very very loving friend

"J. B." (Captain JOHN BROCK HAVEN)

আজ থেকে সাড়ে তিনশত বৎসর পূর্বের অনুরূপ আরেকটি পত্র আমরা এখানে পেশ করবো যেটি ১৮ই জানুয়ারী, ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে লেখা। এই পত্রে বর্ণিত বিষয় হলো কিভাবে দুর্গম সমুদ্র পথে তিনজন ইংরাজ নাবিক হুগলী বন্দরে উপস্থিত হয়। উদ্দেশ্য হুগলীতে বাণিজ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও একটি ফ্যাক্টরী স্থাপন। সবচেয়ে লাভজনক যে সমস্ত পণ্য তা হুগলী বন্দর শহরে সহজ লভ্য। ঐ পণ্যগুলির শুল্কমুক্ত বাণিজ্য করার বাদশাহী ফরমান ইংরাজ বণিকদের সমুদ্রযাত্রায় দুঃসাহসী করে তোলে। কোম্পানী কর্তৃপক্ষের পরামর্শ বা নির্দেশেই সবকিছু ঠিকঠাক চলতে থাকে। কেবল প্রশ্ন ওঠে নিরাপদে হুগলী পৌঁছানো কিভাবে সম্ভব তাই নিয়ে।

Letter from H. GREEN H'LL and ROBERT DOUGHLY to the Court

Dated, "Fort st. George the 18th January, 1650"

"After a long and dubious expectation it pleased the Almighty of his goodness to period our cares in the safe arrival of ship Lyoness at this port 22th Aug. "Commanded by Capt. JOHN BROOK HAVEN.

We also find 30th ffactors designed on the Lyoness for HUGHLEE in the River GANGES. Mr. ROBERT SPAVIN, Mr. JAMES BRIDGMAN and Mr WILLIAM FFAIREFAX, the first of whome lived not to see this place, the other 2 are safely arrived, where deposture with other aforesaid ffactory ships and cargo must be the next subject of discourse.

And where as from ENGLAND you were pleased to designe that the ship should voiyage it up the River GANGES to HUGHLY, and settle a factory there etca, wee have formerly Vnderstand that passage to be full of danger caused it to bee disputed in consultation before the departure, where it was unanimously voted against the shipps adventuring thither, Therefore our Instructions limited here to the road of BALLASORE, With acquision of the princes firmand for free trade, was wholly reffered to the said captains discretion"

In the instructions of Caption Brook Haven we saw this intention to establish a factory at Hugli clearly indicated and in the following we see that it is accomplished".

আগ্রা থেকে হুগলী দীর্ঘপথ পার হয়ে স্থলপথে পৌঁছানো সম্ভব। ইংরাজদের আসল লক্ষ্য বাংলায় কুঠি ও ফ্যাক্টরী স্থাপন। বাংলার মসলিন বস্ত্রের আকর্ষনে দলে দলে ইংরাজ বণিকরা হুগলী চলে আসতে থাকে। হুগলী, বালাসোর, পাটনা, কাশিমবাজার নানাস্থানে কুঠি স্থাপন হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে। সেগুলিকে চালু রাখার জন্য এক একজন ইংরাজ কমিশনারকে এজেন্ট নিয়োগ করা হলো। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর থাবা সমগ্র বাংলাকে দখল করলো। পত্রের আদানপ্রদান থেকেই ইংরাজ কোম্পানীর উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়।

From SURATT Council to the Company

Dated, "SURATT, the 10th January 1651"

"What successe Mr. DAUIDG had in his court affaires, we have advised you of informer letters, many faire promise hath hee there received from courtiers and others and some valuable assistance hee had to wards teh recovery of MERZA MULKES debt. Some Phirmands hee also received from the king which have saved you some thousands of rupees in a transit duty and those who levied it Rhadarees HWIXT LUCKNOW and AGRA and HWIXT AGRA and this place, and may save you much more in BENGALA wheither MR. JESSON (now chiefe at AGRA) hath sent it upon the entreety of MR. BRIDGMAN and FDWD :

STEEVANS factors at HUGHLEY where they are settled for provision of salt peeter and sugar etca,"

১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দের কথা। হুগলীতে ইংরাজদের বাণিজ্যকুঠি চালু হয়েছে। হুগলীর এজেন্টকে ও তার পরিষদবর্গের কাছে লণ্ডনস্থ ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সদরদপ্তর থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ফ্যাক্টরীতে কোন্ কোন্ পণ্য দ্রব্য প্রস্তুত হবে বা বাংলা প্রদেশে কোথায় কোথায় নতুন ফ্যাক্টরী চালু করা হবে, জাহাজে কোন্ কোন্ দ্রব্য বহন করতে অগ্রাধিকার দিতে হবে, জাহাজী পণ্য কোন্ কোন্ দেশে রপ্তানী হবে তার বিশদ নির্দেশবার্তা পৌছে যায়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ছয়জনের একটি কমিশন গঠন করে দেয়। এরাই ভারতে কোম্পানীর বাণিজ্য নীতি কার্যকরী করাব জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কমিশনের সদস্যরা ছিলেন (১) মিঃ জি. গাউটন, (২) মিঃ থো বিলেজ (৩) মিঃ উইলিয়াম ব্লেক (Mr. Wm Black), (৪) মিঃ টমাস হপকিন্স, (৫) মিঃ রিচার্ড চেম্বারলন এবং (৬) মিঃ জন কেন।

কমিশনের তালিকার তুলাজাত সুতা, সোরা, মসলিন বা সিল্কের বস্ত্র বা বাংলার সিল্ক, ছিট ইত্যাদি দ্বারা পণ্যবাহী জাহাজগুলি ভর্তি হতো এবং সমুদ্রে পাড়ি দিত (Cotton yarne.... Salt peeter...., Bengali Silk....Sannoes Adatay, a kind of piece goods) পণ্য সামগ্রী নিয়ে। হুগলীতে যেখানে উপনিবেশ স্থাপন করা হয়, সেইখানে গাউটনকে এজেণ্ট নিয়োগ করে কোম্পানী। বাংলার চারটি প্রধান বন্দর শহরে ফ্যাক্টরী স্থাপিত হয়েছিল সে গুলির সবই হুগলীর এজেণ্টের অধীনে। ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দের লণ্ডন থেকে প্রেরিত এইরূপ একটি পত্র নিম্নে উল্লেখিত হলো।

From Letter of Court to "Our Agent and factory at Hugly" Date, "London, 27 February, 1657"

"Since dispeede of our prementioned of 31st December, we have proceeded and made some goods progresse as to the setting of our severell ffactories in all parts of India. And have concluded to reduce all ffactories both to the north wards and south wards. PERSIA and the BAY, to be subordinate vnto our PRESIDENCIE which wee shall settle at SURAT Wee have likewise resolved to establish 4 agencies, viz one at PORT ST GEORGE, One in BANTAM, a third in PERSIA and the other necessarilie reqires your knowledge of what wee have determined in ralation threre Vnto, which is as followeth, vzt.

"At HUGHLEY we do appoint

Mr GEORGE GAWTON to be our agent whose salaries we have setteld at 100 L p. annum

"At BALLASORE
"At CASSAMBAZAR
"At Pattana
"These are the 4 ffactories which we do determine shall be settled in the BAY of BENGALA, and that they shall be accompalable and subordinate to that Agencies of HUGHLY and from time to time follow such direction as they shall receive from you."

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁদেব বাণিজ্য বস্তুগুলি নিজেদের কোম্পনীব ব্যবহার স্বার্থে বাদশাহের কাছ হতে পেটেন্ট করিয়ে নেয়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আগ্রা থেকে বাদশাহী ফরমান লাভ করে ইংরেজ বণিকরা সমগ্র হিন্দুস্থান জুড়ে যে বাণিজ্য যাত্রার অভিযানের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই, নিজেদের ফ্যাক্টরীগুলিতে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী যাতে ভারতীয় বণিকরা কোন মতেই উৎপাদন করতে না পারে বা যে সব এলাকায় ইংরাজদের বাণিজ্য কুঠি আছে সেই সব রাজ্যে কোনমতেই যাতে ভারতীয়দের দ্বারা প্রস্তুত পণ্য বিক্রয়ার্থ প্রবেশ না করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়। ভারতীয় বাজার এলাকা বলতে তখনও মুখ্য ছিল বাংলা, পাটনা ও উড়িষ্যা। বাংলার নবাব শায়েস্তা খানও ইংরাজদের প্রশ্রয় দিলেন। ইংরেজরা যাতে বিনাবাধায় বাংলায় পণ্য সামগ্রী আমদানী করতে পারে বা বিদেশে বিনা শুল্কে জাহাজে রপ্তানী করতে পারে তার জন্য সীমাহীন সুযোগ নবাব শায়েস্তা খান তোষন করার জন্য ইংরাজ কোম্পানীব হাতে তুলে দিলেন। প্রিন্স শাহ সুজা থেকে নবাব শায়েস্তা খান পর্যন্ত সকলেরই আকাঙ্খা ভারতের বা বাংলার বাজার বিদেশীদের উপঢৌকন দেওয়ার প্রতি নিবিষ্ট। এইরূপ সাফল্যের স্বীকৃতি ইংরাজরা নিজেরাও কল্পনা করেনি। এ সম্পর্কে প্রামাণ্য একটিপত্র নিম্নরূপ ঃ—

"Letter patent to the ENGLISH in BENGAL"

"The Neshun or letter pattent of the Most Magnificent Prince SULTAN SHUJA given the Sixth month in the year of Higira one thousand sixty six in the 28th yeare of the Emperer SHAHJEHAN has glorious Reign," ie, in April, A.D. 1656 "BEE it Known to all great Governours, Chancellors, Farmers of Kings Rents, Collonells, Captaines, Rent Gatherers. Farmers of Customes, Watch men, fferrymen and other Petty officery that are now in place and hereafter shall be in the Kingdoms of BENGALA and ORIXA that this day THOMAS BILLIDGE and ENGLISHMAN humbly laid his suit before our splendid throne, Acquainting us

that the ENGLISH companyes according to the great Emperor letter patent which are unalterable, by his free grant therein specified. are custome free in there parts, as also complayneing that at present their trade with the country merchants. Our subject is much hindered by our governours of part townes & co., demandng the ENGLISH goods at their own rates and forbidding any merchants to buy or sell with them unless (they) condescend to their actions, and that the officers of their actions, and the officers of the Port Townes demand in this hundred costome on all goods imported or exported, as also anchorage in the goods, belonging to these kingdomes at BENGALA and ORIXA.

ইংরাজ বণিকদের পণ্যদ্রব্যগুলি সম্রাটের কাছ্ হতে পেটেন্ট করিয়ে নেওয়ার পর জনমনে প্রতিক্রিয়ার আঁচ করে কোম্পানী তার বিভিন্ন কুঠিয়ালদের কাছে বার্তা প্রেরণ করে জানায় যে সমুদ্রপথে অথবা সম্রাটের কাছ্ হতে অনুমোদন লাভের পর কোন বিরোধীতায় যেতে কেউ সাহস করবে না। কাজেই ইংরাজদের ফ্যাক্টরীগুলোও কোন সমস্যার মুখে পড়বে না, উৎপন্ন পণ্য সামগ্রী খুলে দেখা বা সেগুলো অনেক কম দামে বিক্রী করতে বাধ্য করা, কোনপ্রকার বাধা দেওয়া বা উৎপীড়ন করা সম্পর্কে সম্রাটের সুস্পষ্ট অভিমত কোম্পানী এজেন্টদের জানিয়ে দেয়। কোম্পানী আরও পত্রযোগে বাংলা উপনিবেশে অবস্থানকারী এজেন্টকে নির্দেশ পাঠায় ঋণ গ্রহণ করতে আসবে যে তন্তুবায়ী তাকে সর্বপ্রকার সাহায্য করা সম্পর্কে কোম্পানীর এজেন্ট যেন উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ করে।

মুঘল সম্রাটের কাছ্ হতে কোম্পানী যে সনদ আদায় করতে পেরেছে তার ফসল ঘরের মাটিতে পৌছে দিতে স্থানীয় শিল্পীদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতির সুযোগ সৃষ্টির জন্য কোম্পানী গভীর আগ্রহ্ প্রকাশ করে। নিম্নোক্ত পত্রটিতে এই্ সব কাহিনীর ব্যাখ্যাই বর্তমান ছিল।

"Vpon due consideration had of all which wee were pleased to grant, and hereby command you, that according the above mentioned letter Patent of the great Emperor, where words noe man dare presume to reverse the ffactry (of) the English Company be not more troubled with demands of custome of goods imported or exported either by land or by water, nor that their goods be opened and forced from them at under rates in many places of

government by which they shall pass or repass up and downe the Country, but that they buy and sell freely and without impediment, neither lett any molestation be given them, without anchorage, as formerly has binn also whenever they have order to build ffactoris or house in any part of these Kingdome that they be not hindered, part of these but forwarded, as also where there shall be any just and due debts coming from and subjects that all persons in office by helpful to the in their recovers giving protection to weavers, merchants or anyother that shall appear to be really to them. For all the aforesaid matters especilly regards is to be had that you carry yourselves strictly in obedience to the great Emperors leter Patents and this may Neshan now given the English Company having an espcially care that you faile not even in your complyance without Indebted thereon command".

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম গভর্নর উইলিয়ম হেজেস ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় যান এবং ঢাকায় বাংলার প্রসিদ্ধ তাঁতশিল্প সম্বন্ধে যা প্রত্যক্ষ করেছিলেন তৎসমুদয় একটি ডায়েরীতে লিখে রেখেছিলেন। উইলিয়ম হেজেসের উপরোক্ত ডায়েরীর পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে তিনি স্বহস্তে কিছু নোট রেখেছিলেন যেগুলোর অনুবাদ হয় পরবর্তীকালে। এগুলোকেও একপ্রকার 'ডকুমেণ্ট' রূপে বিবেচনা করা হয়। বাংলার নবাব শায়েস্তা খাঁ আগবাড়িয়ে কিভাবে ইংরেজেদের এদেশে 'ফ্রি ট্রেড' এর সুযোগ দিয়েছিলেন, ঐ সকল তারই প্রামাণ্য নথি।

Masters Diary transcribed in his handwriting the following documents:–

1) "Translate of Nabob SHAUSTEH CHAWN Lord of the Noblemen his confirmation of the ENGLISH Privilages in the kingdome of BENGALA—dated the 3rd day of the 3d : moneth in the 15th yeare of the glorious regirme of AURUNG ZEEB Emperor of the World."

2) "Translate of a letter from SHAUSTEH CAUNE. Lord the Noblemen, Perfect of BENGALA. in answer of one reecived from WARES CAWNE, the great Chancellor of the Province of BEARRA (OR PATTNA) about the English previlige in these parts of the Empire of SHAUH AURUNGZEEB, Emperor of Hindustan 5th moneth in the 18th yeare of the glorious regime of SHAUH AURUNGZEEB, Emperor of the world, to the most Excellent and Hon'ble WAREES CKAUNE Greeting:-

"Your letter have received wherein you write that the English have told you that according to the Emperor Letters Patent their company goods are made customes free, but there do not produce any such Original letters Patent to continue what they have and therefore (you) desire advice from me.....to which I answer that the English have not a phyrmaund or letters Patent from the Emperor aforesaid upon which I also gave them a grant of the said Privelidges in this province.....according to which and the said letters Patent you ought not to trouble or impede their trade on account of playing customs which is released to them".

ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে পাটনায় প্রথম ফ্যাক্টরী স্থাপন করে, কিন্তু ঢাকায় ফ্যাক্টরী নির্মাণ করে ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে। হুগলী ফ্যাক্টরী এর পূর্বেই চালু হয়ে গেছে। হুগলীতে কুঠি ও কাউন্সিল স্থাপিত হয়েছে। সংঘর্ষ হচ্ছে পর্তুগীজ বণিকদের সঙ্গে। বাংলার নবাবের সর্বপ্রকার সহায়তা পাচ্ছে কেবল উপনিবেশবাদী ইংরাজরা।

ঢাকাতে ফ্যাক্টরী স্থাপনের পিছনে ইংরাজদের উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ। প্রথমতঃ ইউরোপ বা ইংলণ্ড থেকে আমদানিকৃত পণ্য বিক্রয় করা এবং দ্বিতীয়ত মহামূল্যবান ঢাকাই মসলিন সংগ্রহ করা। ঢাকার পর ইংরাজরা ফ্যাক্টরী স্থাপন করে মালদহে, ঢাকায় ফ্যাক্টরী স্থাপনের উদ্দেশ্য সম্বলিত একটি পত্রও উদ্ধৃত করা হলো। পত্রটি কোর্ট অর্থাৎ সদরদপ্তর থেকে ২৪শে জানুয়ারী ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী বন্দর শহরে অবস্থানকারী কাউন্সিলের নিকট তাদের প্রেরিত পত্রের উত্তরে প্রেরিত হয়।

"We observe what you have writen concerning Decca that it is a ptace That will send much Europe goods and that the best cassaes Mullmais may there be procured It is our earnest desire as before intimated as large a quantity of broad cloathes as possible, may be vended by you. Therefore, you shall really find that setting a factory in that place will have occasion taking of some considerable quantity of our Manufactures and that (as you write) the advance of their samples will beare the charge of the factory, we then give you liberty to send 2 or 3 fitt persons theither to reside and to furnish them with cloth see proper for that place."

সপ্তদশ শতক জুড়ে এভাবেই English East India Company সুরাট থেকে শুরু করে দক্ষিণ ভারত, সেখান থেকে পূর্বভারতে একটির পর একটি ফ্যাক্টরী এবং আড়ং

(aurung) স্থাপন করে যার সাহায্যে সুতি ও বিভিন্ন প্রকার মসলিন বস্ত্র উৎপাদন ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন ক'রে ভারতের বাজার দখলের অভিযান শেষ করে। ইংরাজরা ভারতে প্রবেশের পর পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই বাদশাহ শাহজাহান, জাহাঙ্গীর এবং ঔরঙ্গজেব এই তিন ভারত সম্রাটের যুগে অসংখ্য ফ্যাক্টরী গড়ে তোলে করমুক্ত বাণিজ্য করার অনুমতি আদায়ের পর থেকেই। ইংরাজদের কাছে এ যেন 'ভি নি, ভি ডি, ভি সি' অর্থাৎ 'আসিলাম, দেখিলাম, জয় করিলাম'। ভারতবর্ষের মধ্যযুগের ইতিহাস মোগল সম্রাটদের সঙ্গে ভারতে আগত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গাঁটছড়া বন্ধনের ইতিহাস, এদেশের বুকে সামন্ততন্ত্র আর উপনিবেশবাদের মেলবন্ধনের ইতিহাস।

মোগল শাসনের ভিত ছিল কৃষি অর্থনীতি। বাংলার হস্তচালিত তাঁতশিল্প সম্পর্কে তাদের কোন সদর্থক ভূমিকা ছিল না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম গভর্ণর উইলিয়াম হেজেস তাঁর ডায়েরী পৃষ্ঠায় বাংলায় পদার্পনের পর থেকে সুতি ও মসলিন বস্ত্র তৈরীর ফ্যাক্টরী স্থাপনের ঘটনাবলী বর্ণনাকালে অসংখ্য পত্রের উল্লেখ করেছেন যার কয়েকটি উল্লেখিত হলো। এই একই প্রসঙ্গের শেষে তিনি মন্তব্য করছেন যা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। তাঁর মন্তব্য নিম্নরূপ ঃ—

"I Conclude this compilation regarding early Bengali Factories with a list of Company Servants on the coast and in the Bay in January 1652, the earliest I believe, that is to be found. (page cxcv)"

ঐতিহাসিক ল্যাকি তাঁর 'History of England' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ইংলণ্ডে শিল্পবিল্পবের অব্যবহিত পরেই ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাণী তাঁর স্বামীর সঙ্গে ভারতে যান এবং দেশে ফিরে এসে পূর্বভারতে প্রস্তুত সূক্ষ্ম কাজের মসলিন বস্ত্রেব প্রতি অসীম আগ্রহ প্রদর্শন করলে পর সাধারণ ইংলণ্ডবাসীদের মধ্যে মসলিন বস্ত্রের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শিল্পবিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ নাগরিকদের প্রতি কিছু নিষেধাজ্ঞাও বলবৎ ছিল। তাঁরা ইচ্ছা করলেই বাংলার মসলিন বস্ত্রটি ক্রয় করতে পারতেন না, ম্যাঞ্চেষ্টার বা অনুরূপ গুণমানে প্রস্তুত বস্ত্রই তাঁদের কিনতে হতো।

ইংলণ্ডে শিল্প বিপ্লবের প্রথম পর্যায় ১৭৭০-১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ। এরমধ্যে বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন জেমস ওয়াট (১৭৬৯ খ্রী)। তাছাড়া টেলিফোন টেলিগ্রাফ, ছাপাখানা আবিষ্কার বা টাইপ প্রস্তুতের ব্যাপার তো আছেই। জর্জ ষ্টিফেনসন আবিষ্কার করলেন দুর্ধর্ষ রেলইঞ্জিন। সুতা তৈয়ার যন্ত্র 'স্পিনিং জেনী' প্রস্তুত করলেন হারগ্রীভস (Hargreaves) ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে। দ্রুত চালানো যায় এরূপ উড়ন্ত মাকু আবিষ্কার করলেন জন কে (John Key's Flyshutte), যন্ত্রচালিত তাঁত বা পাওয়ারলুম তৈরী

করলেন জন কার্ট রাইট (John Cart Wright)। ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে ইংলণ্ডের বাজার ঢাকার মসলিন বস্ত্র রপ্তানীতে ভাঁটা পড়লো। অন্যদেশ থেকে পণ্যসামগ্রীর ইংলণ্ডে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞার মাত্রা বৃদ্ধি পেল। এমনকি ফ্রান্স, পর্তুগাল প্রভৃতি মিত্র দেশ থেকেও আমদানী নিষিদ্ধ ছিল। চীনের ক্ষেত্রেও একই পরিস্থিতি। এজন্য ইংলণ্ডের পার্লামেন্টে নতুন নতুন কতকগুলো আইন প্রণয়ণ করতে হলো। ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লব সঙঘটিত হওয়ার বহু পূর্ব থেকেই ইউরোপের দেশে দেশে ভারতীয় বস্ত্রসম্ভারের বাজার কিরূপ ছিল সম্প্রতি প্রকাশিত 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড অরগানাইজেশন (WTO)' এ 'দি ওয়ার্ল্ডব্যাংক ডেভেলপমেন্ট রির্পোট— ১৯৯১' এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে—"Centuries before industrial revolution, countries had learned to protect domestic market. Begining in the 13th Century, England enacted a set of laws that restricted the type and origin of fabrics which could be worn. Although some laws had social objective to indentify social classes through their customers the basis for others were clearly economic. In addition to law against import of French products, the British also protected producers against countries such as India. British producers in the 17th century succeeded in getting a law passed which prohibited import or wearing of silk and calicoes from China, India and Persia Restrictions on imported calicoes provided an impetus to England's calico-printing, silk and cotton linen industries."

ভারত, চীন প্রভৃতি দেশের বস্ত্রসম্ভারের ইংলণ্ডে প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞার চাপে ইংলণ্ডের অনেক সাধারণ নাগরিককে নিষেধাজ্ঞার কথা না জানা বা অজ্ঞতার কারণে ঢাকাই মসলিন ক্রয় করার জন্য প্রচুর জরিমানা জমা দিতে হয়েছে। রাজপরিবারের ক্ষেত্রে ঐ আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে ছাড় ছিল। কয়েকটি মসলিন বস্ত্র আদায়কারীর ক্ষেত্রে ইংলণ্ড অবশ্য এমন শর্ত আরোপ করে যার প্রতিটি দ্রব্যের জন্য ইংলণ্ডের রাজকীয় সরকারকে চড়াহাতে শুল্ক দিতে হতো। একই সময়ে ল্যাঙ্কাশায়ার, ম্যাঞ্চেষ্টার প্রভৃতি শহরের যন্ত্রচালিত তাঁত (Power Loom) থেকে যখন উৎপন্ন বস্ত্রসম্ভার বাংলা তথা ভারতের বাজারে প্রেরণ করতো তখন ইংলণ্ডের মার্চেণ্টদের কোন শুল্ক বহন করতে হতো না। নিঃশর্ত বাণিজ্যের অধিকার অত্যন্ত সুরক্ষিত ছিল। এধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে অনেক ইংরাজ বণিক নিজের দেশে শোরগোল তোলে এবং আইন পরিবর্তনের জন্য চাপ সৃষ্টি করে। বিরোধীয় বিষয়টি ইংলণ্ডের কমন্স্ সভার সিলেক্ট কমিটির নিকট সরকার বিচারার্থ প্রেরণ করলে অনেক ইংরাজ সিলেক্ট কমিটির নিকট প্রতিবাদী সাক্ষ্য দেয়। যুক্তিসহকারে ঐরূপ ব্যবস্থার বিরোধিতা করে।

ইংরাজ প্রতিবাদীদের এইরূপ আচরণ করার একটি কারণ ছিল। ইংলণ্ডের বাজারে আয়ারল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ডের ব্যবসায়ীরা যে সকল সুযোগ লাভ করতো একই সাম্রাজ্যের ছত্রছায়ায় বসবাসকারী সেই একই ইংরাজরা ভারত এসে সেই সুযোগলাভে বঞ্চিত হতো। ঢাকা পরগণার মসলিন বস্ত্র যে ভাবে ব্রিটেনের বাজার দাপটে দখল করেছিল তার চিত্র দেখে ইংরাজ ব্যবসায়ীরা ইংলণ্ডে বসে প্রমাদ গুণতে থাকে। 'ম্যাঞ্চেষ্টার চেম্বার অব্ কমার্স' তাদের উদ্বেগের কথা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে জানায়। বাংলার বস্ত্রশিল্প যেভাবে সারাবিশ্বে গৌরবান্বিত হয়েছে তদনুরূপ ইংলণ্ডের উৎপাদকরাও যাতে অগ্রসর হতে পারে এবং নিজেদের নৈপুণ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খ্যাতিসম্পন্ন হয় সেই বিষয়েও 'ম্যাঞ্চেষ্টার চেম্বার অব কমার্স' এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মধ্যে প্রচুর আলোচনা চলে। এই কাজে সফলতা লাভ না হওয়ায় ইংরাজ কোম্পানী ঢাকার মসলিন বস্ত্র উৎপাদক তাঁতশিল্পী ও তাঁতশ্রমিকদের ওপর দমনপীড়ন চালাতে শুরু করে যাতে শিল্পটিই জাহান্নমে যায়, বাংলার মাটি থেকে মসলিন নিশ্চিহ্ন হয়। শিল্পবিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার আকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা নেমে আসে।

জার্মান ঐতিহাসিক উইলিয়াম বোল্ট এই সময়ে বাংলায় এসেছিলেন। তিনি তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ 'কনসালটেসন অব্ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, বাংলার সিল্ক এবং মসলিন বস্ত্র উৎপাদক তন্তুবায়ীরা এই সময়ে এবং অনেক সময়েই ইংরাজদেব এড়িয়ে ওলন্দাজ বা ফবাসী বণিকদের কাছে উৎপন্ন বস্ত্রের ন্যায্যমূলেব আশায় বিক্রয় কবতো কিন্তু ইংরাজ কুঠিয়ালদের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, এ দেশীয় দালাল, পাইকার, মহাজন, দারোগা, পিয়ন তাঁতশ্রমিকদের ওপর নির্মম অত্যাচার চালিয়ে ইংরাজ এজেন্টদের কাছে আত্মবিক্রয়ে বাধ্য করাতো।

ঢাকাই মসলিনের খ্যাতি ও শোষনের চিত্র ঃ—বাংলা প্রদেশে প্রথম ইংরাজ পর্যটক র‍্যালফ ফিচ্ (Ralph Fitch) যিনি ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৫৮৬ খ্রীঃ) পর্যন্ত বাংলায় ছিলেন তিনি মন্তব্য করেছেন যে, ঢাকার সন্নিকটে সোনার গাঁয়ে (Sunargang) যে মসলিন প্রস্তুত হয় সারাভারতে সেটাই সর্বোৎকৃষ্ট। অপর একজন পর্যটক Linschoten ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মন্তব্য করেছেন যে, প্রচুর 'কটন লিনেন' সোনারগাঁওয়ে প্রস্তুত হয় তা অতি সূক্ষ্ম এবং কেবল ভারতে নয়, পূর্বদিকে এবং পর্তুগাল ও অন্যান্য দেশেও এর মর্যাদা অসীম। ঐতিহাসিক ষ্টুয়ার্ট তাঁর গ্রন্থ 'History of Bengal' এ উল্লেখ কবছেন যে, ঢাকাই মসলিনের কোন নকলও সম্ভব নয়। পর্যটক ট্র্যাভারনিয়র মসলিনবস্ত্রের সুখ্যাতি করতে মন্তব্য করেছিলেন যে, মসলিন এতই সূক্ষ্ম এবং হাল্কা যে হাতে আছে তা অনুভবই করা যায় না। (Scarcely to be felt in hand for they will spin the thread so fine that this eye can hardly

discern it, or atleast, it seems to be but a cob wed." (Ref. Travernior's Travels)

বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ মোগল বাদশাহ্ আওরঙ্গজেবের নিকট বৎসরে 'মালবুশ খাস' ('Mulbos Caus') নামক মসলিন বস্ত্র পাঁচশত পিস উপঢৌকন পাঠাতেন। মোগলদরবারের বেগম নূরজাহান 'মালবুশ খাস' মসলিন বস্ত্রের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর সময়েই ভারতসম্রাটের অন্দরমহলে ঢাকাই মসলিন এবং মালদহের সিল্কবস্ত্র সর্বাপেক্ষা উত্তম পরিধেয় রূপে গণ্য হতো।

মসলিন বস্ত্র 'মালবুশ খাস' যেহেতু কেবলমাত্র ভারতসম্রাট ও সম্রাজ্ঞীদের বা তাঁদের হারেমের মহিলা ও শ্রেষ্ঠা নর্তকীদের পরিধানের অধিকার ছিল তাই এই মসলিন প্রস্তুত করতে যাতে যথেষ্ট উন্নত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তার জন্য 'আড়ং' (aurung) এর কর্তারা 'মুকিম', 'দারোগো' প্রভৃতি ইনস্পেকটর নিয়োগ করতো। শাস্তি অনিবার্য ছিল তাঁতশ্রমিকের কপালে যদি মসলিন এর গুণাগুণে ত্রুটি ধরা পড়তো। সতর্কতার কারণে এই মসলিন ছিল অন্যান্য মসলিনগুলির থেকেও উৎকৃষ্ট। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকা শহরে এই মসলিন প্রস্তুত হয়েছিল। যে কারখানায় 'মালবুশ খাস' মসলিন তৈরী হতো তাকে বলা হতো 'রয়াল ওয়ার্কশপ' (Royal workshop)। সোনারগাঁও ও জঙ্গলবেরী গ্রামের কুঠিতে কমনশেড ছিল যেখানে তাঁতশ্রমিকরা মসলিনবস্ত্র বুনতো। 'মালবুশ খাস' বা 'জামদানী' নামক মসলিন বস্ত্রের সুতাও থাকতো অত্যন্ত উঁচুমানের এবং কাপড়ের পড়েনে যে সুতা থাকতো তা উঁচুমানের এবং একই মানের। 'মালবুশ খাস কুঠি' তে অবস্থানকারী দারোগারা নবাবের ইচ্ছামতো কারখানাগুলির কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য অসীম ক্ষমতা ভোগ করতো। কোন তন্তুবায় কি প্রকার বুননে দক্ষ তা যাচাই করে তাঁত শিল্পীদের দক্ষতার মাপকাঠিতে কাজে নিত। ইন্সপেকটাররা সুতাগুলির বাণ্ডিল ধরে ধরে পরীক্ষা করতো। পরবর্তীকালে ইংরাজ ঐতিহাসিক স্যর হেনরী কটন (১৮৯০ খ্রীঃ) উল্লেখ করেছেন—'১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ত্রিশ লক্ষ টাকা মূল্যের উৎপন্ন বস্ত্র সম্ভার রপ্তানী হয়েছিল। ঢাকা শহরেই তখন এই শিল্পের বাণিজ্যমূল্য ছিল এক কোটি টাকা। তখন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে থেকেও হস্তচালিত তাঁতবস্ত্র উৎপাদনে আত্মনিয়োগ করা হতো। ঢাকা শহরের বুকে আড়ংয়ে ইংরেজের কুঠির সামনে উৎপন্ন বস্ত্র বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে গরুর গাড়ি করে এনে জড়ো করা হতো'।

তাঁতবস্ত্র (মসলিন) উৎপাদন এই সময়ে এত গরিমাময় হয়ে উঠেছিল যে বাংলার প্রতিটি গ্রামে তন্তুবায়ীদের বসবাস ছিল। বাংলার বস্ত্র শিল্প ইংরাজদের দখলে চলে যাওয়ার পর থেকেই শুরু হয় সংঘাত। ইংলণ্ডের বস্ত্রশিল্পকে রক্ষা করতে হবে আবার বাংলার বস্ত্র শিল্প দখলেও রাখতে হবে। ইংরাজ বণিকরা যদি ইংলণ্ডের বাজারে ঢাকার মসলিন শতকরা পঞ্চাশষাট ভাগ কমদামেও বিক্রয় করতো তবেও তাদের মুনাফা অর্জিত হতো।

ইংলণ্ডের বস্ত্রশিল্পকে রক্ষা করতে এজন্য ভারতীয় পণ্যের ওপর সত্তর আশিভাগ শুল্ক বসানো হতো। শেষ পর্যন্ত ঢাকাই মসলিনের অস্তিত্ব নিয়ে টানাপোড়েন শুরু হয়ে গেল।

আড়ং, ফ্যাকটারী বা কারখানা ঃ—মোগল আমলে সামন্ততান্ত্রিক যুগে বাদশাহ নবাব-উজিরদের বাংলার তাঁতশিল্পের ওপর দৃষ্টি ছিল প্রখর। ইংরাজ আগমনের পূর্বে বাংলায় ফ্যাকটরী চালু হয়নি। তবে দক্ষ কারিগরদের কদর ছিল এবং তারা শ্রমিকের শ্রমমূল্যই অর্জন করতো। তাঁতশিল্পী বা শ্রমিকরা কমনশেডের তলায় কাজ করতো। এগুলোকেই মোগল আমলে বলা হতো 'কারখানা'। বাদশাহ ও বাংলার নবাব পরিবারের ব্যবহারের জন্য যে উৎকৃষ্ট মসলিন বস্ত্র প্রস্তুত হতো সেই কারখানায় সাধারণ ব্যক্তিদের জন্য কোন বস্ত্র তৈয়ার করা ছিল নিষিদ্ধ। বাছাই করা বিশেষ গুণসম্পন্ন শিল্পীদের প্রকৃতপক্ষে 'বন্দী' করে রাখা হতো। ইংরাজরা কারখানা গুলিকে বলতো 'হল'। উৎপন্নবস্ত্র সাধারণের মধ্যে বিক্রয়ের জন্য বা রপ্তানীর জন্য যে নির্দিষ্ট জায়গায় জড়ো করা হতো সেগুলোকে বলা হতো 'আড়ং'। 'আড়ং'য়ে উপবিষ্ট থাকতো মহাজনরা। আড়ংয়ে পৌঁছানোর জন্য তাঁতবস্ত্র শিল্পীদের মধ্যে ছিল প্রতিযোগীতা। পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে সম্রাট শাহজাহানের আমলেই ভারতে বিদেশী ইংরাজরা 'ফ্যাকটরী' স্থাপনের প্রথম লিখিত অনুমতি পায়। পরবর্তীকালে ঢাকা ছাড়াও বাংলার বিভিন্ন জেলায় ও পরগণায় ফাকটরী স্থাপন করে। হুগলী জেলার গোলাগড়, হরিপাল এবং পাণ্ডুয়ায় আড়ং এবং ফ্যাক্টরী' চালু করে। হুগলীতে 'আড়ং' এবং 'ফ্যাকটরী' নির্মানের জন্য বাদশাহও নবাবের অনুমোদন লাভ করে ছিল ইংরাজরা ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে এবং চালু হয় পরবর্তী বছব অর্থাৎ ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে। জনৈক ব্রুক হ্যাভেন (Brook Haven) হুগলীর আড়ং এবং কুঠির দায়িত্বে আসেন এবং হুগলী কুঠির কর্মচারীগণকে তাঁতীদের কাছ হতে সুক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র সংগ্রহের জন্য নির্দেশনামা জারী করেন।

পর্যটক ট্রাভারনিয়ার ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা শহরের বুকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একটি 'ফ্যাকটরী' পরিদর্শন করে মন্তব্য করেছিলেন 'tolerably handsome' এবং হলটির আকার আয়তন সম্পর্কে উল্লেখ করেছিলেন যে এটি একটি একতলা বাড়ি এবং বাড়ির মধ্যে ছিল একটি বড় হল, শয়ন কক্ষ, অফিস সবই। পরবর্তী কালে ১৭২৪ খ্রীঃ থেকে ১৭৩০ খ্রীঃ এই কয়বছরে ঢাকা শহরের বুকে পরপর চারটি ফ্যাকটরী ইংরাজরা স্থাপন করে যখন মোগল বাদশাহ ফারুক শিয়ার (Fruuok Shere) শাহ এদেশে তাদের নিঃশর্ত শুল্কমুক্ত বাণিজ্য করার অনুমতি পুনরায় প্রদান করে দিয়েছেন।

ইংরাজদের ব্যবসা নীতি ঃ—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তন্তুবায়ীদের কাছ হতে ঢাকাই মসলিন সুতিবস্ত্র, মালদহ সিল্ক, বাবনান চিকন, বালিদেওয়ানগঞ্জ থেকে তসর-সিল্ক বস্ত্র ইত্যাদি সংগ্রহ করার জন্য প্রথমে দালাল বা ব্রোকার নিয়োগ করতে শুরু করে। ঐ ব্রোকার বা দালালরা তন্তুবায়ীদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে অগ্রিম বা দাদন দিয়ে আসে।

ইংরাজরা প্রথম দিকে প্রয়োজনীয় মোট বস্ত্র মূল্যের অর্ধেক থেকে তিন চতুর্থাংশ পর্যন্ত অগ্রিম (বা অ্যাডভ্যান্স) দিয়ে দিত ঐ দালালকে। তবে সে চুক্তিমতো পণ্য সরবরাহ করতে না পারলে কঠোর শাস্তি ভোগ করতো। এই ভাবে জন্ম হলো 'দাদনি মার্চেন্ট'দের এবং "The company were invested with a prior right in the goods for which they contracted and hence their purchase in India acquired the name of an investment" এই ঘটনা ঘটতে থাকলো।

ঢাকা শহরের তাঁত শ্রমিকদের দুরবস্থা ঃ—ঢাকা শহরের বিভিন্ন মহল্লায় 'জামদানী' যাকে ইংরাজরা অভিহিত করতো 'Flowered muslin' এই নামে তা প্রথমে বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর পবিবারের জন্য কতকগুলো কারখানা এবং আড়ংয়ে নির্দিষ্ট ছিল। ইংরাজ রেসিডেন্টের প্রতিও সেই নির্দেশ ছিল। রেসিডেন্টের নিবাসকে অভিহিত করা হতো 'মালবুশ খাস কুঠি'।

'মালবুশ খাস' মসলিনের সুতো যেহেতু অত্যন্ত উন্নতমানের সেই কারণে এই বস্ত্রের আড়ংয়ে কর্মচারীসংখ্যাও থাকতো বেশী। অত্যন্ত দক্ষ বাছাই করা তাঁতশ্রমিক ছাড়াও পাঁচমিশালী সুতা বাছাই করার জন্যও থাকতো আরেক দল শ্রমিক। কোন শ্রমিকের কাজে সামান্য ক্রটিবিচ্যুতি ঘটলে তাকে পিয়ন এবং দারোগা 'আড়ং'য়ে ধরে আনতো। তারপর ইংরাজ রেসিডেন্ট তাকে বেত্রাঘাত করতো, তার জীবনসংশয় ঘটতো। প্রচণ্ড উন্নত গুণসম্পন্ন মসলিন বস্ত্র 'finished goods' হিসাবে বার হয়ে আসতো, মানে বা মাপে সামান্যতম কোন ক্রটি ইংবাজকুঠিয়াল সহ্য করতো না। তার লগ্নী (investent)-র বিনিময়ে প্রচুর লাভের প্রতি প্রখর দৃষ্টি ছিল। ইংরাজ রেসিডেণ্ট বা এজেন্ট আড়ং যেয় একজন পরিদর্শক নিয়োগ করতো যার বা যাদের কাজ ছিল সুতার গুণমান পরীক্ষা করা এবং তন্তুবায়ীদের হাতে 'তানা' তুলে দেওয়া। দারোগা এবং পিয়নরা প্রায়শঃই আড়ংয়ের শেডে কর্মরত শ্রমিকদের সামনে উপস্থিত হতো সুতা এবং উৎপন্ন বস্ত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য। তাদের হাতে থাকতো 'বিচুটি গাছের ছড়ি অথবা 'কাঁটা পূর্ণ' কোন গাছের ডাল। বেয়াদপ তাঁত শ্রমিকের রক্তে ভিজে যেত 'তাঁতকামান'।

'দি বেঙ্গল এজেন্সী' এবং ১৬৫৯ খ্রীঃ য়ে কাশিমবাজারের পরিস্থিতি ঃ—

ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে আগষ্ট থেকে কাশিমবাজারে প্রথম 'The Bengala Agency' গঠন করে। এরও অনেক পূর্বে ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায ইংরাজরা বেশ কয়েকটি ফ্যাকটরী নির্মাণ করেছে। 'আড়ং' চালু করে মসলিন বস্ত্র সংগ্রহ করছে-কিন্তু মোগল বাদশাহ আউরঙ্গজেবের নেতৃত্বে মোগল পরিবারের সদস্যদের মধ্যে রাষ্ট্র ক্ষমতাদখল নিয়ে গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ায় এবং বাংলার নবাব মীরজুমলা

ক্ষমতা দখলের গৃহযুদ্ধে আউরঙ্গজেবের পাশে দাঁড়ানোয় ইংরাজদের বাণিজ্যের ক্ষতিসাধন হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও দক্ষিণ ভারতের করমণ্ডল উপকূল থেকে বাংলায় বাণিজ্যপোতের গমনাগমন বন্ধ হয়নি। ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে 'জানুয়ারী বাংলা এজেন্সী'কে নির্দেশ প্রেরণের মাধ্যমে বাংলা থেকে জাহাজে পণ্য ওঠানামার একটা তালিকা কোম্পানী কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়। তাছাড়া কাশিমবাজার আড়ংয়ের জন্য বার্ষিক অর্থবরাদ্দ ঘোষিত হয়। কাশিমবাজার কুঠির মাধম্যে কাঁচা সিল্ক, চেলি, সুতিবস্ত্রের সুতা প্রভৃতি সংগ্রহের জন্য ইংরাজরা লগ্নী করে অঢেল। সুতার তানা ও পোড়েন রঙ করার পূর্বে গরম জলে ফুটিয়ে সুতার মাড় বার করে নেওয়ার বিশেষ পদ্ধতিটির প্রতিই বণিকদের প্রখর দৃষ্টি পড়তো। সুতা রঙ করার বিশেষ পদ্ধতি বা 'কোয়ালিটি ডাইং' এর কাজটিও 'আড়ং'য়েই সম্পাদিত হতো। 'সিল্কের চেলি' আঠা দিয়ে জোড়ার (gummed) কাজটি ইংলণ্ডেই সম্পন্ন হোত যাতে সেগুলি ইটালিয়ান সিল্কের সঙ্গে তুলনা করা চলে। কাশিমবাজার আড়ংয়ে চেলি প্রস্তুতের জন্য সিল্কের মূল্য তৎকালীন সময়ে যথেষ্টই বেশী ছিল। প্রতি পিস লম্বা চেলিবস্ত্রের মূল্য ছিল (২৬শে মার্চ, ১৬৫৯ খ্রীঃ) চারটাকা আট আনা থেকে চারটাকা বারো আনা। ছোট সাইজের মূল্য এক কুড়ি সতেরো থেকে আঠারো টাকা। সিল্ক (রেডি করা) প্রতি সেরের মূল্য ছিল তিনটাকা বারোআনা। কাশিমবাজার কুঠির কুঠিয়াল জন কেন কোম্পানী কর্তৃপক্ষের নিকট এক বার্তায় বাজার দরের এই তথ্য পেশ করেন।

এরপর ৫ই জুলাই, ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে কাশিমবাজার কুঠি থেকে এডমণ্ড ফস্টার জলযানে কাশিমবাজার আসার পথে চন্দ্রকোণার বাণিজ্য পণ্য সম্পর্কে কোম্পানীকে এক পত্রে অবহিত করান। চন্দ্রকোণা ব্যতীত তিনি বালি-দেওয়ানগঞ্জ (Ouda gunjay) এবং তার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোর কথা সবিস্তরে উল্লেখ করে জানিয়েছিলেন যে, ঐসব গঞ্জ এলাকায় (বর্তমানে হুগলী জেলার খানাকুল থানা) চিনি ও বস্ত্রসম্ভার তিনি দেখেছেন। সন্নিকটে সমুদ্র এবং গঙ্গানদীর শাখা থাকায় পার্শিয়া, গিনি প্রভৃতি দেশে প্রেরণের জন্য মসলিন সংগ্রহ করা হতো। এডমণ্ড ফস্টারের দাবী ঐ এলাকা তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেছেন। ঐ পত্রের কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হলো।

"I am the first Englishman that ever conveyed Chanderacona commodities by water, besides the discoverie of the trade of Oudagunijay and places adjacent, abounding in sugars, silk and other commodities proper both for Persia and Guinne, as cherconnas, checolas, rommalls, cateris all varieties of Silken, cotton and herba (grass-cloth) cloths, beside the convenience of lying neere the sea and upon a branch of Ganjes. The Government of HUGLEY had a strict order from Merjumbelo the last

yeare to hinder the shipping off our goods and s (t) opp our trade; neverthelesse, I sent downe the slipe to Ballasore to fetch up Agent Trevisa (for there was no possibilities of comeing by land) to treat with Merjumbelo and afterwards shipped of and conveyed all the goods safely to Ballasore"

এই পত্র প্রেরণের পর ঐ বছরের ২৩শে নভেম্বর তারিখে উক্ত দুই ইংরাজবণিক কেন্ এবং ফস্টার উভয়ে যৌথভাবে স্বাক্ষর করে কোম্পানীকে এক পত্রে কাশিমবাজারে মোটা কাপড় ছাড়া ইংরাজদের নিজেদের পণ্য বিক্রয়ের অভাবের কথা জ্ঞাত করান। কুঠিয়াল কেন্ যে গ্রামের কথা উল্লেখ করেছেন তাহলো খানাকুল থানার উদয়পুর গ্রাম। 'The English Factories in India' (by WILLIAM FOSTER) গ্রন্থে উপরোক্ত তথ্য দিয়ে বলা হয়েছে (পৃঃ ২৯৫) যে, 'Oedaygym' গ্রামটি প্রকৃতপক্ষে 'Uodaypoor' এবং Cannacoel' গ্রামটি বর্তমান খানাকুল। কানা দ্বারকেশ্বর নদীর ধারে এবং খানাকুল থানার দক্ষিণে-পূর্বদিকে উদয়পুর অবস্থিত। ওলন্দাজ বণিকরা ঐ গ্রামে একটি সিল্ক ফ্যাকটরি স্থাপন করেছিল। উদয়পুর গ্রাম বর্তমানে গনীজেলার খানাকুল থানার অন্তর্গত এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম।

গোমস্তারাও ক্ষমতাধর ঃ—বাংলায় তাঁতশিল্পের প্রসার ঘটানো নয়, ইংরাজদের 'সাধু' উদ্দেশ্য ছিল বণিকের মানদণ্ড নিয়ে ভারতে প্রবেশ করবে, পরে রাজদণ্ড ধরা। প্রথম ওরা বেছে নিয়েছিল বাংলার গ্রামাঞ্চল। শহরের গঞ্জে উৎপন্ন বস্ত্র ক্রয় বিক্রয়ের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গৃহীত হলেও গ্রামবাংলায় মসলিন বা সুতীবস্ত্র উৎপন্নের অসংখ্য কেন্দ্র বা 'আড়ং' প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরাজদের অনুগৃহীত এদেশীয় গোমস্তাদের যাবতীয় সহায়তা করা রাজকর্মচারীদের কাজ ছিল, প্রজাদের প্রতিও অনুরূপ নির্দেশ ছিল বাংলার নবাবের। বাংলার নবাব ১৬৫৬ খ্রীঃ আবার হিন্দুস্তানের বাদশাহর ফতোয়ার কথা তুলে ধরেন। রাজকর্মচারীদের প্রতি নবাবের হুকুমই ছিল ইংরাজদের পণ্যদ্রব্য খুলে এবং দেখা স্থলপথ জলপথ কোন পথেই যেন ইংরাজদের কাছে বিক্রয়ার্থ আনীত দ্রব্য ক্রয় করা না হয়। ঐ পরোয়ানার বলে ইংরাজদের এদেশীয় দালাল বা গোমস্তারাও অমিত ক্ষমতাধর হয়ে উঠলো। গোমস্তাদের কোন অন্যায় কাজেও বাধা দেওয়া যাবে না এমনই নির্দেশ নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর। হিন্দুস্তানের যে কোন বন্দর বা গঞ্জ থেকে তো বটেই যে কোন বিদেশী বন্দর থেকে নোঙ্গর করা জাহাজে যে পণ্যই আসবে তার কোন শুল্ক আদায় করা যেন না হয় তার জন্য সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা বাংলার নবাবের তরফ থেকে জারী হয়েছিল ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। ইংরাজরা যাতে বিনা বাধায় ('no impediments') স্থানীয় বাজারে তাদের নিজস্ব এবং নিজেদের দেশের পণ্য বিক্রয় করতে পারে তার জন্য রাজকর্মচারীদেরই ওদের সাহায্যদানে হাত দিতে হতো। যদি এদেশীয় কোন তন্তুবায়ী বা ব্যবসায়ী ইংরাজদের নিকট ঋণগ্রহণ করে থাকে এবং ইংরাজরা যদি সেই ঋণ সুদে আসলে আদায় করার

জন্য কোন নিষ্ঠুর পন্থা অবলম্বন করে তবে সেই পন্থাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে হবে। ইংরাজ নিযুক্ত গোমস্তাদের ওপর কোন 'অত্যাচার' চালানো চলবে না এটাই আইন এবং এই আইন কেউ ভঙ্গ করতে পারবেনা। বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত নির্দেশ নাম ছিল হুবহু নিম্নরূপ ঃ—

"His Highness (Nawbob) orders that according to the commands of His Majestty, no one shall molest the gumashtas of the English on account of anchorage etc. They (the officials) shall not open the goods of the English, either on roads or on ferries, to buy them forcibly, Considering their goods as exempted from duties on the strength of the said commands, no impediments shall be offered to the gumashtas of the English in any circumstances in passing them, so that they may, with their minds at ease, bring the goods from the neighbouring ports and sell them to local traders and such other persons as are acquinted with them and willingly desire to have transaction with them, Every assistance shall be given to gumashtas of the English in whatever place they store their goods and sell them. If the traders and weavers be in debt to these English People, every facility shall be offered them to realize the amount actually due. At no time concession shall be allowed or favour shown to an particular person, so that no one may oppress the gumoshstas of the English. All are required to act up to the positive command and august nishan, which they must never infringe" (Ref. The English Factories in India. By William Foster, P. 11)

বাংলার নবাব দেশীয় বস্ত্রব্যবসায়ীদের কোন সুযোগ দেওয়াতো কোন্ ছাড় ইংরাজরা যাতে বিনাবাধায় নিঃশুল্কে সিল্ক বস্ত্র সংগ্রহ করতে পারে বিশেষতঃ বাংলা সিল্কের জন্য হন্যে হয়ে যে ইংরেজ ঘুবে বেড়াত সেই বিদেশী বণিকদের সামনে বাংলাব দরজা হাট করে খোলা হয়ে গেলো। বাংলার সিল্ক দিয়ে বস্ত্র তৈয়ার করতে তারা একই ধরনের মসলিন থ্রেড ব্যবহার করতো। সিল্ক সুতো সংগ্রহ, বস্ত্র প্রস্তুতের পিছনে কোন্ প্রকার নৈপুণ্য কাজ করেছে, কি ভাবে বাজারে পণ্যের ক্রয় বিক্রয় ঘটেছে ইংরাজ বণিকদের বণিকসুলভ কাজ কর্মের ধরণ, বয়ন পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান ইত্যাদি বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে নিম্নে উল্লেখিত একটি চিঠিতে ঃ—

"The Bengal Agency 1658 :– Of the directionns concerning merchandize we need only notice those relating to the purchase of silk. In our preceeding letter you will perceive that we gave

you order to furnish us with Bengala Silk to the value of 30001Stering, and desired that it might be sent us in long Skaynes, if procurable. But since the dispeeding of these advices wee have had some conference and received direction from a workman, who from experience adviseth us to contradict that our order of having the silk long skaynes, because their lengths causeth them in the winding very much trouble. Wee therefore herewith send you a skayne of silk for a patterne, of which length wee desire that parcell may be procured; and entreate you to take espetiall care that it will be well sorted and chosen, that the insides of the skaynes may be answerable in goodness to the outsides and that it may be made a perfect thread, singly reeled, and not two threads together. And if you shall send us any of that sort of Silk which usually goes here under the names of Piggtails, alter not of the lengths of the skayne from what formerlie, but take a more than ordinarie inspection into sort, which useth to come very artificially covered with fine silke, and the middle of the skaynes extraordinarie course and fowle, to the great disparagment of the commoditie when it comes to sell. (The English Factories in India W. Fostor, Page-191)

ভারতীয় শিল্প ধ্বংসের উদ্যোগ ঃ—ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা প্রদেশে সর্ব প্রকার মুক্ত বাণিজ্যের নিঃশর্ত অধিকার পাবার পর হিন্দুস্তানের স্বাধীনতা এবং বাংলার তাঁতশ্রমিকদের স্বাধীনতা ক্রমশঃই সঙ্কুচিত হয়ে পড়লো। ইংরাজ বণিকরা স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে পাঞ্জা কষা শুরু করলো। স্থানীয় বণিকদের সঙ্গে ব্যবসায়গত দ্বন্দে লিপ্ত হয়ে পড়লো। ইংরাজ বণিকদের প্রখর দৃষ্টি ছিল মসলিন, সিল্ক রেশম ছাড়াও চিকনের কাজের প্রতি। ব্রিটিশদের ভারতে আগমনের পূর্বে বাংলার এই গৌরান্বিত শিল্পকার্যের প্রতি যে আগ্রহ, নিষ্ঠা বলবৎ ছিল ওরা আসবার পর অস্তিত্বের সংকটই দেখা দিল। একদিকে ম্যাঞ্চেষ্টারজাত বস্ত্র সম্ভার অন্যদিকে ইংরাজদের প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য ফ্যাক্টরী ও মিল দেশের সিল্কজাত বস্ত্রাদির সংকট ডেকে আনলো।

সিল্ক অধ্যুষিত বাংলার প্রতিটি জেলায় কোম্পানী একজন 'কমার্শিয়াল রেসিডেণ্ট' নিয়োগ করতো। যত সিল্ক থ্রেড সংগ্রহ করতে পারতো ততই লাভের অঙ্ক বৃদ্ধি পেতো। কোম্পানীর এই কাজে যে সমস্ত এদেশীয় ব্যক্তি সহায়তা করতো তারা মোট মূল্যের ওপর কিছু কমিশন পেতো। এদের বলা হতো 'কমিশন এজেণ্ট।' 'রেসিডেণ্ট' বা 'কমার্শিয়াল এজেণ্ট' রেশমগুটি চাষীদেরও 'অ্যাডভান্স' বা 'দাদন' দিত। আবার যারা

গুটি থেকে সুতো তৈরী করতো এবং ঐ কাজে লিপ্ত বিভিন্ন গ্রামের অসংখ্য মানুষজনকেও 'দাদন' দিত। রেশমগুটির চাষ এবং গুটি থেকে কাঁচামাল বা থ্রেড প্রস্তুতের কাজ উভয় প্রকার কাজের গ্যারাণ্টী ইংরাজরা আদায় করে নিত। 'অ্যাডভান্স' বা 'দাদন' দিয়ে যে মানুষজনকে ওরা তাঁবে রাখতো তাদেরকে কোম্পানীর আইনের আওতায় এনে 'আর্নেষ্ট মানি' বা 'বায়না' রেকর্ড করতো। যত বেশি সিল্ক ফাইবার বা থ্রেড স্থানীয় গোমস্তা বা কমিশন এজেন্টরা সংগ্রহ করতে পারতো, ইংরাজ কমার্শিয়াল রেসিডেণ্ট তত বেশি তাদের মজুরী দিত। এই কাজে দেখা দিত অনিবার্য স্বার্থের সঙঘাত। কমার্শিয়াল রেসিডেণ্ট বা কোং এজেণ্টদের সঙ্গে স্থানীয় বণিকদের যে সঙঘাত শুরু হয়েছিল তার মাত্রা বৃদ্ধি পেল গোমস্তা এবং অন্যান্য পাইকার ও দালালরা শিল্পী ও শ্রমিকদের ওপর জোরজবরদস্তি বলপ্রয়োগ শুরু করায়। গোমস্তা-পাইকার-দালাল জোটের স্বার্থের সঙ্গে ইংরাজ কমার্শিয়াল রেসিডেণ্ট এবং অন্যান্য ইংরাজ বণিকদের স্বার্থের ভয়ঙ্কর সঙ্ঘাত সৃষ্টি হলো। ইংরাজ বণিকদের মধ্যে একটা উন্নাসিক ভাব বরাবর বজায় ছিল। সমস্ত সঙঘাত এবং প্রতিযোগীতা ছিল অসম মাপের। কার্যতঃ অসম লড়াই। একপক্ষের হাতে প্রচুর লোকজন, রাষ্ট্রক্ষমতার সাহায্য, অস্ত্রশস্ত্র এবং সর্বোপরি মুদ্রার থলি, অপর পক্ষের ঠিক বিপরীত চিত্র।

ইংরাজ বণিকরা দুইজন কর্মচারীকে টাকার থলি এবং একটা রেজিষ্টার খাতা সঙ্গে দিয়ে প্রত্যেক গ্রামে প্রেরণ করতো। যারা 'অ্যাডভান্স' বা 'দাদন' গ্রহণ করতো তালিকায় তাদের নাম লিপিবদ্ধ হতো। যদি কোন শিল্পী প্রকাশ করতো সে অন্য কোন বণিকের সঙ্গে পূর্বেই চুক্তিবদ্ধ হয়েছে তবে বাড়ি পর্যন্ত পাইকার বা গোমস্তারা ধাওয়া করতো। বাড়ির মধ্যে প্রথমে একটা কয়েন বা টাকা ছুঁড়ে দিত। তারপর জোর সত্বে তার নাম ইংরাজবণিকের রেজিষ্টারে তুলে দিত। আপত্তি করলে বাড়ির সামনে একজন 'পিয়ন' বসিয়ে চলে যেতো। ঐ পিয়নের যাবতীয় খরচ বহন করতে হতো তন্তুবায়ীকে। গোমস্তা রেজিষ্টারে তন্তুবাযীর নাম তোলার সময় স্থানীয় সাক্ষী রাখতো, যে টাকার বহন করতো তাকেই সাক্ষী করা হতো। অন্য যে বণিকের কাছে এ শিল্পী তার দ্রব্যসামগ্রী বিক্রী করার জন্য আগে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল ইংরাজ রেসিডেণ্টের আদেশে ঐ বণিকের বাড়ীর সম্মুখে যে সমস্ত শ্রমিক সমবেত হয়েছিল পণ্য বিক্রয়ের জন্য তাদের সকলকে তুলে নিয়ে যাওয়া হতো। আর ঐ প্রাইভেট ট্রেডার বা বণিকের যাবতীয় সম্পত্তি জোর করে ইংরাজ কোম্পানী দখল করে নিত। তন্তুবায়ীর সম্পত্তি সামান্য হলেও ইংরাজদের দখলে চলে যেত।

মিঃ হেনরী গোগর (Henry Gougar) নামে একজন প্রাইভেট ট্রেডার ইংরাজ বণিকদেরই কোপদৃষ্টিতে পড়েছিলেন। তাঁর কাছে তাঁতীরা পণ্য বিক্রী করতে আগ্রহ প্রকাশ করতো কোম্পানীর রেসিডেণ্টের অজ্ঞাতসারে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পাণীর আদালতে

তাঁকে বিচারের জন্য সোপর্দ করা হয় এবং বিচারে তাঁর দুইবছর কারাদণ্ড হয়। মিঃ হেনরী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোন এজেন্ট ছিলেন না। হেনরী গোগর পরবর্তীকালে এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেন তাঁর "Personal Narrative of the Two years Imprisonment in Burmah" গ্রন্থে। কয়েকটি লাইন ঐ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করা হলো ঃ—

"Nor does the oppression stop here, If I sued the man in Court for repayment of money I had thus been defrauded of, the Judge was compelled before granting a decree in my favour, to ascertain from the Commercial Resident whether the defaulter was in debt to the East India Company. If he was a prior decree given to the Resident and I lost my money." (Ref. Ruins of Trade and Industries in India by Major B. D. Basu. P. 91)

মিঃ হেনরী লিখেছেন যে, কমার্শিয়াল রেসিডেন্টের হাতে আরও একটি মোক্ষম অস্ত্র ছিল। সেটা হল এই যে, গুটি পোকা বা রেশমের চাষ করতো যেসব কৃষক বা চাষী তাদের পণ্যের মূল্য নির্ধারণ হতো সিজনের শেষে এবং তখন চাষী দাম পেতো। 'প্রাইভেট ট্রেডার'দের জব্দ করার জন্য ইংরাজ রেসিডেন্ট হঠাৎ হঠাৎ পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করতো এবং নিজের খুশিমতো। পাইকার, দালাল বা গোমস্তার প্রাপ্য কমিশনের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটতো সংগৃহীত সিল্ক তন্তুর মূল্য যতটা কম বা বেশি তার ওপর। তাঁতীর হাতে কিন্তু কোনমতেই টাকা পৌঁছতো না। টাকা পৌঁছাতো তার প্রভুর কাছে যার হেফাজতে থাকতো 'দাদন' দেওয়ার নিমিত্ত কোম্পানী-রেসিডেন্ট প্রদত্ত 'টাকার থলি'।

'The Manchester Chamber of Commerce' ভারতে বস্ত্রশিল্প ব্যবসার উন্নতি বা গুণগত মানের প্রশংসা করতে ঐ সময়ে যে সব মন্তব্য প্রকাশ করেছিল, তার সারমর্ম হলো নিম্নরূপ ঃ—

"ভারতের রপ্তানী যোগ্য পণ্যের উৎপাদন এবং উন্নয়ন নিঃসন্দেহে ভারতের কল্যাণসাধন করবে তবে কেবল ভারতেরই নয় তার সঙ্গে এই দেশেরও (ইংলণ্ডের -লেখক) কল্যাণসাধন করবে। গ্রেট বৃটেনের সুতিবস্ত্র উৎপাদনের বিষয়টিকে সমৃদ্ধশালী করে তোলা অতি গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের সুতিবস্ত্রের মানোন্নয়নের পিছনে এটা একটা কারণও বটে। ভারত যাতে উন্নয়নের প্রক্রিয়াটি দ্রুত সম্পাদন করতে পারে তারজন্য তাকে সমস্ত প্রকার সুযোগ বিশেষ করে ব্যয়ভার বহনে সমর্থ হওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। আমাদের এসম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন প্রস্তাব নেই যতদিন না ব্রিটিশ নাগরিকদের ঐ দেশে জমি পাওয়ার ব্যবস্থা হয়।" (সূত্র ঃ— Ruins of Trade and Industries in India by Major B. D. Basu)

উপরোক্ত মন্তব্যে একটি বিষয় খুবই পরিষ্কার যে, ভারতের সুতিবস্ত্র উৎপাদনের মনোন্নয়নের সঙ্গে গ্রেট ব্রিটেনের সমৃদ্ধি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিল। তার জন্য অর্থের প্রয়োজন যা হতো ম্যাঞ্চেষ্টার চেম্বার অব কমার্স তা বহন করতে প্রস্তুত থাকতো। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সর্বোতোভাবে এই ইচ্ছা পোষণ করতো যেন ভারতে বস্ত্রব্যবসায়ে বা উৎপাদনে তাদের কোন প্রতিদ্বন্দিতার সম্মুখীন হতে না হয়। ভারতে শিল্প বলতে ইংরাজদের প্রতিষ্ঠিত কারখানা বা ফ্যাক্টরীই কেবল থাকবে-ভারতের অধিবাসীরা যদি দুর্ভিক্ষ, প্লেগ, মহামারীতে নিশ্চিহ্নও হয়ে যায় তথাপি ভারতে ইংরাজদের চালু করা ফ্যাক্টরীতে উৎপাদন এবং তাদের নিজেদের ও অন্যান্য দেশে উৎপাদিত পণ্য শুল্কহীনভাবে টেনে নিয়ে যাওয়া এবং ম্যাঞ্চেষ্টারের বস্ত্রসম্ভার যা অতিরিক্ত হবে তা দিয়ে এদেশের বাজার দখল করা (যার জন্য এদেশের বস্ত্রশিল্প মার খেতো) ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীদের এই সব মহান উদ্দেশ্য ছিল।

বোল্টের প্রতিবাদী ভাষা ঃ— ইংরাজ ঐতিহাসিক উইলিয়ম বোল্ট বর্ণনা দিয়েছেন কিভাবে কোম্পানীর এজেন্টরা এদেশের তাঁতীদের কাছ হতে মুচলেকা আদায় করতো, চুক্তির শর্ত পূরণ করতে না পারলে কি ধরনের শাস্তি জুটতো তাঁতশিল্পীদের কপালে।

"The Indian Weavers upon their inability to perform such agreements as have been forced upon them by Company's Agents universally known in Bengal by the name of Mutchulekha's have had their goods seized and sold on the spot to make goods the deficiency ; the winders of raw silk called Nagoads, have been treated also with such injustice, that instances have been known of their cutting off their thumbs to prevent their being froced to wind silk." (Ref. Ibid P. 122)

দরিদ্র তাঁতশিল্পীদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কর্তনের আনন্দে আহলাদিত হতো ইংরাজবণিকরা, কারণ এরপর আর সেই শিল্পীর পক্ষে নৈপুণ্যের সঙ্গে বস্ত্র বয়ন করা দূরের কথা বয়ন কার্যই আদৌ করতে পারবে না। তাদের এই ভূমিকা প্রকৃতপক্ষে শিল্পী ও শ্রমিকদের নিরস্ত্র করারই নামান্তর মাত্র।

ঐতিহাসিক বোল্ট নিজেদের দেশের বণিক কোম্পানীর কীর্তিকলাপ দেখে অত্যাচার নিপীড়নের যে বর্ণনা রেখে গেছেন তা পাঠে শিউরে উঠতে হয়। বোল্ট বর্ণনা করেছেন যে, হতদরিদ্র তাঁতীদের ওপর কোম্পানীর এজেন্ট, গোমস্তা, দালাল, পিয়নরা রোজই নির্মম অত্যাচার করতো, অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হতো। যার ফলে তাঁতীদের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পায়। অনেকে দেশত্যাগ করে। কেউবা আত্মগোপন করে। কেউ পেশাই ত্যাগ করে অনাহারের মুখোমুখি হয়। আত্মহত্যার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। বোল্টের বর্ণনার ভাষা নিম্নরূপ ঃ—

"Various and innumerable are the methods of oppressing the poor weavers, which are daily practised by the Compny's Agents of gomostahs in the country ; such as by fines, imprisonments, flogging, forcing from them etc, by which number of weavers in the country has been greatly decreased." (Ref. William Bolts' Consideration of Indian Affairs, London, 1772)

বোল্ট ভারতীয় তন্তুবায়ীদের দুর্দশার কথা বর্ণনা করেছেন একেবারে নির্দ্বিধায়। কোম্পানীর অফিস এবং গোমস্তা আর দালালদের সাঁড়াশির চাপে তখন তাঁতশিল্পী ও কৃষকদের দুর্দশা চরম। একদিকে অফিসাররা 'রেন্ট' সংগ্রহ করার জন্য কৃষকদের ওপর অত্যাচার চালাতো তেমনি গোমস্তা, মহাজন, দালাল চটজলদি অথচ উন্নতমানের মসলিন বস্ত্র উৎপাদনের জন্য তাঁতশ্রমিকদের বেত্রাঘাত করতো, পিঠে চাবুক মারতে মারতে অজ্ঞান করে দিত। মানুষ মারা গেলে 'রেন্ট' আর দেবে কে? ফলে কোম্পানীর রাজস্ব আদায়ে ঘাটতি দেখা দিত। এরূপ পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বোল্ট উদাহরণ দিয়ে বলেছেন—"Such a practice cannot otherwise be considered than like the idiot practice of killing the prolific hen to get her golden egg all at once." ("Consideration of Indian Affairs")

উইলিয়ম বোল্ট অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের ভারতীয় তাঁতশিল্পীদের মধ্যে ইংরাজদের এড়িয়ে ওলন্দাজ ও ফরাসীদের মধ্যে মসলিন বা সিল্ক বস্ত্র বিক্রয়ের প্রবণতার কথা উল্লেখ করে লিখেছেন যে, মূলতঃ নগদ এবং ন্যায্যদামের আশাতেই তাঁতীরা ডাচ্ ও ফরাসীবণিকদের কুঠিতে জড়ো হতো। আর এতে ক্রুদ্ধ হয়ে ইংরাজ কোম্পানীর গোমস্তা, দালাল, মহাজন আর পাইকাররা এদেশীয় শিল্পীদের লোহার বেড় পরিয়ে রাখতো, বস্ত্রের নগদমূল্যের পরিবর্তে কপালে জুটতো বেত্রাঘাত।

বোল্ট নিজেই উল্লেখ করেছেন মোগল আমলে এবং বাংলার নবাব আলিবর্দীর আমলে তাঁতীরা স্বাধীনতা ভোগ করতো, কোন নির্যাতন ছিলনা।

"In the time of Mogal Government and even in that of Nawab Alivardi Khan, the weavers manufactured their goods freely and without oppression" ("Consideration.......Affairs".)

ঐ সময় এজন্য বাংলায় অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবার তাঁতবস্ত্রাদি উৎপাদনের এবং ব্যবসায়ের কাজে আত্মনিয়োগ করতো। নিজেদের হিসাব নিজেদের কাছেই রাখতো। লাভ লোকসান যা হতো নিজেদেরই হতো। এর সুবিধা অনেক ইংরাজ বণিকও ভোগ করতো। ঢাকার এক ইংরাজ বণিকের বাসভবনের দ্বারে আটশ পিস মসলিন বস্ত্র নিয়ে একদিন প্রাতে হাজির হয়েছিল তন্তুবায়ীরা। তখন নবাব আলিবর্দীর আমল। ইংরাজ বণিকদের বাসভবনের দ্বারে তাঁতীরা এসে ঘণ্টা বাজাতো, যাতে সাহেব ভবনের বাইরে এসে সমাগত তাঁতীদের পণ্য ক্রয় করেন।

জার্মান ঐতিহাসিক ও পর্যটক বোল্ট ভারতের তৎকালীন ব্রিটিশ সর্বময় কর্তা লর্ড ক্লাইভের সময়ে কিভাবে আইনকে পদদলিত করে বাংলার তাঁতীদের সর্বনাশ ঘটানো হয়েছিল তার উল্লেখ করে লিখেছেন—"The last king of workmen (winders of raw silk) were pursued with such riguor during Lord Clive's Late Government of Bengal, form a zeel for increasing the Company's investment of raw silk, that the most sacred laws of society was atrociously violated"

বাংলায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পাণির বাসনা ছিল বাংলার বস্ত্রশিল্প পুরোপুরি হাতের মুঠোয় এনে নিজেদের লগ্নী মূলধনের ওপর লাভ একচেটিয়া করা। এর ফলে ইংরাজ কোম্পাণির কাছে নতিস্বীকার করে তাঁতশিল্পীরা গোলামে পরিণত হয়েছিল। অত্যাচারের ভয়াবহতার মুখে বিদ্রোহ সঙ্ঘটিত করারও কোন উপায় ছিল না।

এক সময় বাংলার তাঁতীরা কার্পাস তুলার চাষ নিজেরাই করতো। কখনও কখনও দেশের উত্তর পশ্চিম প্রান্ত থেকে গঙ্গা যমুনার অববাহিকা থেকেও তুলা আমদানি করতো। কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলার দূরবর্তী গ্রামগুলোর তন্তুবায়ীদেরকে বাধ্য করেছিল সুরাট বন্দর থেকে সুতা ক্রয় করে আনতে। কারণ ইতিমধ্যে ম্যাঞ্চেষ্টার থেকে পাওয়ারলুমে প্রস্তুত তন্তু সুরাট বন্দরে আমদানি করা শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাঁতীরা কোথা থেকে সুতা কিনবে সেই ইচ্ছার প্রতি তার কোন স্বাধীনতা ছিল না।

বাংলার তাঁতীশিল্পীদের দ্বারা প্রস্তুত সিল্ক, তসর প্রভৃতির কাটপিস প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করে কোম্পানি রপ্তানি করতো তাদের বিভিন্ন বিক্রয় কেন্দ্রে। বসরা, জেদ্দা, মক্কা, বোম্বাই, সুরাট, মাদ্রাজ প্রভৃতি কেন্দ্রেই প্রধানত এই পণ্য রপ্তানি হতো, যার জন্য কোন শুল্ক ভারত সরকারকে দিতে হতো না। বোল্ট নিজে স্বচক্ষে যা দেখেছেন, তা নিয়ে বিশেষতঃ এদেশীয় বণিকদের স্বাধিকারহীনতা দেখে আশ্চর্য হয়ে ঐ সময়েই নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছিলেন ঃ

"We have seen all merchants from the interior parts of Asia effectually prevented from having any mercantile intercourse with Bengal are in fact deprived of all trade within those provinces, it being wholy monopolised by a few Company's servants and their dependants"

বোল্টের এর পরের প্রশ্ন ঃ—"In such a situation what commercial country can flourish ?

"While the company and their substitutes, by a subdivision of the rights of mankind, in the unrsterained excercise of every species of violence and injustice, these are suffered to monopolise

not only the manufacturers, but the manufacturers of Bengal." উইলিয়ম বোল্ট অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই বর্ণনা করেছেন নিয়ন্ত্রণহীন সন্ত্রাস এবং অবিচারের কথা যার জন্য বাংলার উৎপাদকরা ভয়াবহ ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছিল। নিজের দেশের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাজের সমালোচনা করে বা কোম্পানীর অনুচিত কাজের প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে বোল্ট বলেছিলেন যে, ইউরোপের অন্যান্য অনেক দেশ আছে, যাদের হয়তো জীবিকার এই একটাই পথ খোলা ছিল বাংলার বস্ত্র পণ্যের ওপর নির্ভরশীলতা। কিন্তু ইংলণ্ড তাদের সেদেশে বাণিজ্য করতে দিত না, যেহেতু এশিয়া মহাদেশ থেকে ইংলণ্ড মুনাফা সংগ্রহ করে সম্পদের পাহাড় গড়তে চায়।

"While they are continualy draining off from there immense sums annually for China, Madras, Bombay and other places, the consequence cannot prove other than beggary and ruin to those investable territories".

উইলিয়ম বোল্টের সমালোচনার অনেক অনেক পরে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশের কার্যকারীতা বিশ্লেষণ করার জন্য একটি 'পার্লামেণ্টারী কমিটি' গঠন করে। ঐ কমিটির সম্মুখে বিভিন্ন তথ্য পেশ করে প্রমাণ করা হয় কি ভাবে ভারতের শিশুদের জীবনের বিনিময়ে ইংলণ্ডকে বেআইনীভাবে বহু সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হয়েছে একেবারে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমল থেকে, যার ফলে ধ্বংস হয়েছে ভারতের নিজস্ব শিল্প বাংলার ঘরানা মসলিন। মসলিনকে রক্ষার জন্য যুদ্ধও চলেছে সেই ব্রিটিশ আমলের শুরু থেকে।

কেবল উইলিয়ম বোল্টই নন আরও কয়েকজন ভারতীয় তন্তুবায়ীদের ওপর ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নৃশংস অত্যাচারের প্রতিবাদ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ফ্রেডরিক শোর এবং বাগ্মী এডমণ্ড বার্ক। এই দুই ভারতবন্ধু ইংরাজের কথায় আমরা পরে আসবো।

৭

আমরা ঐতিহাসিক ল্যাকির History of Bengal থেকে ব্রিটিশ কর্তৃক বাংলার তাঁতশিল্পের ধ্বংস হওয়ার কিছু সুনির্দিষ্ট তথ্য তুলে ধরতে পারি। ল্যাকি তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে ইংলণ্ডের গৃহযুদ্ধ সমাপ্তির পরে ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাণী মেরী তাঁর স্বামী সমভিব্যাহারে ইংলণ্ডে পদার্পণ করার পর তিনি বাংলার বিশেষতঃ পূর্বভারতের সুতিবস্ত্রের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করার পরেই সাধাবণ মানুষের মধ্যেও বাংলার সূক্ষ্ম সুতি বস্ত্রের প্রতি কৌতূহল বৃদ্ধি পায় ফলে চাহিদার বৃদ্ধি ঘটে এবং ইংলণ্ডেও আমদানীর বৃদ্ধি ঘটে, বাংলা থেকে সুতিবস্ত্র এবং মসলিন আমদানীর বহর দেখে ঐ

দেশের মার্চেন্টরা বিহ্বল হয়ে পড়। ভারতীয় বস্ত্র ইংলণ্ডের বাজার দখল করবে এটা তাদের চিন্তার পরিধির বাইরে। কাজেই নড়ে চড়ে বসলো ইংলণ্ডের সরকার। এ সময় ইংলণ্ডের বাণিজ্যমহল ভারতীয় পণ্য বয়কট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইংলণ্ডের বাজারে বাংলা থেকে সূক্ষ্ম মসলিন (সিল্ক) ও সুতিবস্ত্র এবং নানাপ্রকার ছিটকাপড় হু হু করে প্রবেশ করতে থাকে। যার ফলে ইংলণ্ডের উল এবং সিল্ক ব্যবসায়ীরা দারুণভাবে সতর্কতা অবলম্বন করে। সেই সময় বাংলার বস্ত্র ইংলণ্ডের বাজারে কেবল সস্তাই ছিলনা, ঐ বস্ত্রের কোয়ালিটি বা গুণও ছিল। মোগল আমলে বাংলার শিল্পের যে নিপুণতা ছিল সেই একই উৎকর্ষতায় প্রস্তুত মসলিন, সুতিবস্ত্রাদি ইংলণ্ডের বাজারে প্রেরিত হতো। প্রথম প্রথম ইংলণ্ডের মার্চেন্টরা প্রমাদ গুনতে থাকে। বিপন্ন মার্চেন্টদের স্বার্থে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে এবং ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দে পরপর কয়েকটি আইন পাশ হয়।

ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে আইন পাশ হলো এই মর্মে যে ছাপা বা রঙ করা সুতিবস্ত্রের মধ্যে সামান্য কয়েকটি ছাড় ব্যতীত বাকী সকলপ্রকার বস্ত্র যে কোন দেশ থেকে ইংলণ্ডে আমদানী নিষিদ্ধ। কটন মিশ্রিত কোন বস্তুরও ইংলণ্ডে এই আইনের পর প্রবেশের পথ রুদ্ধ হলো। আসবাবপত্র, পোষাক যেখানেই কটন (Cotton) মিশ্রিত ছিল তারও ইংলণ্ডে প্রবেশ বন্ধ হয়ে যায়। যে কোনভাবে ম্যাঞ্চেষ্টারে প্রস্তুত বস্ত্রসম্ভার দিয়ে একদিকে ঐ দেশের বাজার অপরদিকে উপনিবেশগুলির বাজার দখল থাকবে এটাই ছিল ইংরাজ বাণিজ্যমহলের একশত ভাগ চিন্তাভাবনা। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে একজন ইংরেজ মহিলাকে গিল্ড হলে অনুষ্ঠিত প্রকাশ্য বিচার সভায় দাঁড়িয়ে ২০০ পাউণ্ড জরিমানা দিতে হয় কারণ তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছিল যে তাঁর ব্যবহৃত রুমালটি ছিল ফ্রান্সের তৈরী সুতায় প্রস্তুত। ইংলণ্ডের বণিকরা হিস্টিরিয়া রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়, যার বলে ভারত এবং বাংলায় ইংরাজ এবং ফরাসী উভয় কোম্পানী প্যারিস শান্তি চুক্তি অনুসারে 'ফ্রি ট্রেড এণ্ড কমার্স' এর সুযোগ পায় (১৭৮৩ খ্রীঃ) আর ফরাসীরা লাভ করলো "a safe, free and independent trade" এর অধিকার।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে প্রস্তুত কটন এবং সিল্ক বস্ত্র ইংলণ্ডের বাজারে যদি শতকরা পঞ্চাশ-ষাট ভাগ কম দামেও বিক্রী হতো তথাপি ইংরাজ ব্যবসায়ীরা লাভের মুখ দেখতো। ইংলণ্ডে তৈরী বস্ত্রের মূল্য ভারতীয় বস্ত্র অপেক্ষা অধিক হওয়া সত্ত্বেও এর পর ভারতীয় পণ্য ইংলণ্ডে প্রবেশের জন্য ঐ পণ্যের ওপর শতকরা আশিভাগ শুল্ক চাপানো হয়েছিল।

ঐতিহাসিক ল্যাকি তাঁর History of England গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে ভারতীয় বস্ত্র পণ্যের ওপর ঐ পরিমাণ শুল্ক বর্ধিত হারে চাপানো না হলে প্রিসলি এবং ম্যাঞ্চেষ্টারের

মিল ও পাওয়ারলুমগুলি বন্ধ হয়ে যেতো। এমনকি ষ্টীম ইঞ্জিনের আবিষ্কার হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় পণ্যের প্রবেশ বন্ধ একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। কারণ বাংলা প্রদেশেই তখন চলেছে মসলিন ও সিল্ক বস্ত্রের স্বর্ণযুগ। কাজেই ভারতীয় তন্তুবায়ীদের বলি দিয়ে ইংলণ্ডের তন্তুবায়ীদের ধনসম্পদে স্ফীত করার কাজ চললো সমানতালে (When the English Came they found the textile industry of Bengal well established- 'Cotton Weavers in Bengal' by Dr. D. B. Mitra)।

ইংলণ্ডে শিল্প বিপ্লব (Industrial Revolution) এর যুগে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়েছিল 'ফ্লাই সাট্‌ল্' যন্ত্র; তখন কাঠের আগুনের পরিবর্তে কয়লা (কোক) স্থান করে নিয়েছে। ইংলণ্ডের ম্যাঞ্চেষ্টার, ল্যাঙ্কাশায়র, প্রিসলিতেও উৎপাদিত পণ্যের পাহাড় হতে থাকে। কাজেই ভারতীয় বস্ত্র ইংলণ্ডের বাজার থেকে বিদায় করা ইংরাজবণিকদের কাছে অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়লো। ইংরাজবণিকদের নীতি ছিল 'গাছেরও খাবো, তলারও কুড়বো'। নিজেব দেশেব বাজার, উপনিবেশের বাজার, অন্য স্বাধীন দেশের বাজার সবই তাদের দখলে চাই। ক্ষমতা প্রদর্শনের অভিপ্রায় সিদ্ধ হলো ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পলাশীর প্রান্তরে যুদ্ধে সিরাজ-উদ্দৌলার পরাজয়ের পর। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ কোম্পানীর রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের যুদ্ধে জযের পর কেবল বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার স্বাধীনতা নয়, সমগ্র ভারতের জনগণেব স্বাধীনতা এক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীই কেড়ে নিয়েছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইংলণ্ডের রাজার পক্ষে সে দেশের সরকারের পক্ষে এ দেশটাই শাসন করতে শুরু করলো। দিল্লীর বাদশা বা বাংলাব নবাব সব যেন খড়কুটোর মতো ভেসে গেল। বাণিজ্য বিস্তারের জন্য ভারতেও চালু হল রেলপথ এবং ষ্টীমইঞ্জিন। ভারতের কিছু রাজ্য মোগল আমলে যেটুকু স্বশাসন ভোগ করতো তা কেড়ে নেওযা হলো। বাংলার গৌরব, বাংলার নিজস্ব ঘরানার ঢাকাই মসলিন, সিল্ক-সুতিবস্ত্রের বাজার লোপ পেতে থাকলো। কারণ ইংরাজরা ইতিমধ্যেই এগুলোর ওপর থাবা বসিয়ে দিয়েছে সুকৌশলে।

যে সকল কারণের জন্য ভারতীয় বস্ত্রশিল্প অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল তা হলো—

১। ভারতে ইংরাজদের বিনাশর্তে নিঃশুল্ক বাণিজ্য করার অধিকার প্রদান
২। ইংলণ্ডে বিক্রয়ার্থ ভারতীয় পণ্যের ওপর মাত্রাতিরিক্ত শুল্কচাপ প্রয়োগ
৩। ভারতের বাজার থেকে জলের দরে কাঁচামালের রপ্তানী
৪। আভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে অতিরিক্ত পণ্য শুল্কের বোঝা (ট্রানজিট ও কাস্টমস্ ডিউটি)
৫। ইংরাজ বণিকগণ দ্বারা ফ্যাক্টরী চালু করা
৬। ইংরাজদের সার্বিকভাবে নানাপ্রকার বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদান
৭। রেলপথের প্রবর্তন

৮। তাদের গোপন কৃৎকৌশলের কথা ইংরাজদের কাছে প্রকাশ করতে দেশীয় তন্তুবায়ীদের বাধ্য করা।

৯। ইংরাজদের পণ্য নিয়ে নানাপ্রকার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা, ভারতীয় পণ্যের ক্ষেত্রে বিপরীত ব্যবস্থা।

১০। ভারতে ব্রিটিশ পুঁজির লগ্নী সাধন।

১১। স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসিত রাজ্যগুলির সামান্য স্বাধীনতাটুকুও হরণ করা।

১২। তাঁতশিল্পীদের ওপর নির্মম অত্যাচার, তাদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ জোর করে কেটে দেওয়া

১৩। ঘনঘন দুর্ভিক্ষ, রোগ, মহামারীতে মৃত্যুজনিত কারণে জনসংখ্যা হ্রাস।

১৪। তাঁতশ্রমিকদের মধ্যে চরম দারিদ্র, নিজস্ব পুঁজির অভাব, মহাজনের ওপর নির্ভরশীলতা, মহাজনী শোষণ।

১৫। সর্বোপরি পলাশীর যুদ্ধের ঘটনাবলী।

উপরোক্ত কারণগুলির পাশাপাশি সিলেক্ট কমিটির নিকট যে সব সাক্ষ্য প্রমাণাদি উপস্থিত করা হয়েছিল তাও যথেষ্ট প্রণিধানযোগ্য। ইংলণ্ডের হাউস অব লর্ডস এবং হাউস অব কমনস্ যৌথভাবে এই সিলেক্ট কমিটি গঠন করেছিল।

সাক্ষ্যে জানা যায় যে, একজন সাক্ষী বলেছিলেন ভারতে ইংরাজ পণ্য বিক্রয় বৃদ্ধি করতে হবে এবং তার জন্য বিনা শুল্কে বাণিজ্যের পক্ষে তিনি মতামত দেন। কিন্তু এই 'ফ্রি ট্রেড' তো এক তরফা। ভারতীয় পণ্য ইংলণ্ডের বাজারে বিক্রয় করতে হলে বিরাট পরিমাণ শুল্ক দিতে হত। অভিযোগকারী বলেছেন ইংলণ্ডের বাজারে প্রবেশের জন্য যদি ভারতীয় পণ্যকে শুল্ক ছাড় দেওয়া হতো তবে ইংলণ্ডের নিজস্ব পণ্য বিক্রয়ে বাধা প্রাপ্তির ঘটনা ঘটতো। সাক্ষীরা কমিটির সম্মুখে একথাও জানিয়েছে যে 'ফ্রি ট্রেড' বা শুল্ক মুক্ত হলেই যে ইংরাজদের পণ্য ভারতীয়দের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠবে এমন কোন বাঁধাধরা নিশ্চয়তা নেই। ওয়ারেন হেস্টিংস ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি সিলেক্ট কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্য দেন। তাঁকে কমিটি প্রশ্ন করেন ঃ— Are you of opinion that in the event of free trade beween this country and British India, the demand for British Manufacturers would be increased in any material degree in that Country ?

উত্তর ঃ— "I believe not, I do not know why it should; it may cause a greater influx of British goods into that country, but it cannot increase the wants of the people to possess them."

অপর এক সাক্ষী ছিলেন শিল্পপতি মিঃ রবার্ট ব্রাউন। লর্ডস কমিটি তাঁকে প্রশ্ন করেন। Have you had extensive dealings in cotton piece goods from India" ?

উত্তর ঃ- Yes, I have.

প্রশ্ন ঃ- "Do you know what is ad-valorem duty imposed on piece goods sold at the sales of the company?

উত্তর ঃ- "They are divided into three classes, the first is the articles of muslins, which pay on importation 10 percent, P 27, 6S 8d, percent for home consumption ; the second is the article of calicoes, which pays L3, 6S, 8d. percent on importation ; and L 68,6s, 8d. percent for home consumption; the third comes under the denomination of prohibited goods, which pay merely a duty of L3, 6s 8d. percent on importation and are not allowed to be used in this country."

প্রশ্ন ঃ- "From your general experience. can you state whether the cotton goods manufacture in this country have attained to the perfection of the Indian fabrics?

উত্তর ঃ- "In many cases, I conceive that they very much surpass them.

প্রশ্ন ঃ- Do you mean that fine piece goods of India are surpassed by the British piece goods?

উত্তর ঃ- "No, I do not' ; certainly I mean the common and midding qualities.

প্রশ্ন ঃ- "Are there any species of Indian piece goods with which in your apprehension, British cotton of apparently the same quality could not sustain a competition?

পাল্টা প্রশ্ন ঃ- "It is meant by that to ask me in point or in point of quality?.....They have certainly been very successfully initiated and as I stated before, the British goods have in some cases surpassed the others.

প্রশ্ন ঃ- Supposing that Indian piece goods were to attain a considerable degree of home consumption, would the finer sorts of them prevail over any British fabrics of the same kind that could be brought to contend with them in the market?

উত্তর ঃ- If you mean, the finer description of piece goods to be imported without the payment of duty, they will certainly interfere very much with British goods but it would be with the coarser goods, if the duty was evaded, with which the interference would be by far the greatest in my opinion, in consequence of

the low price at which those common piece goods are sold at the company's sales; and the greater price of same description of goods of British manufactures. At present, the duty is so heavy, amounting of L68, 6s 8d. percent for home consumption that few, if any, sold for the home market" (Ref. Cotton Weavers in Bengal by Dr. D. B. Mitra page 21).

উপরোক্ত সাক্ষ্যদানের ঘটনা ছাড়াও ভারতের বস্ত্র শিল্পের সর্বনাশের জন্য অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীকালে ব্রিটিশ কতখানি দায়ী তা সবিস্তারে আরও একজন ইংরাজ সাক্ষী মিঃ রিচার্ড তাঁর বক্তব্য লিখিত আকাবে বেখে গেছেন। রিচার্ডের অনুসন্ধান জানাচ্ছে যে, ভারতে যে সমস্ত ব্রিটিশ পণ্য আমদানী করা হচ্ছে এবং ব্রিটেনে যে সমস্ত ভারতীয় পণ্য আমদানী করা হচ্ছে উভয় বস্তু যদিও একই ব্রিটিশ নাগরিকের তথাপি পণ্য শুল্ক আরোপ করার ক্ষেত্রে ইংলণ্ডে দ্বিমুখী নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। ভারতে যখন ব্রিটেনে প্রস্তুত পণ্য প্রবেশ করছে তখন কোন প্রবেশ কর বা অন্তঃশুল্ক দিকে হতো না, কিন্তু ব্রিটেনে ভারতীয় উৎপন্ন দ্রব্য প্রবেশ করলেই অত্যন্ত চড়াহারে নানাবিধ শুল্ক চাপানো হত এবং, তার হার শতকরা একশতভাগ থেকে ছয়শত ভাগকে কখনও কখনও অতিক্রম করতো। এধরনের বৈষম্যে ভারত এবং ইংলণ্ড উভয় দেশে কর্মরত ইংরাজ বণিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আব এই নীতির জন্য সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হযে ভাবতে উৎপাদিত বস্ত্র শিল্প।

মুনাফার স্বার্থে ইংরাজ কোম্পানীর দ্বিমুখী বাণিজ্য -নীতির জন্য ভারতে উৎপন্ন কার্পাস তুলা বা প্রস্তুত মসলিন, সিল্ক ও সুতিবস্ত্রাদির রপ্তানী বাণিজ্যের সর্বনাশ হয়েছিল। ব্রিটেনে প্রবেশের জন্য গুণতে হতো Land Tax যার পরিমাণ ছিল মোট উৎপাদিত পণ্যেব মোট মূল্যের অর্ধেক। দুইদিক থেকে ভাবতীয় বস্ত্রের বাণিজ্য বা বাজার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় অর্থাৎ ইংলণ্ডের বাজারে তার প্রবেশে ভয়ঙ্কর ধরনের কড়াকড়ি আবার বাংলা তথা ভারতের আভ্যন্তরীন বাজার সেটাও ইংরাজ বণিকদের কব্জায় তাতে তাদেব নিঃশুল্ক অবাধ বাণিজ্যের স্বীকৃত থাকায় এদেশের জনগণের ভাগ্যে অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট এবং নির্মম দারিদ্র অবশেষে দেশে দুর্ভিক্ষ ডেকে আনে। ইংলণ্ডের কূট রাজনীতির জন্যই পলাশীর যুদ্ধে এদেশে তারা বিজয়লাভ কবলো। সাথে সাথে বাংলার শিল্প-বাণিজ্যকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিল।

গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে আইরিস, স্কচ বা ইংবাজরা যেমন ব্রিটিশ সরকারের অধীন সেইরূপ ভারতীয়রাও ছিল ব্রিটিশ সরকারের অধীন একটি রাষ্ট্রের নাগরিক কিন্তু শুল্ক দিতে হতো কেবল ভারতীয়দেরই। পার্থক্য ছিল গ্রেট ব্রিটেন পলাশীর যুদ্ধে বিজয়ীদেশ আর ভারতবর্ষ বিজিত এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাছে পদানত। তাই কোন সম্মান ছিলনা ভারতীয়দের এবং ভারতীয় পণ্যের। অত্যন্ত সঠিক কথা বলেছেন ঐতিহাসিক রিচার্ড

যে, "It was the grant of special previlages to the English merchants which led to the conspiracy against Siraj-Ud-Dowla and the Battle of Plassey. (Ibid, page-105)

ইংরাজ মার্চেন্টরা ছিল ভয়ানক ক্রুর এবং লোভী। চক্রান্ত যেন জলভাত। ওদের রক্তে মিশিয়ে ছিল বিশ্বাসঘাতকতা। এক ইঞ্চি জায়গা পেলে ৪৫ ইঞ্চি দখল করবে। ব্যাপারটা ঘটতো এইরকম ঃ- "Give them an inch and they will ask for an ell" ইংরাজ বণিকরা এত লোভী ছিল যে, যেন কোন কিছুতেই তারা সন্তুষ্ট হচ্ছিলনা। আরও প্রাপ্তির আশায় ষড়যন্ত্র করে নবাব মীর কাশিমকেও বাংলার মসনদ থেকে টেনে নামিয়েছিল। "They behaved like hungry wolves or vultures"। এব থেকে ভাল বিশেষণ আর কিছু হতে পারেনা। ইংরাজ বণিকরা ছিল ক্ষুধার্ত বুনো জানোয়ারের দল।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও লেখক হার্বার্ট স্পেনসার এই বণিকদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন ঃ— "Shadeless cruel than their protopes of Peru and Maxico." স্পেনসার বলেছেন যে কোম্পানীর অর্থ গৃধ্নি ডিরেক্টরগণও নিজেদের অন্যায় কার্যকলাপ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল। স্পেনসারের কথায় আছে ঃ— "Even the Directors of the company admitted that the vast fortunes acquired in the inland trade have been obtained by a scene of the most tyrannical and oppressive conduct that was ever known in the voyage or country."

শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বহু ইংরাজ লেখক ঐতিহাসিক নির্বিশেষে ভারতবর্ষে তাঁতশিল্পীদের ওপর ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বর্বর অত্যাচার এবং বাংলাব তাঁতশিল্পকে ধ্বংস করার ব্রিটিশ ষড়যন্ত্রের প্রকাশ্য সমালোচনা করলেও কোম্পানী কর্তৃপক্ষ কিংবা গ্রেটব্রিটেনের রাজকীয় সরকার তাতে কর্ণপাত করেনি। ইংরাজদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত তাই তারা ইংরাজদের গোলাম এটাই ছিল গৃহীত নীতি। যে সমস্ত এদেশীয় রাজা বা জমিদার ইংরাজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোন সময়ে সরব হয়েছিলেন তাদেরও কঠোর সাজা ভোগ করতে হয়েছে। এমনই একজন ছিলেন সাজাপ্রাপ্ত মহারাজ নন্দকুমার।

❑ মহারাজ নন্দকুমারের ভূমিকা ❑

মহারাজ নন্দকুমার বাংলার তৎকালীন নবাব মীরকাশিমকে পরামর্শ দিয়েছিলেন ইংরাজ বণিকদের ওপর আভ্যন্তরীন শুল্ক আরোপ করার জন্য এবং দেশীয় বণিকদের ওপর আরোপিত অত্যধিক শুল্কচাপ হ্রাস করার জন্য। এতে ইংরাজ কোম্পানী তাঁর ওপর চটে যায়। আবার বাংলার তন্তুবায়ীদের ইংরাজ কুঠিয়ালদের 'আড়ং'য়ে ডেকে

এনে অথবা তাদের নিজেদের গৃহাভ্যন্তরে দৈহিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে নন্দকুমার তাঁতশিল্পীদের পক্ষাবলম্বন করায় ওয়ারেন হেস্টিংস প্রথমে তাঁকে গৃহবন্দী, পরে মিথ্যামামলায় জড়িয়ে কারারুদ্ধ, শেষপর্যন্ত তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়। নন্দকুমার ছিলেন নবাব আলিবর্দীর আমলে নিয়োজিত হুগলীর ফৌজদার। ফৌজদার এবং একই সাথে মহারাজা নন্দকমার পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার পক্ষাবলম্বন করায় ওঁর ওপর ইংরাজরা খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছিল। যুদ্ধ শেষে আবার সেই ইংরাজদেরই বিরুদ্ধাচারন এবং তাঁতশিল্পীদের পক্ষাবলম্বন করায় তাঁকে হত্যা করার সমস্ত পরিকল্পনা পাকা হয়ে যায়।

পলাশীর যুদ্ধের অনেক পরে (অন্ততঃ আশিবছর) ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের কমন্স্ সভায় 'ভারতে ধ্বংস প্রসঙ্গে' আলোচনা চলাকালে জনৈক সদস্য মিঃ লার্পেণ্ট স্বীকারোক্তি দেন ''আমরাই ভারতের শিল্পসমূহ ধ্বংস করেছি।'' আবার ভারতের শিল্প ধ্বংসের কারণ অনুসন্ধানে গঠিত কমন্‌স ও লর্ডসভার যৌথ কমিটির প্রেসিডেণ্ট মন্তব্য করেছিলেন— ''ভারতের বস্ত্রশিল্প ইতিপূর্বেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে সুতরাং যা ধ্বংস হয়ে গেছে তা নিয়ে আর প্রশ্ন উঠতে পারে না।'' আসলে এই ফলাফল ওদের কাছে ছিল স্বতঃসিদ্ধ।

❑ বাদশাহী আমল ঃ প্রাক পলাশী যুগের অবস্থা ❑

হিন্দুস্তানে সপ্তদশ শতাব্দী জুড়ে যখন ইংরাজরা এদেশে বসবাস আরম্ভ করলেও মোগল আমলে বাংলাব তাঁতশিল্পীরা প্রচুর স্বাধীনতা ভোগ করতো। নিজেদের তাঁত, নিজেদের পুঁজি, নিজেরাই মালিক এবং নিজেরাই শ্রমিক কাজেই লাভ লোকসান নিয়ে বিশেষ চিন্তিত হওয়ার বিশেষ কাবণ ঘটতো না। ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন ফরাসীর চিকিৎসক পর্যটক ডঃ বার্নিয়ার এদেশে খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণের জন্য এসেছিলেন, তিনিও তাঁতীদের পরাধীনতা দেখতে পাননি। তবে ডাঃ বার্নিয়ার লক্ষ্য করেছিলেন সরকারের উদ্যোগে অনেক কারখানা ছিল, যেগুলিকে ইংরাজরা অভিহিত করতো 'হল' রূপে, বিভিন্ন প্রকার হস্তচালিত শিল্প নৈপুণ্যের সঙ্গে একই শেডের তলায় প্রস্তুত হতো। তবে শিল্পীদের মিলিত সংগঠন ছিল তাকে ইংরাজ ও ফরাসীরা বলতো ''গিলড্''। তাঁতশিল্পীরা প্রত্যেকেই ছিল গিলডের সদস্য। এক একটা গ্রামে একাধিক 'গিলড্' থাকতো। টেলর তাঁর 'A Descriptive and Historical Account of the Manufacturer of Cotton at Dacca in Bengal' গ্রন্থে তাঁত কারখানায় কাজ করে এমন সব ১৪ বছর বয়সের শিশু শ্রমিকের কথা উল্লেখ করেছেন। এই ধরনের শিশু শ্রমিকরা কালক্রমে অনেক দক্ষতা অর্জন করতো। তারও সবিস্তার উল্লেখ করেছেন।

প্রাক্ পলাশী কাল সম্পর্কে জানা যায় যে, তাঁত কারখানাগুলোতে কর্মরত শ্রমিকদের পাশাপাশি থাকতো কারখানার মালিক-মহাজন, রপ্তানীকারক বণিক, প্রযুক্তিজ্ঞান সম্পন্ন

কর্মীরা। এই সময়ের গ্রামগুলোও কতক স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। ছিল জাতিভেদ প্রথা। যারা তাঁতের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল তারা একটা গোষ্ঠীর মধ্যে বাস করতে। পরবর্তীকালে যখন ভারতবর্ষের বাইরে বাংলার মসলিন ইত্যাদি রপ্তানী হতে আরম্ভ করলো, নানাবিধ মসলিন বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকলো তখন এই হস্ত চালিত শিল্পটির আরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটলো, যারা অবস্থাপন্ন বা যাদের জীবনযাপনে আভিজাত্যের ছাপ আছে বলে তাঁতের কাজকে কিছুটা উন্নাসিকতার সঙ্গে হেয় করতো তারাও এই শিল্পে ও পেশায় সরাসরি যোগ দিল। বিভিন্ন বর্ণ ও জাতির এই সমস্ত শিল্পীরা একত্রিত হয়ে গঠন করতো 'গিল্ড'।

পলাশী যুদ্ধের পূর্বের কথা। তখন তন্তুবায়ীদের একটা অংশকে সরাসরি নির্ভর করতে হতো মহাজনের ওপর। কারণ পুঁজির অভাব। সময় মতো মহাজনকে উৎপন্ন বস্ত্র সরবরাহ্ করতে অবশ্য শিল্পীরা বাধ্য থাকতো। তাঁত অধ্যুষিত নয় এমন কোন গ্রামের অস্তিত্ব ছিল না। প্রতিটি গ্রামেই তাঁত চলতো। বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতিতে তাঁতশিল্পেব গরিমাময় আলোক চতুর্দিক থেকে বিচ্ছুরিত হতো। গ্রামে তাঁতশিল্পীদের অন্তরে সুখ ও দুঃখ উভয়ই জমতো। কিন্তু পলাশীব প্রান্তরে, সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে বাংলার জাতীয়তাবাদের পরাজয় সবকিছু ওলট-পালট করে দিল। এলো চাবুক হাতে টাকার থলি নিয়ে মহাজন, পাইকার, দালাল, গোমস্তা, পিয়ন, দারোগার দল সবাই জোটবদ্ধ হলো বিদেশী ইংরাজ লুঠেরার সঙ্গে।

এরই পাশাপাশি শুরু হলো সাহেবদের বুটের দাপাদাপি, বর্গীয় হাঙ্গামা, বিজয়ীর ক্রুর হাসি আর হুঙ্কার ধ্বনি। গ্রাম বাংলাকে কাঁপিয়ে তুললো ইংরাজ সাহেবরা বাংলার সিল্ক বস্ত্র বা মসলিনের খ্যাতি ছিল পৃথিবীব্যাপী। ইংরাজ বণিকরা জানতে পেরেছিল মসলিন বস্ত্রের রূপকথা। নানান গল্প, উপাখ্যান, আখ্যায়িকা রচিত হয়েছিল মসলিন বস্ত্রকে কেন্দ্র করে। সাত-সমুদ্র তের নদীর পারে ইংরাজদের কানে যাচ্ছিল সেই সব গাথা। অর্থের লোভে ওরা উত্তেজিত হয়ে উঠতো।

পারস্যের শাহ (সম্রাট) চ্যাসোফিকে খুশি করার আগ্রহে মোগল দরবারে পারস্যের দূত মহম্মদ আলি বেগ ষাট হাত দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একখানি পাগড়ির কাপড় উপহার দিয়েছিলেন। পাগড়ির কাপড়টি ছিল মসলিন বস্ত্র। ডিমের সাইজের ছোট একটি নারিকেল খোলাকে মণিমুক্তা দিয়ে সাজিয়ে ঐ খোলার মধ্যে পুরে মসলিনখানি পাঠানো হয়েছিল। পারস্যের শাহ্ মন্ত্রমুগ্ধের মতো কিছুক্ষণ স্থির থাকার পর পাগড়িটির কাপড়ের বয়ন নৈপুণ্য, সূক্ষ্মতা ও শুভ্রতা দর্শনে চমৎকৃত হন। তাঁর ধারণা হয় এই ধরনের উৎকৃষ্ট কাপড় মানুষ প্রস্তুত করতে পারে না। ঈশ্বর প্রেরিত ব্যক্তিদের পক্ষেই সম্ভব এই ধরনের বস্ত্র প্রস্তুত করা। তিনি এ পাগড়ীটিকে 'মাকড়সার জাল' ভ্রমে গ্রহণ করেছিলেন।

ভারতের প্রাচীন সভ্যতার বড় উদাহরণ কার্পাস বস্ত্র। অতীতে পৌরাণিক যুগে 'ঋগ্বেদসংহিতা'য় কার্পাস বস্ত্রের উল্লেখ আছে। প্রাচীন যুগে বিশ্বসভ্যতার এবং সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র মিশর ও গ্রীসদেশেও ভারতীয় বস্ত্রের সমাদর ছিল। মাকড়সার লালার মতো সুতায় প্রস্তুত বস্ত্রনিরীক্ষণে সমগ্র জগত সম্ভ্রমে মাথা নোয়াতো।

বাংলার জল ও আবহাওয়ায় পূর্বে কার্পাস তুলার প্রচুর চাষ হতো। কার্পাস বিভিন্ন প্রকার ছিল যেমন, শিরজ, ফোটি ও দেবকার্পাস। শিরজকার্পাস তুলার গ্রামাঞ্চলে পরিচয় ছিল 'বামনীতুলা' নামে। এই তুলার সূতায় প্রস্তুত পৈতা একটা এলাচের খোসার মধ্যে পুরে রাখা যেতো।

শিরজ তুলা বা বামনীতুলার আঁশ সুভদ্র, দীর্ঘ এবং শক্ত। প্রত্যেক তন্তুবায়ীর ঘরে থাকতো টাকু। বাড়ির মহিলারা সংসারের ক্রিয়াকর্ম সম্পাদনের সঙ্গে গৃহাভ্যন্তরে টাকুতে সুতা কাটতো। এই সুতার সাহায্যে সুদক্ষ তাঁত শ্রমিকরা অনায়াসেই মসলিন তৈয়াব কবতো। ঐ মসলিন ঘাসের ওপর বিছানো থাকলে কেবল ঘাসই দেখা যেতো-গোচারণ ক্ষেত্রে বিচরণরত গাভী ঘাসের সঙ্গে ঐ শাড়িটি খেয়ে ফেলত। এই ধরনের সূক্ষ্মতা বাস্তবিকতই অতি আশ্চর্য, মনোমুগ্ধকর। তাই বিশ্বের কোথাও মসলিন বস্ত্রের কোন বিকল্প ছিল না।

এত নিপুণতার সঙ্গে উৎপন্ন মসলিন নিয়ে যারা দেশবিদেশে বাণিজ্য করতো তারা প্রচুর মুনাফা অর্জন করতো। কিন্তু যারা উৎপাদক সেই সমস্ত শ্রমিকেরা কিন্তু আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছল ছিল না। তারা বিশেষ মজুরী লাভ করতো না। তাদের হস্ত নৈপুণ্যের খ্যাতি ছিল, কিন্তু অন্ন সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হতো না, এবা কেবল পরিশ্রম করতো, জ্ঞান ছিল, ছিল অভূতপূর্ব দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা। কিন্তু মর্য্যাদা দেওয়া হতো না তাকে বা তাঁত শিল্পী সকলকে। এরা যুগ যুগ ধরে পড়ে থাকতো অবহেলিত হয়ে, এরাই ছিল প্রকৃত গ্রামীন সর্বহারা আধা সর্বহারা মানুষজন এদের মাথায় চড়ে বসে থাকতো মহাজন।

❑ পরিবর্তিত পরিস্থিতি ❑

পলাশীযুদ্ধে বিজয়ী ইংরাজদের উল্লাসের কমতি ছিল না। গ্রামের মহাজনরা ইংরাজদের দালালে পরিণত হলো। তাঁতশিল্পীরা পুঁজি হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে গ্রামীন কুলাক শ্রেণী ও মহাজনদের ওপর অর্থের আশায় নির্ভরশীল হয়ে পড়লো। মহাজনরা তন্তুবায়ীদের 'অ্যাডভ্যান্স' বা দাদন দিয়ে প্রভু ও গোলামের সম্পর্ক গড়ে তুললো। তাঁতীরা মহাজনদের কাছে সযত্নে প্রস্তুত মূল্যবান অতিসূক্ষ্ম বস্ত্র বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করতো। মহাজনের কাছে কিন্তু একদর যদিও তাঁতীর ব্যয় হয়েছে অনেক।

সুতা যদি মহাজন সরবরাহ করে থাকে তবে তাঁতীর কাছে মহাজন 'মুকীম' প্রেরণ করতো যার কাজ ছিল বস্ত্রের গুণাগণ পরীক্ষা করা। মহাজন তাঁতীদের কাছে 'দাদন' পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রেরণ করতো একদল 'পাইকার'। মহাজন সুদের ব্যবসাও করতো একই সঙ্গে। 'দাদন' যা দিত তার হিসাব কষতো সুদ সমেত।

ঢাকা শহরে একজন ক্ষুদ্র বস্ত্র উৎপাদক তার নিজস্ব তাঁতে স্বাধীনভাবে নিজশ্রমের বিনিময়ে নিজের গ্রামের বাড়িতে তাঁত বসিয়ে অত্যন্ত জটিল পদ্ধতিতে মসলিন বস্ত্র উৎপাদন করতো। ক্ষুদ্র উৎপাদকটির কাছ হতে আবার স্থানীয় ক্রেতারা বস্ত্র প্রস্তুত করে নিয়ে যেতো। ক্র্যাফটসম্যান (Craftsman) হিসাবে তন্তুবায়ীর প্রবল দক্ষতা থাকতো তার অধীনে কয়েকজন শিক্ষানবীশী করতো। এরা কিছু অর্থ পেত পারিশ্রমিক হিসাবে। কোন কোন দক্ষতা সম্পন্ন তাঁতীর দুই তিন খানা অর্থাৎ একাধিক তাঁত থাকতো। এতে যে উৎপাদন হতো তা একার পক্ষে সম্ভব হতো না এজন্য অন্ততঃ একজন কারিগর (journey man) এবং অন্ততঃ একজন apprentice বা নিকারী নিযুক্ত করতো।

মসলিন বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে উৎপাদনও দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকলো। তার জন্য উৎপাদন-পদ্ধতিরও ঘটে যায় আমূল পরিবর্তন। গিল্ডের একজন স্বাধীন সদস্য হিসাবে হস্ত শিল্পী একাই অনেক সময় মালিক, বণিক, মেকানিক, ফোরম্যান, শ্রমিক সবারই কাজ সম্পাদন করতো। উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার তাগিদে এসবকিছুই ওলটপালট হয়ে গেল। যখন স্বাধীন হস্ত-শিল্পীর টাকার প্রয়োজন হয়ে পড়লো, অর্থসংগ্রহ বা ব্যবসায়ে আরও অর্থ লগ্নীর আশায় সে মহাজনের নির্ভরশীল হয়ে পড়লো। মহাজনের কাছে অর্থের জন্য কার্যতঃ সে আত্মসমর্পন করলো। আর মহাজনও এই অবস্থার ফসল ভালোভাবেই ঘরে তুলতে থাকে। 'মহাজন' অর্থ তো বিরাট ব্যক্তি 'সদাশয়' (!) ব্যক্তি 'মহাজন' মহাশয় ব্যক্তি। সে তার জলে হাঙ্গর মাছ স্বরূপ ব্যবসায়ে কয়েকজন কর্মচারী নিয়োগ করতো। ঘুরে ঘুরে তাঁতীদের ঘরে ঘরে তাঁতীর মুক্তি পনের টাকা 'দাদন' (Advance) পৌঁছে দিতো যারা, তাদের বলা হতো পাইকার। এদের সঙ্গে ছিল 'মুকিম' যারা দাদন দেওয়া অর্থের সদব্যবহার হচ্ছে কিনা তাঁতী মহাজনের নির্দেশমতো মসলিন তৈরী করছে কিনা সবকিছুর ওপর মাতব্বরী করতে যেতো। ক্ষুদ্র আয় সম্পন্ন দরিদ্র তাঁত শিল্পীদের শোষণ করার পদ্ধতিটি এভাবেই সরকার স্বীকৃতি লাভ করেছিল।

ইংরাজ পর্যটক টেলর ঐসময়ের অর্থাৎ পলাশী যুদ্ধের কিছু পূর্বের এবং পরবর্তীকালে ঢাকা শহরের সোনার গাঁ, জঙ্গলবেরী প্রভৃতি মোকামের তাঁতশিল্পীদের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা, মসলিন বস্ত্রের উৎপাদন পদ্ধতি, গিল্ড গঠন, মহাজনের দাপট সমস্ত কিছু বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর মূল্যবান" "A Descriptive and Historical Account of Manufacture of Cotton at Dacca in Bengal" গ্রন্থে।

ভারতবর্ষে মসলিন উৎপাদনের প্রথম যুগে কোন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে কাজ হতো না। তন্তুবায়ীরা নিজেদের স্বার্থে 'গিল্ড' গঠন করার ফলে কিছু শ্রম বিভাগ সৃষ্টি হয়।

চাহিদা এবং রপ্তানী বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে গিল্ড স্বতঃ উদ্যোগ গ্রহণ ক'রে নৈপুণ্যের মানানুসারে শ্রমবিভাজন ব্যবস্থা সৃষ্টি করে। 'কারখানা' বা 'হল' নির্মাণ করে মহাজন। এক একটা বিশাল হলে বসে কাজ করে বিভিন্ন হস্ত শিল্পীরা, স্বর্ণকার, চর্মকার, তন্তুবায়ী এরা সকলেই। অবশ্য যে যেখানে খুশি বসতে পারতো না। তারও আবার স্থান ভাগ করা ছিল। যেমন প্রথমে বসতো এমব্রয়ডারী কাজের লোকেরা, দ্বিতীয় সারিতে স্বর্ণকাররা, তৃতীয় সারিতে পেইণ্টাররা, চতুর্থ সারিতে বার্ণিশের কাজে লিপ্ত শ্রমিকেরা পঞ্চম সারিতে হাল্কা কাঠের কাজ করে এরূপ ছুতার, দর্জি, মুচি এবং ষষ্ঠ সারিতে সিল্ক-তন্তু দিয়ে গুটিতোলা রেশমীবস্ত্র, সুক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র প্রস্তুতকারক তাঁতশ্রমিকরা।

ঢাকা শহরের শহরতলী সোনার গাঁ ও জঙ্গলবেরীতে ইংরাজরা কুঠি এবং 'আড়ং' বসিয়েছিল, সমস্ত শ্রমিকরা ঐ শেডে বসে কাজ করতো। টেলর লিখেছেন 'আড়ং'য়ে দারোগাদের কথা। দারোগারা কাজ করতো সুপারিণ্টেণ্ডেটের। এদের হাতে থাকতো বিচুটি গাছের চাবুক। ভারত সম্রাটের জন্য জামদানী তৈরী হতো ঐ কাবখানায়, দাবোগাদেব দৃষ্টি থাকতো ঐদিকে। দারোগাদের হাত দিয়েই 'দাদন' দেওয়া হতো শিল্পীদেব।

'ষ্টেট কারখানা' গুলোতে সকাল হতেই শ্রমিকরা কাজে যোগদান করতো আর সমস্তদিনই কারখানার কাজে তাদের ব্যস্ত থাকতে হতো। সরকার থেকে এই কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের কাছে সুতা (কাঁচামাল) ইত্যাদি পৌঁছে দেওয়া হতো এবং একভাবে বসে একটা বস্ত্র তৈরীর কাজ শেষ করতে হতো। তারা ষ্টেটের কর্মী হিসাবে শ্রম দিত এবং পারিশ্রমিক পেত সরকারের কোষাগার থেকে।

বিভিন্ন ইউরোপীয় কোম্পানী বাংলায় বস্ত্রশিল্পের বাজার দখলের জন্য নিজেদের মধ্যে লড়াই চালিয়ে ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে পর্তুগীজ, ইংরাজ, ফবাসী ও ওলন্দাজ বণিকরা জোট বেঁধে বাংলার মাটিতে পদার্পণ করে। ওলন্দাজরা ১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কুঠি নির্মাণ করে চুঁচুড়া, কাশিমবাজার এবং পাটনায়। মোগল বাদশাহ আওরঙজেবের ফরমান ছিল তাদের হাতে। ১৬৭৪ খ্রীঃ অর্থাৎ ওলন্দাজদেরও আগে ফরাসীরা বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করেছিল নবাব শায়েস্তাখানের কাছ হতে অনুমোদন পেয়ে। ইংরাজ ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী ও বালাসোরে ফ্যাক্টরী নির্মাণ করার কাজ শুরু করে, মালদহের ফ্যাক্টরী নির্মাণ শেষকরে ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে। 'ফ্যাক্টরী' বা 'কারখানা' একের পর এক স্থাপিত হওয়ায় দীর্ঘকালের বুনিয়াদী কৃৎকৌশলের বহু পরিবর্তন ঘটে যায়। সুতা কাটা থেকে বস্ত্র প্রস্তুত পদ্ধতির যাবতীয় ধ্যানধারণাব অনেক পরিবর্তন ঘটে যায়।

বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব আলিবর্দী খাঁয়ের আমলে ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বাংলায় মসলিন-সিল্ক-সুতিবস্ত্র বাণিজ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দিত্বর মুখোমুখি হতে হয়। ফরাসী, ওলন্দাজ, পুর্তুগীজরা তো ছিলই, প্রুশিয়ান, ডেনিশ বণিকরাও ছিল। আর ছিল এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত আর্মেনিয়ান, মুঘল, পাঠান, আফগান প্রভৃতি জাতি গোষ্ঠীর বণিকরা। ইংরাজ বণিকরা যা মূল্য দিত তার থেকে ঐ সব বণিকরা বাংলার

মসলিন বস্ত্রের জন্য অনেক বেশি মূল্য দিত। উদ্দেশ্য ইংরাজদের ব্যবসায়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। ইংরাজদের নিযুক্ত গোমস্তারা এর ফলে প্রায়শই পিছিয়ে পড়তো অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদের গোমস্তাদের থেকে।

টেলর প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী জানা যায় যে, ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজদের ঢাকার ফ্যাক্টরী গুলি বিখ্যাত মসলিন তাঞ্জিব ও মলমল খাস বস্ত্র তেমন সংগ্রহ করতে পারেনি, কারণ মোগল এবং আর্মেনিয়ান বণিকরা ইংরাজদের থেকে অনেক বেশি মূল্য দিয়ে ইতিপূর্বেই 'আড়ং' থেকে সংগ্রহ করে নিয়েছে। চতুর ইংরাজ বণিকদের ওরা বোকা বানিয়ে দিত এই ভাবেই। ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার বণিকরা ইংরাজ কোম্পানীর কাছে বস্ত্রের মূল্য বাবদ আগাম 'দাদন' এর টাকা দাবী করে। ওদের অভিযোগ ছিল ইংরাজ এবং ওলন্দাজ বণিকরা নির্দিষ্ট হারের পরিবর্তে বাজার থেকে অনেক বেশি মূল্য দিয়ে মসলিন বস্ত্র সম্ভার সংগ্রহ করে, ফলে তাদের ব্যবসায়ে যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। এই রকম নানান প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হওয়ার জন্য ইংরাজ কোম্পানী অনেক কম গুণসম্পন্ন বা নিকৃষ্ট মানের মসলিন বস্ত্র সংগ্রহ করতে বাধ্য হতো।

এইরূপ পরিস্থিতি মোকাবিলার উদ্দেশ্যে কলকাতায় অবস্থিত কোম্পানীর কাউন্সিল বিভিন্ন ফ্যাক্টরীতে কর্মরত অফিসার এবং অধঃস্তন কর্মচারীদের কাছে নির্দেশ প্রেরণ করে এই মর্মে যে, যথেষ্ট পরীক্ষা করে ফ্যাক্টরী বা আড়ং থেকে পাঠানো বস্ত্র সম্ভার কোম্পানী গ্রহণ করবে। কোনমতেই নিকৃষ্ট মানের কোন বস্ত্রগ্রহণ করা হবে না। অফিসার এবং কর্মচারীদের যোগ্যতার মাপকাঠির পরীক্ষা নেওয়ার জন্য কোম্পানীর কাছে সিকিউরিটি বণ্ড জমা দেওয়ার নির্দেশ যায়। কোম্পানী 'দাদনি মার্চেণ্ট'দের হাতে অগ্রিম আরও অর্থ তুলে দেওয়ার জন্য নির্দেশ জারি করে। অধিকাংশ 'দাদনি মার্চেণ্ট' যাতে ইংরাজদের পক্ষে কাজ করে তার জন্য নিশ্চিত হতে কোম্পানী টাকা ভর্তি থলি দিয়ে দারোগাদের বিভিন্ন আড়ংয়ে প্রেরণ করতো।

কোম্পানীর সংগৃহীত গোপন তথ্যে যদি কোন মার্চেণ্টের কাজে গাফিলতির জন্য বস্ত্রের গুণমান নিকৃষ্ট হয়েছে একবার প্রমাণিত হতো তবে সেই মার্চেণ্ট বা ব্যবসায়ীর জরিমানা নিশ্চিত। যে পরিমাণ পণ্য ডেলিভারী হয়েছে তার ওপর নির্ভর করবে জরিমানার পরিমাণ। দাদনের জন্য অর্থ নেওয়ার বিনিময়ে যে সিকিউরিটি মানি কোম্পানীর হেফাজতে জমা রাখতে হয়েছে তা বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। যদি ব্যবসায়ী বা বণিক কোম্পানীর সঙ্গে সাক্ষরিত চুক্তির কোন একটি শর্ত খেলাপ করে তবে নিশ্চিত তাকে আটক করা হতো। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের পরে এদেশীয় বণিকগন (দাদনি মার্চেণ্ট) চিন্তা করলো ইংরাজ কোম্পানীর থেকে ওলন্দাজ বা ফরাসী কোম্পানীর সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য করা অত্যন্ত সুবিধাজনক এবং অপেক্ষাকৃত সম্মানজনকও। প্রায়ক্ষেত্রেই তখন থেকে তারা ইংরাজদের পরিবর্তে ঐ দুই ইউরোপীয় কোম্পানীর সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি ও আর্থিক লেনদেন করতে থাকে।

২৬শে জানুয়ারী ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীযুদ্ধে বিজয়ের দশবছর পরে লর্ড ক্লাইভের পর বাংলার গভর্ণরের দায়িত্ব প্রাপ্ত হ্যারী ভেরেল্স্ট্ (Harry Veralst)˘ এর বিবেচনায় দেখা যায় যে ইং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ওলন্দাজ, ফরাসী প্রভৃতি কোম্পানী গুলোকে জব্দ করার জন্য এ দেশীয় বণিকদের সঙ্গে একবার পুরানো পদ্ধতির কিছু চুক্তি করতে থাকে যেগুলোকে গভর্ণরের মতে 'a source of new oppression" বা নির্যাতনের পদ্ধতি ছাড়া অন্যকিছু নয়। উপনিবেশবাদী সাম্রাজ্যবাদী লোভী ইংরাজ কোম্পানী এদেশে তন্তুবায়ী থেকে শুরু করে বণিকদের কি ভাবে অত্যাচারে জর্জরিত করে তুলেছিল, এদের অনেকেই সেই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে হয় আত্মহত্যা অথবা নিজের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কর্তন অথবা দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছিল। ইংরাজ বণিকরাও হ্যারীর আমলে মসলিন ও সুতিবস্ত্র নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের পদ্ধতিরও আমূল পরিবর্তন ঘটালো, উৎপাদন পদ্ধতিরও পরিবর্তন সাধন করলো। বাংলার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয়ক্ষেত্রেই অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে উঠলো।

ডাচ ইংরাজ বিরোধের মীমাংসা ঃ—ইংরাজ কোম্পানী ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মনস্থির করে ওলন্দাজদের সঙ্গে বিরোধের মিটমাট করে নেওয়া হবে। ওলন্দাজ এবং ইংরাজ দুই উপনিবেশবাদী সাম্রাজ্যবাদী কোম্পানী এ বিষয়ে শুরু করে আন্তঃ কোম্পানী আলোচনা। দুই কোম্পানীর কাছেই আছে বাদশাহী ও নবাবী ফরমান। কিন্তু ব্যবসা ক্ষেত্রে উভয় কোম্পানীর গোমস্তারা অভিযোগ করতে থাকে একে অপরের বিরুদ্ধে। শোষণ ও অত্যাচারের অভয়ারণ্যে একে অপরের স্বার্থে আঘাত করতে গিয়ে নিজেদের সমস্যায় নিজেরাই যখন জড়িত হয়ে পড়ছে তখন প্রয়োজন হয়ে পড়ে দুই শয়তানের মধ্যে বৈঠক-আলোচনা। ডাচেরা বৈঠকে প্রস্তাব দেয় যে তাঁতীর প্রকৃত সংখ্যা কোন এলাকায় কত এবং কোথায় কি প্রস্তুত হয় সে সংখ্যা তথ্য সম্পর্কে আগে সার্ভে করা হোক। সংখ্যা তথ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে উভয়ে বৈঠক ক'রে তাঁতীদেরকে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেওয়া হবে। এলাকায় দখলদারী সুনিশ্চিত করা হ'ক অর্থাৎ তাঁতীরা যেন জন্তু জানোয়ার। হাটে যেমন পশু বিক্রী হয় এবং যে পদ্ধতিতে পশুমালিকরা যে যার মতো করে পশুর দাম স্থির করে এই বৈঠকেও ঠিক সেই মতো আলোচনা চলেছিল। শুদ্ধ ভাষায় এই পদ্ধতির নাম ছিল 'distribution of tantis' (তাঁতী বণ্টন)।

ইংরাজরা ওলন্দাজদের প্রস্তাবে প্রথমেই অসম্মতি প্রকাশ করে। তাঁতীর সংখ্যা, তাঁতের সংখ্যা বা ঘনবসতি এলাকা এসব নিয়ে গণনার কাজে বাংলার তৎকালীন পুতুল নবাব যাকে বলা হতো 'নিজামত' তাঁর অনুমোদন পাওয়া দরকার এই মর্মে মন্তব্য করে। 'নিজামত' অসন্তুষ্ট হলে অবমাননার দায়ে ফেলতে পারেন এই সম্ভাবনার কথাও আলোচনা করে ওলন্দাজদের সঙ্গে। ইংরাজ কোম্পানির দৃঢ় অভিমত তাঁতীদেরকে উভয়ের মধ্যে ভাগ করে নেওয়া সম্পর্কে। তারা সর্বাগ্রে চায় ওলন্দাজ নিযুক্ত গোমস্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে তদন্ত।

❑ তাঁতীদের নিয়ে ভাগবাটোয়ারা ❑

ওলন্দাজ বণিক কোম্পানি ইংরাজদের প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করে। তাদের মতে অভিযোগ নিয়ে তদন্তের পূর্বে আগে গণনা (enumeration) কার্য সমাধা হোক। উভয় কোম্পানির স্বার্থ এক। লক্ষ্য, মুনাফা অর্জন তা যেভাবেই হোক। কাজেই একে অপরের বিরুদ্ধে দোষারোপ বন্ধ করা হোক। তদন্ত মুলতুবী রেখে বন্টন ('distribution of tantis') প্রক্রিয়াকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হোক। কারণ ওলন্দাজ বণিকদের মতে ইংরাজ নিযুক্ত গোমস্তারা, পাইকারদের দালালরা ডাচদেরকে নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যে ক্রমাগত ঠেলে দিচ্ছে।

বাংলার নাজিম নিজামতের কাছে ওলন্দাজদের 'disribution of tantis' বা 'তাঁতীদেরকে বন্টন' এই প্রস্তাব পেশ হলে নিজামতের পক্ষে কর্মচারীরা প্রস্তাব দেয় ইংরাজ ও ওলন্দাজ বণিকদের উচিত নিজেদের মধ্যে বৈঠক করে বিরোধের মীমাংসা করা। তাঁতী গণনার বা তাঁত সুমারীর অনুমোদন দেওয়া সম্ভব নয়। তাদের মতে এর ফলে তাঁতীদের দুঃখ-কষ্ট আরও বৃদ্ধি পাবে, তখন তাদের যে মূল্য ধরে দেওয়া হবে তাই নিতে একান্ত বাধ্য থাকবে। এদেশীয় বণিকদেরও সুযোগ সুবিধা হ্রাস পাবে। এর ফলে এদেশের সাধাবণ মানুষের মধ্যে নেমে আসবে দুঃখ-কষ্ট। সরকারের রাজস্বেও ঘাটতি হবে। নিজামত প্রস্তাব দেন যে, তাঁতীদের বহন করতে হয় এমন কিছু করের বোঝা বরং হ্রাস করা হোক। অবশেষে ইংরাজ গোমস্তাদের আচরণ সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য একটি কমিশন গঠিত হলো। ঐ তদন্ত কমিশনে যদি ঐ গোমস্তারা দোষী সাব্যস্ত হয় তবে তাদের শাস্তি পেতে হবে। এই প্রস্তাবেও ইংরাজ কোম্পানি সম্মত হয়।

ওলন্দাজ বণিকরা নিজামতের কাছে আবেদন করে ডাচ বণিকদের ওপর আরোপ করা বাড়তি করের বোঝা বাতিল করা হোক এবং নির্দিষ্ট কারণ ছাড়া তাদের বাণিজ্য কার্যে নিজামতের কর্মচারীদের বাধা দেওয়ার অভিযান বন্ধ করা হোক ইত্যাদি। এইভাবে দুই সাম্রাজ্যবাদী বণিক কুলের বিরোধ বাংলার নাজিম-নিজামতের হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত মীমাংসা হলো। (Ref ঃ— Callender of Persian Correspondences-Vol-II. 1914 Imperial Record Deptt, Govt Printing, India, Available at National Library. Calcutta).

❑ সিল্ক বস্ত্র উৎপাদনে হুগলীজেলায় তাঁত শ্রমিকদের ভূমিকা ❑

হুগলীজেলার গ্রামাঞ্চলের প্রধান শিল্প তাঁত শিল্প, তার মধ্যে প্রধান সিল্ক বা জামদানী বা মসলিন বস্ত্র। ষোড়শ-অষ্টাদশ শতক এই তিনশ' বছরে এই শিল্পের উৎপাদনে

উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছিল। কিন্তু এই জেলায় ঐসময় কয়েকটি সিল্কমিল তৈরী হওয়াতে এই শিল্প আঘাত প্রাপ্ত হয়। তাছাড়া ম্যাঞ্চেস্টারের মিলে প্রস্তুত সিল্কবস্ত্র এদেশের বাজারে ঝড়ের গতিতে আগমন ঘটলে গ্রামাঞ্চলে সিল্ক বস্ত্র-শিল্প মুখ থুবড়ে পড়ে।

হুগলী জেলায় কটন বা সুতিবস্ত্র শিল্প কিন্তু ঐ একই সময়ে চরম উন্নতি লাভ করে। শ্রীরামপুর, চন্দননগর, আঁটপুর, রাজবলহাট, জনাই, বেগমপুর, খরসরাই, তাজপুর, ধনিয়াখালি, কৈকালা, জয়নগর, চণ্ডীতলা প্রভৃতি গ্রাম এবং মোকামে তাঁতশিল্পের বাজার রমরমা ছিল। চিকনশিল্প বা চিকন এমব্রয়ডারী কাজে নিপুণতা আছে এক প্রকার শিল্পীরা জেলার দাদপুর অঞ্চলে ঘন নিবিড় ভাবে আজও বসবাস করে। এরা সকলেই মুসলিম বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মহিলা এবং প্রত্যেকেই শ্রমজীবি। এলকাটির নাম বাবনান ঐসময় চন্দননগর বা ফরাসডাঙ্গায় উৎপন্ন বস্ত্র ইউরোপে রপ্তানী হতো। চন্দননগরে তন্তুবায়ী বংশজাত বিখ্যাত স্বভাব কবি ছিলেন 'চণ্ডীচরণ' বা 'চণ্ডীকানা'। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কমার্শিয়াল রেসিডেণ্টরা বাস করতো যেখানে সেখানে অন্ততঃ একটি করে বস্ত্র মিল বা ফ্যাক্টরী চালু করেছিল। এই বাসস্থানগুলি হলো হরিপাল, ক্ষীরপাই, রাধানগর, পাণ্ডুয়া, বলাগড়, এবং বালিদেওয়ানগঞ্জ। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ঐ সমস্ত এলাকায় কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট এবং ফ্যাক্টরী চালু ছিল। গোঘাট থানার দ্বারকেশ্বর নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত বালিদেওয়ানগঞ্জ এবং কয়াপাট বদনগঞ্জ সিল্ক ও চেলী বস্ত্র নির্মাণের জন্য ছিল প্রসিদ্ধ এলাকা। এই এলাকাগুলিতে সিল্কতন্তু আসতো উত্তর প্রদেশ থেকে এবং উৎপন্ন বস্ত্র সম্ভার রপ্তানীর জন্য উটের পিঠে চাপিয়ে আবার সেই উত্তর প্রদেশেই রওনা হতো। ইংরাজরা এই এলাকায় তখনও প্রবেশ করেনি। তবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী জেলায় একের পর এক ফ্যাক্টরী নির্মাণ করতে থাকায় সেই সমস্ত বিপুল পরিমাণ বস্ত্র সম্ভার প্রথমে ঘাটাল বন্দরে সেখান থেকে কলকাতা হয়ে ইউরোপের পথে যাত্রা করতো। পরবর্তীকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে এ শিল্পের অধিকার চলে যায় অন্যান্য ইউরোপের প্রাইভেট ট্রেডারদের হাতে।

এই জেলায় মালবেরী মসলিন তৈরী হতো, কিন্তু সে সব তো সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য নয়। ঐ মসলিন তৈরী হতো অভিজাত ও ধনীসম্প্রদায়ের পরিবারের জন্য। কিন্তু তারও অবনতি ঘটলো, নিকটবর্তী জায়গায় গুটিপোকার সন্ধান পাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠতো। উনবিংশ শতাব্দীতে সিল্কবস্ত্র প্রস্তুতের পরিবর্তে তসরবস্ত্র বয়ন গুরুত্ব পেল।

গোঘাট থানা তথা আরামবাগ মহকুমার বিভিন্ন গ্রামে আমদানী হতো তসরগুটি ছোটনাগপুর থেকে। গোঘাট থানার কয়াপাট বদনগঞ্জ ছিল তাঁতীদের তসর গুটি বিক্রয় কেন্দ্র। গুটিথেকে তন্তু প্রস্তুত হতো মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল এবং আরামবাগ মহকুমার আরামবাগ থানার মানিকপাট, রায়পুর এবং সালেপুর অঞ্চলে। বস্ত্রবয়নের কাজ হতো

মুখ্যত বদনগঞ্জ গ্রামে যে গ্রামটির নিকটেই বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলা যে দুটি জেলা আবার তসর সিল্ক জেলা হিসাবে বিখ্যাত আর বস্ত্র উৎপন্নের জন্য নির্দিষ্ট গ্রামগুলি হলো বালিদেওয়ানগঞ্জ, শ্যামবাজার, কয়াপাট বদনগঞ্জ, কুলগাছিয়া, এবং রাধাবল্লভপুর। উৎপন্ন ধুতি, শাড়ি, চাদর, জোড়, কাটপিস, চেলি প্রভৃতি রামজীবনপুর (বর্তমান মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমা) এবং রাধাকৃষ্ণপুর (হাওড়া) গ্রামের মহাজনদের কাছে যারা তাঁতীদের অগ্রিম বা দাদন দেয় তাদের কাছে বিক্রয়ের জন্য প্রেরিত হত। মহাজনরা নিজেদের খেয়াল খুশিমতো তাঁতীকে তার উৎপন্নবস্ত্রের মূল্য ধরে দিত। যে প্রথা আজও চলছে।

এই জেলায় অতীতে মিশ্র সিল্ক তসর ও সুতির মিশ্রনে একপ্রকার উন্নতমানের বস্ত্র তৈয়ারী হতো। সব গ্রামগুলিই আরামবাগ মহকুমার মধ্যে পড়ে। যেমন বালিদেওয়ানগঞ্জ, বদনগঞ্জ, উদয়পুর (খানাকুল থানা), কৃষ্ণগঞ্জ প্রভৃতি। উৎপন্ন রপ্তানী হত পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশে। মোগল আমল থেকেই এই সব এলাকা তসর সিল্ক ও সুতি বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত ছিল। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় কাল পর্যন্ত এই এলাকা তসর ও সুতি বস্ত্রের জন্য ছিল বিখ্যাত এবং ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দেও তিনহাজার তাঁতশিল্পীর বাস ছিল কেবল গোঘাট থানা অন্তর্গত গ্রামগুলিতে। এই শিল্পীরা তসর সিল্ক, সুতি মিশ্রিত তসর বস্ত্র প্রস্তুতে অত্যন্ত দক্ষ ছিল। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিমাসে ঐ শিল্পীদের আয় ছিল ৪০ টাকা থেকে ৫০ টাকা এবং এই সময়ে উক্ত গ্রাম গুলিতে বার্ষিক উৎপাদনের মোট মূল্য দাঁড়াত তিন থেকে চার লক্ষ টাকা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে সিল্ক এবং কটন মিশ্রিত ফ্যাব্রিকের পোষাক ধনিয়াখালি, হরাল, বদনগঞ্জ প্রভৃতি গ্রামে শিল্পীরা যা প্রস্তুত করতো তা কতকগুলো স্বদেশী কোম্পানীর মাধ্যমে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হতো। বানি প্রথায় শ্রমিকরা কাজ করতো। একজন তাঁত শ্রমিকের মাসে গড় আয় ছিল ত্রিশটাকা। ঐ গ্রামগুলির মোট উৎপাদন মূল্য ছিল দুলক্ষ টাকা। তাঁতশ্রমিকরা হুগলী জেলার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পুরুষানুক্রমে এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পছন্দ করতো। 'ঘরামির ঘর নেই' প্রবাদ বাক্যের মতো এদের বেঁচে থাকার মতো তেমন কোন আয় ছিল না। (সূত্র ঃ Hooghly Dist. Gazetters. 1912A.D. LSS. O' Malley ICS)

হুগলী জেলার পোলবা থানার অন্তর্গত দাঁতড়া গ্রাম। অতীতকালে রেশম বস্ত্র এবং হস্ত চালিত তাঁতের সুতিবস্ত্রের জন্য গ্রামটির খ্যাতি ছিল। গ্রামের পার্শ্ববতী বহমান কেদারমতী নদী এককালে বাণিজ্যপযোগী ছিল। এইগ্রামের রেশমবস্ত্রের নামকরণ করা হয়েছিল ''লালশশী'। ঐ বস্ত্রের আয়তন ছিল ১৮হাত × ২ হাত। দাঁতড়ার নিকটবর্তী পশ্চিমে ভূশালী, দীঘাগোড়, পূর্বে কেশবপুর সোমসাড়া প্রভৃতি গ্রামেও উৎকৃষ্ট মানের বস্ত্র প্রস্তুত হত এবং কোম্পানীর গোমস্তারা রপ্তানীর জন্য সেই সব সংগ্রহ করে ইংরাজ রেসিডেন্টের নিকট জমা দিত।

সদরমহকুমার মগরা ও পাণ্ডুয়ার নিকট গোলাগড় বা গোলঘর (Golagore) গ্রাম ইংরাজ বণিকদের বৃহদাকার আড়ং বা কারখানা ছিল। কোম্পানীর রেসিডেন্টের আবাসও ছিল। সেখানে গোমস্তা, পাইকার মহাজনদের আনাগোনায় গ্রামটি ছিল সরব। ফোর্ট উইলিয়ম থেকে ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'Minutes of Consultation' গ্রন্থে উল্লেখিত আছে যে গোলাগড়ের আড়ংটি অত্যন্ত সুবৃহৎ। কোম্পানীর গোমস্তাগণ এই আড়ংয়ে প্রস্তুত রেশম ও সুতিবস্ত্রের মজুত পাহাড় ইংরাজদের বাণিজ্যে সহাযতা দানের নিমিত্ত কলকাতায় পাঠাত। ঐ সালে গোলাগড়ের তাঁতীদের নিকট প্রদত্ত আগাম দাদনের মোট পরিমাণ লিখিত অঙ্ক অনুসারে ৩৮৫১৮ টাকা। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে হ্যামিলটন সাহেব কৃত 'হিন্দোস্তান' গ্রন্থে উল্লেখিত ঐ কমার্শিয়াল রেসিডেন্টের নাম পাওয়া যায়। ঊনবিংশ শতকের মধ্য ভাগে তাঁতীদের সর্বনাশের যুগে রেসিডেন্সী অবলুপ্ত হওয়ার সাথে সাথে লুপ্ত হয় গোলাগড়ের রেশম বস্ত্র। মগরার সন্নিকটে সরস্বতীনদী তীরবর্তী এলাকাতেও বসবাসকারী তাঁতীরা রেশমবস্ত্র প্রস্তুত করত। কালের করালগ্রাসে একই কারণে তারাও অবলুপ্ত হয়। গোলাগড় গ্রামটির অবস্থান সঠিক কোথায় তা নিয়ে কিছু বিভ্রান্তি আছে। প্রাচীন মানচিত্রে দেখা যায় বরানগরের নিকট গঙ্গার পূর্বপাড়ে গোলাগড়। এর কোন প্রমাণ অবশ্য মেলেনি।

তাঁতশিল্পের অষ্টাদশ শতকের ভয়াবহ চিত্র ঃ-১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডেব কমন্স সভায় ঐ সভার সদস্য মিঃ লার্পেণ্টি ভাবতের শিল্প ধ্বংস প্রসঙ্গে (Ruins of Trade in India) খেদের সঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন।—"আমরাই (অর্থাৎ ব্রিটিশরাই) ভারতের শিল্পসমূহ ধ্বংস করেছি।" ভারতের বস্ত্র শিল্প ধ্বংসের কারণ প্রসঙ্গে কমনস এবং লর্ড সভায় উত্তপ্ত আলোচনার পর তদন্তের জন্য গঠিত হয় 'এনকোয়ারী কমিটি'। সেই কমিটিব প্রেসিডেন্ট দাম্ভিকতাপূর্ণ এক মন্তব্য করেন-"ভারতের বস্ত্রশিল্প যা ইতিমধ্যেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে তা নিয়ে আর কোন প্রশ্ন উঠতে পারেনা।"

ইংরাজরা এদেশে রাজদণ্ড গ্রহণ করে ভারতের সুপ্রসিদ্ধ হস্তচালিত বস্ত্র শিল্পকে যদি জাহান্নমের পথে পাঠাতে সক্ষম না হতো তবে ম্যাঞ্চেষ্টার, ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্র শিল্পের বাজার রমরমা হতো না। ভারতে শুল্কমুক্ত অবাধ বাণিজ্য নীতির ফলে ইংলণ্ডের বস্ত্রব্যবসায়ীরা বিশ্বজয় করতে বিশ্বায়নের পথে প্রতিরোধহীন গতিতে অগ্রসর হতে থাকলো। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে প্রবেশ করে কেবল লাভ ও লোভের বশবর্তী হয়ে তাঁতীদের ওপর বল্গাহীন অত্যাচার চালিয়ে শিল্পটির অন্তিম যাত্রার পথ তৈরী করে দিয়েছিল। তাঁতশিল্পের উন্নতির জন্য উপনিবেশবাদীরা এক কানাকড়িও ব্যয় করতো না। তন্তুবায়ীরা বেঁচে থাকতো নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী। এই ভাবে চললো সপ্তদশ শতক থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত যখন এই শিল্পের মৃতপ্রায় অবস্থা। শিল্পী ও শ্রমিকরা পঙ্গু, তাঁতশিল্প অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে শ্মশানের চিত্র তখন এই ধ্বংসকাণ্ডের বিনিময়ে

গড়ে ওঠা বিলাতীপণ্যের আন্তর্জাতিকবাজারের খ্যাতি বিলাসী এদেশীয়দের কাছে অমূল্য রত্নের সমতুল রূপে সমাদৃত হতে থাকলো।

❑ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রকোপে বাংলার তাঁতীরা ❑

১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ, ১১৭৬ বঙ্গাব্দে বাংলা প্রদেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হলো। ইংরাজদের রাজনৈতিক অনিচ্ছার জন্য এর মোকাবিলা করা হয়নি। কৃষক এবং তন্তুবায়ী কয়েক লাখ মানুষের মৃত্যু ঘটলো দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ প্রকোপে। এমন দুর্ভিক্ষ সত্বেও ইংরাজরা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কর আদায়ের চাপ বিন্দুমাত্র হ্রাস করে নি তো বটেই বরং এই সময়ে ইংরাজরা অত্যাচার উত্তরোত্তর বাড়িয়েই চলে। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যেই বাংলা তথা সারা ভারতবর্ষে শক্ত ও পাকাপোক্ত হয়েছে। ইংরাজদের কর আদায়ের এই অভিযানে বাংলায় নেতৃত্বে দেয সুবাদার কুখ্যাত রেজা খান।

মন্বন্তরের পাঁচবছর পূর্বে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে মুর্শিদাবাদে তদনীন্তন নবাব নাজিম মীর নিজাম-উদ্‌দৌল্লার সঙ্গে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্বাক্ষরিত শর্ত অনুসারে কোম্পানী সমগ্র বর্দ্ধমান জেলা (বর্তমান হুগলী জেলা এবং মেদিনীপুরের একাংশসহ) মেদিনীপুর এবং চট্টগ্রাম জেলার কর আদায় এবং সংগ্রহের ভার ইংরাজদের হাতে সম্পূর্ণভাবে হস্তান্তরিত হয়। ইংরাজরা রেজা খাঁ নামক জনৈক দালালকে ঐ তিনজেলার নায়েব-সুবাদার পদে নিয়োগ করে, যদিও নিয়োগের আদেশে নবাব নাজিমও স্বাক্ষর দেন। ইংরাজদের বিনা অনুমতিতে উক্ত রেজা খাঁ (খান)কে অপসারণ করা যাবে না। শর্ত অনুসারে নবাব নাজিমের এই ব্যাপারে কোন অধিকার ছিল না। নবাব-নাজিম মীর নিজাম উদ-দৌলা ছিলেন বিশ্বাসঘাতক মীর-জাফরের পুত্র। রেজা খাঁর কার্যে সন্তুষ্ট হয়ে কোম্পানী কর্তৃপক্ষ পুরস্কার স্বরূপ তাকে ১৭৭১ খ্রষ্টাব্দে 'নায়েব দেওয়ান' (Chief of administration) পদে নিয়োগ করে। যখন ইংরাজরা অনুভব করলো রেজা খাঁকে আর প্রয়োজন নেই, উদ্দেশ্য সফল হয়েছে তখন তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয় ৫ই আগষ্ট, ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে যেদিন মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি হয়েছিল। রেজা খাঁয়ের বিরুদ্ধে জনসাধারণের ওপর অভিযোগ আনা হয়েছিল। কারা আনলো অভিযোগ, কে বিচার করলো সবই ইংরাজদের মর্জির ভিত্তিতে সমাধা হলো। অভিযোগের উত্তরে রেজা খাঁয়ের জবাব ছিল খুবই স্পষ্ট ঃ—

"I have always been under the direction of the Council and gentlemen of Motijhil (Resident at the Durbar) and the gentlmen of the Council have sent many orders to the gentlemen of Motijhil which agreeably to the directions I have executed. If I have committed acts of violence and oppression why did the gentlemen of Motijhil allow of it?...." রেজা খাঁয়ের প্রত্যুত্তর ইংরাজ কর্তৃপক্ষ খারিজ

করে দেয়। (Ref. Economic History of Bengal by N K. Singh-vol I (-page 60) ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ বা ১১৭৬ সাল সারা বাংলায় ব্রিটিশ রাজত্বের সর্বাধিক কুখ্যাত ভয়াল ভীতিপ্রদ শাসনের বৎসর। বাংলায় ব্রিটিশ শাসনের আমলে এই বৎসরের পূর্বে ও পরে অনেক দুর্ভিক্ষ হয়ে গেছে কিন্তু এরূপ ভয়াবহ পরিস্থিতি কখনও সৃষ্টি হয়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাকী সময় কাল জুড়ে এই দুর্ভিক্ষের প্রতিফল বাংলার হতভাগ্য মানুষগুলোকে ভোগ করতে হয়েছে।

১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ সালটি জুড়ে দুর্ভিক্ষ দাপিয়ে ছারখার করে ফেলেছিল গোটা বাংলাকে। ১৭৬৯ সালে দেখা ছিল দেশজুড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে খাদ্যাভাব। খাদ্য মজুত কিন্তু সাধারণ মানুষের আয় নেই। নেই ক্রয়ক্ষমতা। মুর্শিদাবাদের ইংরাজ রেসিডেন্টের কাছে রিপোর্ট ছিল নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দর অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে এক টাকায় চাল মিলতো ছয় থেকে সাতসের। এতদসত্ত্বেও সাধারণ মানুষ এক ছটাক চালও সংগ্রহ করতে পারতো না। জলের বিভিন্ন উৎস এবং পুষ্করিনী শুকিয়ে কাঠ। ভয়ঙ্কর দাপটে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটতো প্রায়শঃই। হাজার হাজার মানুষ মারা যায় দাবদাহে। এক একটা পরিবারের সবাই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। অগ্নিদগ্ধ হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় দিনাজপুর, পূর্ণিয়া প্রভৃতি জেলার খাদ্যগুদাম। রোগ মহামারী আকার ধারণ করে প্রায় প্রতিটি জেলাতেই। মুর্শিদাবাদ জেলায় বসন্ত রোগে মারা যায় বহু মানুষ।

প্রত্যহই মানুষ মারা যায়। মৃতদেহের ওপরই নতুন নতুন মানুষ মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে। নতুন শস্য উৎপন্ন হতো, কিন্তু সেই শস্য কাটবার মানুষ মিলতো না। জমির মালিক নেই, শস্যের কোন মালিক ছিল না। শুখা জেলা হিসাবে পরিচিত বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান জেলার উত্তর ও পশ্চিমাংশে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে হাজার হাজার মানুষ। বহু গ্রামের জনবসতি প্রায় শূন্য। গোটা বীরভূম জেলার মনুষ্যবসতি যেভাবে শূন্যের কোঠায় ঠেকেছিল তাতে প্রশাসনই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। শহরগুলোর এক চতুর্থাংশ ফাঁকা হয়ে যায়। ভাগলপুর শহরের অর্ধেক মানুষের মৃত্যু ঘটে। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কোন একটি এলাকার ছাব্বিশটি গ্রামের মোট জনসংখ্যা ৫৫৬, ছিল ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সেই সংখ্যা দাঁড়িয়ে ছিল দুশো বিয়াল্লিশে।

হুগলীর অবস্থা বর্ধমানের অপেক্ষা শোচনীয়। ফসল মাঠে মাঠে কিন্তু শস্য কাটার মজুর নেই। মেদিনীপুর জেলায় ফসলের ওপর চলে পতঙ্গ পঙ্গপালের উৎপাত। গরুর গাড়ি থেকে জেলেনৌকা সব নিথর। এগুলোর চালকরা কেউ জীবিত নেই। বস্ত্র, লবন রপ্তানীর জেলা মেদিনীপুর। কিন্তু পরিবহন শ্রমিকদের অধিকাংশই মৃত। মৃতপ্রায় ব্যক্তিদের মুখে জল ঢালার কেউ বেঁচে নেই। মৃতদেহ সৎকারের লোক মেলে না। পথে পথে মৃতদেহের স্তূপ। বাংলার মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশই শেষ।

বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস কোম্পানীর 'কোর্ট অব ডিরেক্টরস্' এর কাছে প্রেরিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন—"I was not in Bengal at the time of famine but I had always heard the loss of inhabitants reckoned at a third and in some places one half of the whole"। এই প্রতিবেদন পাঠিয়ে হেস্টিংস ভেবেছিলেন নিজের দায়িত্ব অস্বীকার করা অনুমোদিত হবে। কিন্তু হয়নি। তাকে ইংলণ্ডে হাউস অব্ কমনসের বিচাব সভার কাঠগড়ায় অন্ততঃ দাঁড়াতে হয়েছিল। বাংলায় ইংরাজ নিযুক্ত সুবাদার এবং পরবর্তীকালের নায়েব দেওয়ান রেজাখাঁ এই সময়েই ইংরাজ কোম্পানীর তহবিলে রাজস্ব সংগ্রহের অভিযানে মহাআড়ম্বরে নেমে পড়ে। মুর্শিদাবাদের দরবারে শোভাবর্ধনকারী হুকুমদার ইংরাজ রেসিডেন্টই সর্বেসর্বা। তিনিই রাজস্ব আদায়ের সবকিছুরই নিয়ন্ত্রক। তাঁর দুই চক্ষুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সর্বদা রাজস্ব আদায়ের দিকে। নায়েব দেওয়ান, গোমস্তা দেওয়ান, পরিদর্শক এরা প্রত্যেকে রাজস্ব আদায়ের প্রতি গভীর নজর দিচ্ছে কিনা তা কঠোর ভাবে লক্ষ্য রাখছেন ইংরাজ রেসিডেন্ট স্বয়ং। তাঁর হুকুম, দুর্ভিক্ষই হোক আর যাই হোক কোষাগারে রাজস্ব আদায় যেন কমতি না হয়। পূর্বের বছরগুলির থেকে আরও বেশি বেশি অর্থ কোম্পানীর কোষাগারে জমা করতে হবে। কাণ্ডজ্ঞান লুপ্ত হওয়ায় বৃদ্ধি করা হয়েছিল কোম্পানীকে দেয় প্রত্যেকের রাজস্বের পরিমাণ। রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ অদ্ভুত ভাবে এই সময়কালে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। নিরন্ন মৃতপ্রায় যে মানুষ শেষ পর্যন্ত মরতে পারেনি পরবর্তীকালে তারা ডাকাতদল তৈরী করে জীবিত ধনবান মানুষদের সর্বস্ব লুঠ করতে আরম্ভ করেছিল। হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমা বিশেষতঃ গোঘাট এলাকার ভিকদাস ছিল ডাকাত দলের অবাধ বিচরণ ভূমি।

নদীয়া জেলার অবস্থা ছিল ভয়াবহ। সুপারভাইজার (রেভিনিউ) সরকারকে রিপোট দিচ্ছে যে রায়ত কুড়িবিঘা চাষ করে সে পাঁচ বিঘাও ঐবৎসর চাষ করতে পারেনি। জমিদাররাও 'তাকাভি ঋণ' বা অগ্রিম কিছু দিতে পারবে না। ডাকাতি, সংঘর্ষ ও সন্ত্রাস থামাতে বরং দু কোম্পানী সিপাহী প্রেরণ করার জন্য তিনি আবেদন জানালেন। বর্ধমানের রাজা রিপোর্ট পাঠালেন এই মর্মে যে, জেলার উত্তারাংশের ফসল সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। প্রজারা দলে দলে পালাচ্ছে। এইরূপ পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন না হয়ে সরকার (কোম্পানী) স্থির করলো বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ এবং কলকাতায় অবস্থানকারী সৈন্যদের খোরাক যোগাতে জেলাগুলি থেকে বেশি বেশি করে খাদ্য পাঠাতে হবে। পাটনা শহরে প্রত্যহ মৃতদেহের সংখ্যা দাঁড়ায় কমকরেও পঞ্চাশ থেকে একশত জন। তথাপি এই শহরে মজুত খাদ্যশস্য ভাণ্ডার থেকে আশিহাজার মন চাল সৈন্যদের খোরাক হিসাবে বহরমপুর ও কলকাতায় প্রেরনের আদেশ হয়েছিল।

বিহারের রাজমহল এলাকার অর্ধেক জমিতে কোন চাষাবাদ হয়নি। ভাগলপুর শহরের অর্ধেক মানুষ মৃত্যুর মুখে পড়ে। বাকিরা প্রহর গোনে। জঙ্গল অধ্যুষিত জেলাগুলি প্রায় জনশূন্য। ভাগলপুর জেলার সদর শহরের তিন চতুর্থাংশ নাগরিক মৃত। বিশবছর

বা তারও বেশি সময় ধরে চুক্তির ভিত্তিতে যে সমস্ত রায়ত জমি চাষ করতো তারা জমি চাষ করাই ত্যাগ করা শ্রেয়ঃ মনে করলো। ভাগলপুর রাজমহল প্রভৃতি জেলায় প্রায় সমস্ত চাষের জমি সরকারের খাসে চলে গেল। কলকাতা থেকে ইংরাজ মিলিটারী যাতায়াতের জন্য এই সব এলাকায় প্রচণ্ড খাদ্যাভাব তো বটেই নানানধরনের সামাজিক সংকটও দেখা দিল। সৈন্যরা নারীধর্ষন চালাতো অবাধে। লুঠপাটে তো কোন বাধাই ছিল না। পাটনায় প্রবেশ এবং নিস্ক্রমনের জন্য মিলিটারীর পরিবহন গাড়িগুলির ঘনঘন দ্রুতগতিতে ছোটাছুটি পথের নিরাপত্তা ব্যবস্থা একেবারে বেহাল পর্যায়ে পৌঁছায়। গাড়িগুলির চাকার তলায় বহু মানুষ মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে। কোন প্রতিক্রিয়া ঘটতো না এই ধরনের অজস্র ঘটনার। মুঙ্গেরে ছিল সৈন্যনিবাস। পাটনা—মুঙ্গের পথটি পরিণত হলো জীবিত মানুষদের কাছে আতঙ্কের। মুঙ্গেরে অবস্থিত সেনানিবাসের সৈন্যদের খোরাক রসদ সরবরাহ করতে মুঙ্গেরবাসীরা নিরন্ন থেকেও বাধ্য হওয়ায় পরিস্থিতি হয়ে উঠলো শোচনীয়, ভয়ঙ্কর, আমানবিক। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চমাসে ইংরাজ কোম্পানী পৃষ্ঠপোষিত সুপার ভাইজার কেন্দ্রে রিপোর্ট পাঠায় কেন্দ্রে যে সাধারণ মানুষের জন্য কোন খাদ্য নেই, মাঠেও কোন ফসল উৎপাদন হয়নি।

যশোহর শহরের 'আমীল' (Amil) প্রতিবেদনে জানাচ্ছে যে, ঐ জেলার মানুষেরা বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে গাছের পাতা ভক্ষন করে। মানুষ খাদ্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রত্যন্ত জঙ্গলে। যেন সব আদিম মানুষের দল। মালদহ শহর থেকে নিরন্ন বুভুক্ষু মানুষের ঢল নেমে ছিল পলাতক পথে। এই জেলা থেকে কোম্পানী সিল্ক বস্ত্র (রেশম) যা সংগ্রহ করতো বা যে পরিমাণের জন্য পূর্ববর্তী বছরে লগ্নী করেছিল তার অর্ধেকও সংগ্রহে ব্যর্থ। তাঁতের সংখ্যা ভয়ঙ্কর ভাবে হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং শেষ পর্যন্ত সংখ্যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে দুর্ভিক্ষ পূর্বের প্রায় অর্ধেক।

(Ref. Controlling Council, Du Carel's Letter, 20 Dec. 1771A. D)

দিনাজপুর জেলায় গ্রামের পর গ্রাম জনশূন্য, সর্বত্র খরা আর দুর্ভিক্ষ। জমিদার ব্যস্ত কেবল 'মালগুজারি' 'আদায়ের জন্য। সে চিন্তা করতো কেবল তার এবং তার পরিবারের মঙ্গলের জন্য, প্রজাদের কথা চিন্তা করা তো দূরের কথা, কর আদায়ে জর্জরিত করতো। ইংরাজ রেসিডেন্টের কাছে জমিদারের প্রতিবেদন থাকতো যে বীজ এবং যন্ত্রপাতির অভাবে চাষবাস হয়নি। কাজেই আদায়ীকৃত রাজস্বের ভাগ সম্পূর্ণ সেই ভোগ করতো। দিনাজপুর জেলাতেই সূত্রপাত হলো 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' নামে জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষকদের বিদ্রোহ। বাখরগঞ্জ জেলা বিখ্যাত ছিল চাল উৎপাদনে। দুর্ভিক্ষ চলাকালীন ঐ এলাকার মানুষদের নিরন্ন রেখে ইংরাজ কুঠিয়ালরা কলকাতা এবং মুর্শিদাবাদে বসবাসকারী ইংরাজ নারী পুরুষদের পেট ভর্তির জন্য চাল বাখরগঞ্জ থেকে টেনে নিয়ে আসতো।

বাংলার তাঁতশিল্পীরা ছিল এই সকল কৃষকের ঘরের সন্তান। কৃষক পরিবার ধ্বংসের অর্থ তাঁতশিল্পও ধ্বংস। 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' বাংলার গৌরব তাঁত শিল্পের অবশিষ্টকে একেবারে শূন্যে মিলিয়ে দিল।

❑ 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' পরবর্তী পরিস্থিতি ❑

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ঃ- ইংরাজদের তোষামোদকারী জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, দিনাজপুর, রঙপুর, রাজশাহী, মালদহ প্রভৃতি জেলাগুলিতে সন্ন্যাসী ও ফকিররা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এরা সকলেই রায়ত বা কৃষক এবং তন্তুবায়ী। কিন্তু জমিদার মহাজনদের লোভ, অত্যাচার আর খরা দুর্ভিক্ষ এদের অস্থির করে তুলেছিল। ইংরাজরা এদেরকে 'ডাকাতদল' বলে অভিহিত করতো। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উত্তরবঙ্গের মহারথী ডুক্রেল পূর্ণিয়া থেকে কোম্পানীর কাছে প্রেরিত প্রতিবেদনে জনায়" "barely a day passes that I do not hear of some beare forced robbery"

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন গহন জঙ্গলে বিদ্রোহী সন্ন্যাসী ও ফকিররা ইংরাজ সৈন্যদের আক্রমণে শেষ পর্যন্ত প্রাণবাঁচাতে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই সব বিদ্রোহী সন্ন্যাসী ও ফকিরদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মানুষই অন্তর্ভূক্ত ছিল। সাম্প্রদায়িক ঐক্য গড়ে তুলেই এরা ইংরাজদের বিরুদ্ধে লড়াইযে নেমেছিল। সেই সমস্ত গহণ অরণ্যেই অভয়ারণ্য, এইসব সন্ন্যাসী ফকিররা পরবর্তীকালে বসবাস শুরু করেছিল। সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের প্রতি নিরন্ন কৃষক ও তন্তুবায়ীদের ছিল পূর্ণ সমর্থন। সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের আতঙ্কে অনেক জমিদার প্রাণ ভয়ে পলায়ন করে ইংরাজদের কুঠি ও আড়ংয়ে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল।

দুর্ভিক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সর্বাধিক ভাবে তাঁতীরা। তাছাড়া রেশম গুটির চাষ করে তারা প্রায় শেষ হয়ে গেছলো। ক্রেতা সাধারণ না থাকায় তাঁতশিল্পের যেটুকু অস্তিত্ব বিরাজ করতো তাও শেষ হয়ে যায়।

ইংলণ্ডের লর্ডস ও কমনস সভায় এই দুর্ভিক্ষ ও নানান ধরনের বিদ্রোহ এবং বিদ্রোহের ঢেউ আছড়ে পড়লো বাগ্মী এডমণ্ড বার্কের ক্রমান্বয়ে শানিত বিতর্কেব জালে। ওয়ারেন হেস্টিংসেব বিচার হলো। কিন্তু ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের অবস্থাব কোন পরিবর্তন তাতে ঘটেনি। পরিবর্তনের মধ্যে ভারতশাসনের ভার ইষ্টি ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিবর্তে ইংলণ্ডেশ্বরীর হাতে হস্তান্তরের ঘটনাই প্রধান।

বাংলা ও বিহারে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' যখন তুঙ্গে তখন রেজা খাঁয়ের রাজস্ব আদায় অভিযানে কোন ত্রুটি ছিল না। রাজস্ব আদায়ের তৎকালীন সময়ের চিত্র ছিল ইংরাজদের কাছে সন্তোষজনক। কোম্পানীর অধীন সুবাগুলিতে দেওয়ানী জমির জন্য ১৭৬৮-৬৯ খ্রীষ্টাব্দে নীট রাজত্ব সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ১৫, ৮৭৩, ৪৫৩ টাকা, ১৭৬৯-৭০ খ্রীষ্টাব্দে ১৪,৩৪১,১৬৮ টাকা, ১৭৭০-৭১ খ্রীষ্টাব্দে ১৪,০০৬,০৩০ টাকা এবং ১৭৭১-৭২ অব্দে ১৫,০২৩,২৬০ টাকা। অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ চলাকালীন ইংরাজ কোম্পানীর পক্ষে রাজত্ব আদায়ের ঘাটতির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছিল মাত্র এক লক্ষ টাকায়। কিন্তু একবছর পরেই আবার সেই ঘাটতি পূরণও করা হয়েছিল।

রাজস্ব আদায়কারীদের প্রতি রেজা খাঁয়ের নির্দেশ ছিল এই রকম, যে যারা দুর্ভিক্ষে বেঁচে আছে তাদের বেশি বেশি রাজস্ব দিতে হবে, মৃত ব্যক্তিদের দেয় রাজস্ব তাদের বহন করতে হবে। রাজস্বের এই অতিরিক্ত বোঝার নাম ছিল 'নাজাই'। দুর্ভিক্ষে প্রায় এক কোটি মানুষ নিশ্চিহ্ন হলেও তার প্রতিফলন ঘটেছিল রাজস্ব ঘাটতির চিত্রে। বাংলা এবং বিহারের অনেকাংশের সঙ্গে ডুক্রেলের দায়িত্ব পূর্ণিয়ার জেলারও রাজস্ব আদায়ের। ১৭৬৭-৬৮ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ণিয়ার রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১২,৯৭,৬০৩ টাকা, ১৭৬৯-৭০ খ্রীষ্টাব্দে ১১,৬০,২৭৯ টাকা এবং দুর্ভিক্ষের বছর ১৭৭০-৭১ খ্রীষ্টাব্দে ১১,৩৮,৭১২ টাকা আদায়করা হয়। নবাব দরবারের ইংরাজ রেসিডেন্ট ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে ২৮শে ডিসেম্বর একপত্রে কোম্পানীকে জানায় যে রাজস্ব আদায়ের প্রচেষ্টা কোন মতেই শিথিল করা উচিত হবে না। যদি কোন শিথিলতা ও প্রদর্শিত হয় তবে অনাদায়ী রাজস্বের জন্য কোম্পানীরই ক্ষতি হবে। পত্রটির একাংশ নিম্নরূপ ঃ-

"No endeavours were wanting on my part the least relaxation either on my part or on that of Md. Reza Khan the company would have been much more sufferers."

যেহেতু ইংরাজরা ছিল দখলদার তাই বাংলা বা ভারতবর্ষের জনসাধারনের প্রতি, শিল্পী ও শিল্পের প্রতি, কৃষক ও শ্রমিকদের প্রতি কোন দায়বদ্ধতা ছিল না। কেবল তাঁতশ্রমিকেরাই নয় সমগ্র দেশবাসীকে উপনিবেশবাদীদের হাড়কাঠে পাঁঠা বলি করা হলো। কোন মানবিকতার ধার ধারেনি ইংরাজরা।

১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে যে দুর্ভিক্ষ যখন ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে তখন রাজস্ব আদায়ের জন্য নিযুক্ত সুপারভাইজারদের কোটা ধার্য করা হয়েছিল সুপারভাইজার এবং আমীলদের মধ্যে রাজস্ব আদায়কার কত বেশী হতে পারে তাই নিয়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দিতা হতো। 'নাজাই' নামে যে করটি সবসময় এবং নিয়মিত আদায় হওয়ার কথা নয় সেই কর আদায়ের জন্য অতি বাড়াবাড়ি ধরনের চাপসৃষ্টি করা হতো। উদ্দেশ্য সরকারী কোষাগারে অর্থাৎ একদিকে নবাব নাজিম অন্যদিকে ইংরাজ কোম্পানীর কোষাগারে বিপুল পরিমাণ অর্থ

তুলে দিয়ে দুতরফের কাছ হতেই আদায়কারীরা প্রশংসা পেতে পারে। যারা আদায় করতো তারা কিন্তু সকলেই বাঙ্গালী বা ভারতীয়। নিজ দেশবাসীর প্রতি তাদের মধ্যে কোন ন্যূনতম কৃতজ্ঞতা বোধও ছিল না। ওরা ছিল ইংরাজদের তোষনকারী।

'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কালে' বাংলা বিহারের সর্বত্র যখন মৃত্যুর মিছিল তখনও কোম্পানীর অধীন সুপারভাইজার, গোমস্তা, আমীল, নায়েব-আজিম, নায়েব দেওয়ান থেকে কুঠির কুঠিয়াল, দরবারের রেসিডেন্ট থেকে রেজা খাঁ সকলের কাছেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বোর্ড অব ডিরেক্টরস এর কড়া নির্দেশ ছিল রাজস্ব আদায়ে দুর্ভিক্ষ হওয়া সত্ত্বেও যেন কোন শিথিলতা সেখানে না হয় ('Nothing was permitted to impede the collection of the customery revenue)'।

কোম্পানী যে বিশাল সৈন্যবাহিনী কলকাতা, মুর্শিদাবাদ সহ বিভিন্ন স্থানে সংরক্ষিত রেখেছিল তাদের ব্যয়ভার বহনের জন্য দুর্ভিক্ষের বছরে কিন্তু বিন্দুমাত্র শিথিলতা ছিল না। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে খাদ্য মজুত ছিল ৬০,০০০ মন। কলকাতা সৈন্যনিবাসে সর্বাপেক্ষা বেশি পরিমাণ খাদ্যসরবরাহ করা হতো। দুর্ভিক্ষের বছরে সৈন্যদের মধ্যে কোন খাদ্যাভাব ছিল না। যেখানে দেশে এক কোটি মানুষের দুর্ভিক্ষে মৃত্যু হলো সেখানে একজন সৈন্যও মারা যায়নি। কলকাতা সৈন্যনিবাসে যেমন খাদ্যমজুত হতো বাংলার মানুষের মুখের গ্রাসকেড়ে নিয়ে সেইরূপ ভাগলপুর, রাজমহল, পূর্ণিয়া প্রভৃতি এলাকার মানুষদের মৃত্যু সুনিশ্চিত করে মুঙ্গেরের দুর্গে অবস্থানরত সৈন্য বাহিনীর খাদ্য যোগান দেওয়া হতো। এদেশের জমিদাররা, পুঁজিপতি বণিকরা জনসাধারণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে ইংরেজদের পক্ষাবলম্বন করেছিল। মীরজাফরের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে তারা ছিল ভয়ঙ্কর রকম উৎসাহী। ''ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' বাংলার বুকে কিরূপ সর্বনাশ ডেকে এনেছিল তা সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনা থেকে কিছু উদ্ধৃতি এই পৃষ্ঠায় তুলে ধরা হোল যার সঙ্গে পাঠকরা অত্যন্ত পরিচিত ।

''১১৭৬ সালে গ্রীষ্মকালে একদিন পদচিহ্ন গ্রামে রৌদ্রের উত্তাপ বড় প্রবল। গ্রামখানি গৃহময়। কিন্তু লোক দেখি না, বাজারে সারিসারি দোকান, হাটে সারি সারি চালা, পল্লীতে পল্লীতে শত শত মৃন্ময় গৃহ, মধ্যে মধ্যে উচ্চ নীচ অট্টালিকা। আজ সব নীরব, বাজারে দোকান বন্ধ, দোকানদার কোথায় পলাইয়াছে ঠিকানা নাই, আজ হাটবার, হাটে হাট লাগে নাই। ভিক্ষার দিন ভিক্ষুকেরা বাহির হয় নাই। তন্তুবায় তাঁত বন্ধ করিয়া গৃহ প্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতেছে, ব্যবসায়ীরা ব্যবসা ভুলিয়া শিশুক্রোড়ে করিয়া কাঁদিতেছে, দাতারা দান বন্ধ করিয়াছে, অধ্যাপক টোল বন্ধ করিয়াছে, শিশুও বুঝিবা সাহস করিয়া কাঁদে না। রাজপথে লোক দেখি না, সরোবরে চাতক দেখি না, গৃহদ্বারে মনুষ্য দেখি না, বৃক্ষে পক্ষী দেখি না, গোচারনে গোরু দেখি না, কেবল শ্মশানে শৃগাল-কুক্কুর। এক বৃহৎ অট্টালিকা তাহার বড় বড় ছড়ওয়ালা থাম দূর হইতে দেখা যায়। সেই গৃহারণ্য মধ্যে শৈলশিখরবৎ শোভা

পাইতেছিল। শোভাই বা কি, তাহার দ্বাররুদ্ধ, গৃহমনুষ্যসমাগম শূন্য। শব্দহীন বায়ু প্রবেশের পক্ষেও বিঘ্নময়, তাহার অভ্যন্তরে ঘরের ভিতর মধ্যাহ্নে অন্ধকার। অন্ধকারে নিশীথ ফুল্লকুসুম যুগবৎ এক দম্পতি বসিয়া ভাবিতেছ। তাহাদের সম্মুখে মন্বন্তর।

১১৭৪ সালে ফসল ভাল হয় নাই, সুতরাং ১১৭৫ সাল চাল কিছুটা মহার্ঘ হইল। লোকের ক্লেশ হইল। কিন্তু রাজা রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে লইল, রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া দরিদ্ররা এক সন্ধ্যা আহার করিল।

১১৭৫ সালে বর্ষাকালে বেশ বৃষ্টি হইল, লোকে ভাবিল দেবতা বুঝি কৃপা করিলেন। আনন্দে আবার রাখাল মাঠে গান গাহিল, কৃষকপত্নী রূপার পৈঁচার জন্য স্বামীর কাছে দৌরাত্ম্য আবম্ভ করিল। আকস্মাৎ আশ্বিন মাসে দেবতা বিমুখ হইলেন, আশ্বিনে কার্ত্তিকে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়িল না। মাঠে ধানসকল শুকাইয়া একেবারে কড়া হইয়া গেল। যাহার দুই এক কাহন ফলিয়াছিল, রাজপুরুষেরা তা সিপাহির জন্য কিনিয়া রাখলেন। লোকে আর খাইতে পাইল না। প্রথমে এক সন্ধ্যা উপবাস করিল, তারপর এক সন্ধ্যা আধপেটা করিয়া খাইতে লাগিল তারপর দুই সন্ধ্যা উপবাস আরম্ভ করিল। সে বছর কিছু চৈত্র ফসল হইল। কাহারও মুখে তাহা কুলাইল না। কিন্তু মহম্মদ রেজা খাঁ রাজস্ব আদাযের কর্ত্তা, মনে করিল, আমি এই সময় সরফরাজ হবে, একেবারে শতকরা দশ টাকা রাজস্ব বাড়াইয়া দিল। বাঙ্গালায় বড় কান্নার কোলাহল পড়িয়া গেল' লোকে প্রথমে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। তারপর কে ভিক্ষা দেয়। উপবাস করিল। লাঙ্গল জোয়াল বেচিল। বীজধান খাইয়া ফেলিল ঘরবাড়ী বেচিল, জোতচমা বেচিল, তারপর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল, তারপর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল তারপর মেয়ে ছেলে স্ত্রীকে কে কিনিবে খরিদ্দার নাই, সকলেই বেচিতে চায়।

খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল। ঘাম খাইতে আরম্ভ করিল। আগাছা খাইতে লাগিল, ইতর ও বন্যের কুক্কুর, ইঁদুর ও বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেক পলাইল, যাহারা পলাইল, তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারের মরিল, যাহারা পলাইল না, তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।

রোগ সময় পাইল। জ্বর ওলাওঠা, বসন্ত, বিশেষতঃ বসন্তের বড় প্রাদুর্ভাব হইল। গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে কেহ কাহারও চিকিৎসা করে না, কেহ কাহাকে দেখে না, মরিলে কেহ ফেলে না। অতি রমণীয় বপু অট্টালিকার মধ্যে আপনা আপনি পচে, যে গৃহে একবার বসন্ত প্রবেশ করে সে গৃহবাসীরা রোগী ফেলিয়া ভয়ে পালায়।

মহেন্দ্র সিংহ পদাচিহ্ন গ্রামে বড় ধনবান-কিন্তু আজ ধনী নির্ধন একদর। এই দুঃখ-পূর্ণ কালে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া তাঁহার আত্মীয় স্বজন, দাসদাসী সকলেই গিয়াছে। কেহ মরিয়াছে, কেহ পলাইয়াছে। সেই পরিবারের মধ্যে এখন তাঁহার ভার্য্যা ও তিনি স্বয়ং

এবং এক শিশুকন্যা। তাঁহাদের কথাই বলিতেছিলাম তাঁহার ভার্য্যা কল্যানী চিন্তাত্যাগ করিয়া গোশালে গিয়া স্বয়ং গো-দোহন করিলেন, পরে দুগ্ধ তপ্ত করিয়া কন্যাকে খাওয়াইয়া গোরুকে ঘাসজল দিতে গেলেন। ফিরিয়া আসিলে মহেন্দ্র বলিল, এরূপ কদিন চলিবে?"

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের উক্ত উদ্ধৃতি দেওয়া হল তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসের 'আনন্দমঠ' এর পৃষ্ঠা থেকে। ১১৭৬ সালে বাংলা ও বিহারে যে এক কোটি মানুষ প্রাণত্যাগ করেছিল তার জন্য দায়ী ছিল সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ, তাদের পুতুল সরকার এবং রাজস্ব আদায়ের কর্তা রেজা খাঁ থেকে আরম্ভ করে পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ী, বিশ্বাস ঘাতক মীর-জাফরের বন্ধুবর্গ রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ এরা তো বটেই তারসঙ্গে নায়েব গোমস্তা, মহাজন, দারোগারা। বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য অনুযায়ী ১১৭৪ সালে প্রবল অনাবৃষ্টি কিন্তু ১১৭৫ সালে বৃষ্টি ও ফসল উৎপাদন হয়েছিল। কিন্তু ১১৭৬ সালে আবার অনাবৃষ্টি। এতেই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ এক কোটি মানুষের মৃত্যু আসলে মনুষ্যত্বহীন ইংরাজ কোম্পানীর লোভাতুর ভয়ঙ্কর আকাঙ্খা আর তাদের পুতুল ও দালালরাই মজুত খাদ্য ভাণ্ডার আর মাঠের ফসল আত্মসাৎ করেছিল, সৈন্যদের আহারে যাতে টান না পড়ে তাব জন্য ইংরাজদের দৃষ্টি ছিল প্রখর। আর দৃষ্টি ছিল তাঁতীদের কাছ হতে 'অ্যাডভান্স' বা 'দাদন' বাবদ উশুল করে নেওয়া অর্থ কোম্পানীর তহবিলে ঠিকঠাক জমা করা হচ্ছে কিনা তার প্রতি। বাংলার মসলিনের ঘোষিত অবরোধ শিল্পটাকেই ধ্বংসের কিনারায় ঠেলে দিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 'কোর্ট অব ডিরেক্টরস' এর সভায় নায়েব দেওয়ান রেজা খাঁ পাঁচদফা অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত হলে ঐ ব্যক্তি নিজের অপরাধ অস্বীকার করে। দুর্নীতি, অত্যাচার, বেআইনী ব্যবসা ইত্যাদি রেজা খাঁর বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ ছিল অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

কোম্পানীর যারা কর্মচারী তারা দুর্ভিক্ষের মওকায় নিজেরা আখের গুছিয়ে নেওয়ার জন্য লাভজনক চালের ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করলো। ওদের কাছে এই সালটা ছিল সুখের বছর। এরকম স্বর্ণযুগেব বারে বারে আগমন ঘটে না। যত প্রাইভেট ব্যবসায়ী চালের ব্যবসা করতো তাদের কাছ হতে বস্তা বস্তা চাল এরাই ক্রয় করে নিত অত্যন্ত সুলভে। গোমস্তা, পাইকার থেকে কর্মচারীরা যা অন্যায় করতো তা নিয়ে কোম্পানীর কর্তারা ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন। ছিল না কোন ভ্রূক্ষেপ। যে সমস্ত নৌকা ভর্তি চাল বিভিন্ন বন্দরে গঞ্জে নোঙ্গর করতো কোম্পানীর কর্মচারীরা নামিযে ফেলতো সেই সব চালের বস্তা নৌকা থেকে। যারা ছিল ঐ পণ্যের মালিক জোরপূর্বক তাদের বাধ্য করতো গ্রহণ করতে মূল্যস্বরূপ এক টাকা ছাব্বিশ থেকে ত্রিশ সের চালের দাম। এগুলো আবার পাইকারী দরে কিনতো রেজা খাঁ। সে দাম দিত বড়জোর এক টাকায় চার সের। রেজা খাঁর খ্যাতি ছিল কেবল সাধারণের ওপর অত্যাচারে পারদর্শীতার জন্য নয়, এমন কৌশলী লোভী ব্যবসায়ীর দৃষ্টান্ত ছিল বিরল।

রেজা খাঁ ছিল নায়েব দেওয়ান। স্বভাবতঃই একপ্রকার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তাঁতীদের এবং কৃষকদের নিজেদের বয়নকার্য ও চাষবাসের কার্যে যাতে উৎসাহ দেখা না দেয় অর্থাৎ উৎপন্নকারীদের উৎপাদনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক যাতে বিনষ্ট হয় তার জন্য তার উৎসাহ ও তৎপরতা ছিল সীমাহীন। দুর্ভিক্ষ শেষ হওয়ার পরও কয়েকবছর বয়ন কার্য ও চাষবাস শিকেয় উঠেছিল। কারণ মানুষই তো নেই। সর্বত্র মহাশ্মশানের স্তব্ধতা। চরম হ্রাস পেয়েছিল জমির দাম। জমিদাররা জড়িয়ে পড়েছিল নিজের শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ-বিরোধে, জমি পতিত অবস্থায় চাষ করার লোক নেই তাঁতঘরে তাঁত আছে তাঁতী জীবিত নেই। কর্মকার কুম্ভকার জেলে ধোপা নাপিত কেউ বেঁচে নেই। দরিদ্রশ্রেণীর মানুষের চিহ্ন প্রায় সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন একদা জনবহুল জনপদগুলিতে। সামান্য সংখ্যক জীবিত হতদরিদ্র বুভুক্ষ, ছিন্নবস্ত্র পরিহিত তাঁতি, কৃষক, গ্রামীণ কারিগররা উত্তরবঙ্গে দলে দলে যোগ দিল সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহে। জমিদার, গোমস্তা, পাইকার, দারোগা, পিয়নরা পালিয়ে গেল অথবা আত্মগোপন করলো বিদ্রোহীদের ভয়ে। অত্যাচারীদের একটা বড় অংশ নিহত হয়েছিল বিদ্রোহীদের আক্রমণে ওদের অগ্নিদগ্ধ বাড়িঘড় ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল বিদ্রোহীরা। এই বিদ্রোহে আতঙ্কিত হয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী 'লোক দেখানো' কায়দায় বিচার করেছিল অত্যাচারী রেজা খাঁর। কিন্তু কোম্পানীর অন্যান্য শয়তান লোভী গোমস্তা, পাইকার দারোগা, জমিদার শ্রেণীর গায়ে কাঁটার আঁচড় দেয়নি কোম্পানীর 'কোর্ট অব ডিরেক্টরস্'। সিরাজউদ-দৌলার হত্যাকারী গোলাম হোসেনও ছিল অত্যাচারী শ্রেণীর দলের এক পাণ্ডা। গোলাম হোসেন তখন মুর্শিদাবাদ তথা বাংলার বুকে এক মূর্তিমান বিভীষিকা। গোলাম হোসেন ছিল ইংরাজদেব অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। লোক নিয়োগে ছিল তার একচেটিয়া অধিকার। ধানচালের ব্যবসায়ে সে ছিল পারদর্শী। তার কাছে ধান চালের বস্তা বিক্রী করতে আমদানীকারক বাধ্য তো, সেজন্য সে অবলম্বন করতো অত্যাচারের পথ। নিষ্ঠুরতায় সে ছিল দক্ষ, কারণ সে নবাব সিরাজ-উদ-দৌল্লার হত্যাকারী। তার দুই পার্শ্বচর মীর সুলেইমান খাঁ এবং নিয়মত উল্লা খাঁ ছিল অত্যন্ত সুদক্ষ নিষ্ঠুরতায়। এদের সাহায্যে গোলাম হোসেন দুর্ভিক্ষের বৎসরে নিজের পকেটে অর্থ সংগ্রহে সমর্থ হয়েছিল আশি লক্ষ টাকা।

❑ আড়ংগুলিতে দুর্ভিক্ষ পরবর্ত্তী ঘটনাবলী ❑

১৭৭০ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে তাঁত শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বহু সূতা কাটুনি (spinners) মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার জন্য শিল্পের বিপর্যয় ঘটে যায়। সুতার মুল্য বাংলায় শতকরা পঁচিশ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ইংরাজ বণিকরা উৎপন্ন বস্ত্রের নীট দামের বৃদ্ধি ঘটায়নি।

ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকলো তাঁতীরা। রেসিডেণ্ট কমিশনার তাঁতীদের কাছ থেকে অভিযোগ পেয়ে তদন্তের জন্য একদল গোমস্তাকে প্রেরণ করে। গোমস্তারা এসে তাঁতীর উৎপন্ন বস্ত্রের গুণকে অস্বীকার করে নিক্ষেপ করলো নিকৃষ্টের পর্যায়ে। ফলে তাঁতীর মাথায় হাত।

শূন্যহাতে আড়ং থেকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে। উৎপন্ন বস্ত্র পড়ে রইলো আড়ংএ। যারা মিড্‌লম্যান তাদের পোয়া বারো, তারা লুঠে নিল বস্ত্রের বোঝা। ঢাকার ইংরাজ রেসিডেণ্ট মিঃ কট্রেল (cottrell) যিনি ঢাকার ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দের মে মাস থেকে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী পর্যন্ত চিফ এজেণ্ট ছিলেন। জোর পূর্বক টাকা আদায় করতেন তিনি তাঁত শ্রমিকদের কাছ হতে।

ঢাকা শহরে 'চিফ' হয়ে আসেন মিঃ বারওয়েল (Barwell) ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি রেসিডেণ্ট রূপে দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেই তাঁতীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে পূর্বের রেসিডেণ্ট যেভাবে মূল্য হিসাব কষতো তার থেকে তিনি অন্ততঃ ২০% বেশি মূল্য দেবেন। তাঁতীদেরকে অবশ্য তিনি শর্ত দিলেন উৎকৃষ্টতর বস্ত্র উৎপাদন করতে হবে। তাঁতীরা শর্তপূরণ করলো কিন্তু প্রতিশ্রুতি মতো বর্ধিত মূল্য থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হলো। তাঁতীরা যখন বারওয়েলের কাছে প্রতিবাদ জানালো তাদের পিঠে সিপাই এসে বসিয়ে দিল উত্তম মধ্যম লাঠৌষধি। তাঁতীরা ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর বোর্ড অব ট্রেড এর কাছে লিখিত অভিযোগ পেশ করেছিল। বারওয়েল সাহেবকে কোম্পানী কিছু 'নির্দেশ' দিলে তিনি A, B, এবং C গুণসম্পন্ন উৎপন্ন বস্ত্রগুলিকে 'নিকৃষ্ট' চিহ্নিত করে D, E এবং F 'মার্কিং' করে দিতেন।

বারওয়েলের কার্যকলাপ কোম্পানীর 'ইনভেস্টমেণ্ট' থেকে প্রাপ্তি যোগের বৃদ্ধি ঘটালো। বারওয়েল অনবরত পেমেন্ট পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটাতো যাতে তাঁতীরা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে। শিল্পীদের উৎসাহিত করার জন্য 'প্রাইজ' দেবার কিছু পদ্ধতি মস্তিষ্ক থেকে বার করে। তার সুযোগ পেত মুষ্টিমেয় কিছু শ্রমিক। শ্রেণী হিসাবে তাঁত শ্রমিকরা পড়ে রইলো যে তিমিরে সেই তিমিরেই। শান্তিপুরের তাঁতশিল্পীরা 'বোর্ড অব ট্রেড' এর কাছে গোমস্তাদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ পেশ করে এই মর্মে যে গোমস্তরা তাদেরকে বঞ্চিত করছে প্রাপ্য ন্যায্যমূল্য থেকে। কোম্পানীর সোনামুখি এবং ঢাকা 'আড়ং' এর অধীন তাঁতিরা অভিযোগ করে যে, গোমস্তা এবং তাগাদাররা (Tagadgeers or Collectors of cloth from the aurung) দুদফায় অর্থ রোজগার করছে। কোম্পানীর হয়ে যারা বস্ত্র উৎপাদন করছে সেই সব উৎপাদকদের কাছ হতে এবং যারা প্রাইভেট বা ব্যক্তিমালিকাধীনের আওতায় কাজ করে উভয়ের কাছ থেকেই জোর পূর্বক অর্থ আদায় করছে। ঢাকার চিফ এজেন্ট জন বের ফন্দী করে 'আড়ং'য়ে 'নিজের লোক' ঢুকিয়ে দিত, তারা যে বস্ত্র উৎপন্ন করতো তার সবটাই জন বের লুণ্ঠ করতো। জন বেরের এই কাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত

হলে সে পাল্টা অভিযোগ আনলো এই মর্মে যে নিকৃষ্ট মানের 'আড়ং'গুলির তন্তুবায়ীদের সঙ্গে গোমস্তা এবং দক্ষ তাঁতীরা জোট বেঁধেছে অর্থ আত্মসাতে। আত্মসাৎ করা অর্থ ভাগ করে নিচ্ছে ওরা নিজেদের মধ্যে।

তাঁতীদেরকে বাধ্য করা হয় অগ্রিম নিতে (Forced advance) এবং উৎপন্ন বস্ত্রের কিছু বাকী রেখে আড়ংয়ে গ্রহণ করা হয়, সব সময় কোম্পানীর পক্ষে কিছু বাকী ফেলে রাখা হতো। কমার্শিয়াল রেসিডেণ্টের প্রতি এমনই নির্দেশ ছিল 'বোর্ড অব ট্রেড' এর পক্ষ থেকে। ক্ষীরপাইয়ে তাঁতীদেরকে প্রত্যেক বছরের শেষ মাসটিতেও ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য করা হতো। এক সঙ্গে দু কিস্তি ঋণও দেওয়া হতো, শিল্পীর প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক। কোম্পানীর লোক বা দারোগা প্রতিদিনই একবার অন্ততঃ তাঁতীর গৃহে উপস্থিত হতো প্রদত্ত অর্ডারের অগ্রগতির চিত্র পর্যবেক্ষণ করতে। ঢাকার তাঁত শ্রমিকরা অভিযোগ আনলো কর্মাশিয়াল রেসিডেণ্টের বিরুদ্ধে এই মর্মে যে, রেসিডেণ্ট সাহেব গোমস্তা এবং জাসেন্দার (Jassenders) এর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে চাইছে তাঁতশিল্প ধ্বংস হয়ে যাক্।

'হারিপাল (Hurripaul) ফ্যাক্টরী'র অধীন খাট্টারা (Khattorah) 'আড়ং' থেকে অভিযোগ আসে এই মর্মে যে হারিপালের রেসিডেণ্ট রবার্ট রিচার্ডসন জোর পূর্বক এবং অত্যন্ত অন্যায় ভাবে তাদের অত্যন্ত উন্নতমানের উৎপন্ন বস্ত্র বাতিল করে দিয়েছে, সম্পূর্ণ নতুন ক'রে আবার বস্ত্র উৎপন্নের আদেশ হয়েছে। এরপর প্রত্যেক তাঁতশিল্পীর গৃহের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে একজন সশস্ত্র পিয়ন। কোম্পানীর ভূমিকা সম্পর্কে বলতে হলে তাদের নক্কারজনক ভূমিকাব কথাই বারে বারে আসে। কোম্পানী যা বাকী ফেলে রাখতো সেই পরিমাণটুকু হাতিয়ার করে তাঁতশ্রমিকদের ব্ল্যাক মেইলিং এর মধ্যে ফেলে দিত এতে তাঁতীদের অবস্থার পরিবর্তন তো হতো না। কোম্পানীব অধীনে কাজ করতে অনিচ্ছুক তাঁতীকে জোরপূর্বক কাজে নামানো হতো। অজুহাত ছিল কোম্পানী তাকে যে পরিমাণ অর্থ অগ্রিম দাদন দিয়েছে তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোম্পানীকে ত্যাগ করে সে যেতে পারবেনা, '(Compelled to work)' কোম্পানীর পাওনারও আর শেষ হতো না। এমনই ভাগ্যবান ছিল তাঁতীরা যে ঢাকা শহরের বুকে তিতাবদ্যি (Teetabaddy) 'আড়ং'যেব কুঠিয়াল জন বের কৌশল অবলম্বন করলো যাতে তাঁতীরা অন্য ইউরোপীয় কোম্পানীগুলির প্রতি আকৃষ্ট না হয়। এমনকি তখন আমেরিকান কোম্পানীগুলিরও আবির্ভাব ঘটতে আবম্ভ করেছে। ইংরাজ কোম্পানী ব্যতীত অন্য কোম্পানীগুলো ইংরাজদের হাত থেকে ব্যবসা কেড়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে ইংরাজ কুঠিয়ালদেব ধার্য রেটের থেকে শতকরা কুড়ি থেকে ত্রিশটাকা মূল্যবৃদ্ধি করে মসলিন ক্রয় করতো।

জন বের সুপারফাইন মসলিনের মূল্য এক টাকা বৃদ্ধি করে দেয়। কেবল সুপার ফাইন নয়, 'ফাইন' এবং চওড়া তাঞ্জীবের প্রতি পিসের জন্য একটাকা বৃদ্ধি ধার্য করে।

এর ফলে তাঁতীদের কোন লাভ হতো না। কারণ মসলিনের উৎপাদন ব্যয় ইতিমধ্যেই বৃদ্ধি ঘটেছে। উৎপাদকরা পিস পিছু একটাকা রেটবৃদ্ধির কোন সুফল না পাওয়ায় তাদের মধ্যে সৃষ্টি হলো চরম অসন্তোষ।

কমার্শিয়াল রেসিডেণ্ট কার্যতঃ ঐ 'আড়ং'য়ের তন্তুবায়ীদের সঙ্গে প্রতারণা করে। তবে এই প্রতারণা ধরার মতো বুদ্ধি ছিল তাঁতীদের। উৎকৃষ্টমানের মসলিন প্রস্তুত করলেও রেসিডেণ্ট সমস্ত উৎপন্ন বস্ত্রকে নিকৃষ্টমানের তালিকায় তুলে দিত। প্রতিবাদ করলে অত্যাচার নেমে আসতো পিঠে, বেত্রাঘাত করতো সিপাইরা। ফলে অনেকের মৃত্যু ঘটতো।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী উপলব্ধি করলো যদি প্রতিদ্বন্দী কোম্পানীগুলোকে প্রতিহত করতে হয় তবে কতকগুলো আইনও পাশ করাতে হবে। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রথম তারা তাঁতীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু কবার অন্য আইনীপথ অবলম্বনের কথা ঘোষণা করে। 'রেগুলেশন'য়ের বেড়াজালে মসলিনের দাবীদার অন্যান্যদের পথও রুদ্ধ হয় এর ফলে। জুলাই, ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে একগুচ্ছ (অন্ততঃ একুশটা) রেগুলেশন পাশ করার পরও সন্তুষ্টি বিধান না হওয়ায় ২৩ শে জুলাই, ১৭৮৭ আবার একগুচ্ছ রেগুলেশনের কথা কোম্পানী ঘোষণা করে। এর মধ্যে সবগুলিই তাঁতীদের বিরুদ্ধে 'পেনালটি রেগুলেশন অ্যাক্ট।' কি ধরনের 'পেনালটি' ?

প্রথমতঃ, তাঁতীদের মসলিন বস্ত্র সববরাহ বা ডেলিভারীর তারিখ দেওয়া হতো। নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে আড়ংয়ে বস্ত্র ডেলিভারী দিতে না পারার কারণে পিয়ন বসিয়ে দিত তাঁতীদের বাড়ির মধ্যে আর তার যাবতীয় ব্যয় বহন করতে হতো হতশ্রী দরিদ্র তাঁতীকে।

দ্বিতীয়তঃ, তাঁতীকে ইংরাজ বণিকদের শর্ত আগে মেনে চলতে হবে। ইংরাজদের দাবী ও শর্ত পূরণ না করে অন্য কোন কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। চুক্তির খেলাপ হলে তাঁতীকে বিচারার্থে তোলা হবে কাঠগড়ায়।'তার জেল, জরিমানা অনিবার্য। এমন কি প্রাণদন্ড।

তৃতীয়তঃ, যদি তাঁতীর একটার বেশি লুম থাকে এবং নির্দিষ্ট সময়ে মাল সরবরাহ বা ডেলিভারী তার পক্ষে সম্ভব না হয় তবে তার কাজের জন্য কোম্পানীর যে 'ইনভেস্টমেন্ট' হয়েছে তার ওপর শতকরা পঁয়ত্রিশ ভাগ অতিরিক্ত চাপতো। এই বাড়তি ঋনের বা দাদনের বোঝা তাঁতীকে বহন করতে হতো অর্থাৎ 'দাদন' গ্রহণ না করলেও অঙ্কের হিসাবে তার স্কন্ধে ঋনের সেই বোঝা চাপতো। এই ধরনের নানান রেগুলেশনের ফাঁসে জড়ানো হলো হতভাগ্য তাঁতীদেরকে।

তাঁতশ্রমিকদের দুর্বল প্রতিরোধ সংগ্রাম ঃ— তাঁতশ্রমিকরা ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বণিকদের বিরুদ্ধে তেমন প্রতিরোধ সংগ্রাম সংগঠিত করতে পারেনি। তার পিছনে যথেষ্ট যুক্তি ছিল।

১) তাঁতশ্রমিকরা ছিল সম্পূর্ণ নিরক্ষর। তারা বেশীরভাগ জমি ও তাঁত কোন একটারও মালিক ছিল না। প্রকৃতপক্ষে এরা অধিকাংশই ছিল তাঁতবিহীন তাঁতশ্রমিক। এদের আর্থিক জোর কিছুই ছিল না। প্রত্যেকেই প্রায় হতদরিদ্র ছিন্নবেশধারী বুভুক্ষু শ্রমিক।

২) তাঁতশ্রমিকরা সাধারণতঃ ইংরাজ কমার্শিয়াল রেসিডেন্টের মুখাপেক্ষি ছিল। রেসিডেন্ট বা 'আড়ং'য়ের মালিকদের আদেশ অমান্য করার বিন্দুমাত্র সাহস পেতো না।

৩) তাঁতশ্রমিকদের ধারনা ছিল তাদের আন্দোলন যখন অতি সহজেই ইংরাজ কুঠিয়াল ভেঙ্গে দেবে তখন তাদের ওপর নেমে আসবে ভয়ঙ্কর অত্যাচারের খড়্গা। রেসিডেন্ট বা কুঠিয়াল প্রকাশ্যে তাঁতশ্রমিকদের ধমক দিত, মারধোর করতো নিজের হাতে।

৪) প্রতিবাদ সংগঠিত করার উদ্যোগের অভাব। কেমন ভাবে প্রতিরোধ-প্রতিবাদ সংগঠিত করতে হয় সে সম্পর্কেই শ্রমিকদের কোন ধারণা ছিল না। নেতৃত্বে অভাব ছিল প্রকট।

৫) মোগল আমলের তুলনায় ব্রিটিশ আমলে আইন-কানুন এবং বিচার ব্যবস্থা ছিল অনেক জটিল। অজ্ঞ, নিরক্ষর তাঁতশ্রমিকরা সে সবের কিছুই জানতো না। ফলে তুচ্ছ 'অপরাধে' জেল-জরিমানা শাস্তি ভোগ করতে হতো।

৬) ইংরাজ বণিক উৎপন্ন মসলিন বস্ত্রের যে মূল্য ধরে দিত, তাতে কোন শ্রমিকেরই সংসার চলতো না। অর্ডার মাফিক 'আড়ং'য়ে বস্ত্র মজুত ক'রে দিয়ে বাড়ি ফিরতে হতো কেবল সুতার মূল্যটুকু নিয়ে প্রায় শূন্য হাতে। এর ফলে হতাশা বাড়তো।

৭) ইংরাজ কোম্পানী ব্যতীত প্রাইভেট ট্রেডাররা ব্যবসা করাব তেমন অধিকার পায়নি। অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদের হঠিয়ে মসলিন-যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রন কায়েম করতে ইংরাজরা সক্ষম হয়, ইংরাজরা তাঁত শ্রমিকদের প্রকাশ্যে প্রহার করতো, হত্যা করতেও পিছপা হতো না।

৮) বাংলায় ঐসময় অন্যান্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। তেমন বিদ্রোহও সঙ্ঘটিত হয়নি।

৯) দূরে দূরে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় তাঁতীদের বসবাস ছিল। ফলে সংগঠিত হতে পারেনি।

১০) কৃষকদের সঙ্গে মিলিত বা ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ আন্দোলন সঙ্ঘটিত করার কোন প্রয়াস চালানোর মতো চেতনা তখনও সূচিত হয়নি।

১১) 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছিল।

সবশেষে ইংলণ্ডে শিল্প বিপ্লবের দরুণ এ দেশের বস্ত্র শিল্পের ইংলণ্ডে রপ্তানীও শিথিল হয়ে গেছলো। বাণিজ্যেও মন্দা নেমেছিল। এতদসত্বেও একবার শান্তিপুরের তাঁত শ্রমিকরা প্রকাশ্য বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। প্রত্যেকদিন তাঁতীরা সমবেত হতো একটা নির্দিষ্ট জায়গায়। সেখানে তাঁতীরা আলোচনা করতো নিজেদের অভিযোগ নিয়ে। 'আড়ং'য়ে কাজ করতে তারা অস্বীকার করে বসলো যদিও 'অ্যাডভ্যান্স' নেওয়া হয়ে

গেছলো। ঠিকাদাররা দেখলো 'ইনভেস্টমেন্ট' অনুযায়ী ইংরাজদের সন্তুষ্ট করা যাচ্ছেনা। তাঁতীরা প্রত্যেকদিন 'আড়ং' এর সম্মুখে সমবেত হয়ে প্রবলবিক্রমে ঘণ্টার আওয়াজ করতো। এরূপ পরিস্থিতিতে 'আড়ং' পরিচালনা প্রায় একপ্রকার অসম্ভব হয়ে উঠলো। সম্মিলিত প্রতিরোধ ভেঙ্গে দেখার জন্য এবার মরীয়া ইংরাজরা গ্রেপ্তার করে চালান করে দেয় নয়জন নেতৃস্থানীয় সংগঠককে। কয়েকজনের কাছ হতে আনুগত্যের মুচলেকা পেয়ে তাদের অবশ্য মুক্তি দেয় ইংরাজ কুঠিয়াল।

ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লবের প্রভাব ঃ— বাংলার মানুষ প্রধানতঃ কৃষিকার্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল। তাঁতের কাজে নিযুক্ত শ্রমিকরাও ছিল কৃষকের ঘরের সন্তান। কৃষির পরেই বাংলার অর্থনীতি ছিল তাঁতের ওপর নির্ভরশীল। বাংলার দশলক্ষাধিক তাঁতীর কাজ ইংলণ্ডে শিল্প বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতির চাপে অচল হয়ে পড়ার উপক্রম হলো। ইংলণ্ডে মূলধনের কোন অভাব ছিল না। ইংলণ্ডের 'ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড' ছিল ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রধান ভরসা বা অ্যাডভান্সের যোগানদার।

১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে থেকে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে পর্যন্ত ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লবের একটি পর্যায়। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের অর্থ ১১৭৬ বঙ্গাব্দ। বাংলায় তখন মন্বন্তরের জন্য মড়ক লেগেছে। দেশ জুড়ে চলেছে উপনিবেশবাদের উত্থানের যুগ। বাংলায় শিল্প বলতে হস্ত চালিত তাঁতশিল্প। সেখানে ইংলণ্ডে চলেছে শিল্প বিপ্লবের যুগ। একের পর এক যন্ত্রের আবিষ্কার, বিজ্ঞানের নানাবিধ অবিষ্কার। নানাবিধ ঔষধের আবিষ্কার, মুদ্রন যন্ত্র থেকে ষ্টীম ইঞ্জিন ; ষ্টীমইঞ্জিন থেকে রেলইঞ্জিন, পাওয়ার লুম, কটন মিল ইত্যাদির আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠার যুগ।

ইংলণ্ডে প্রাক শিল্পবিপ্লব যুগে ভারতবর্ষের শিল্প বলতে তখন একমাত্র বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার হস্তচালিত বস্ত্র শিল্প বা মসলিন বস্ত্রশিল্পকেই বোঝাত। ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব যুগে উৎপন্ন বস্ত্র ভারতীয় বস্ত্রের মূল্যের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সস্তা হওয়ায় এবং বিপুল পরিমাণ বস্ত্রসম্ভার উৎপন্ন হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় ভারতীয় মসলিনই ইংলণ্ডের বাজারে অপাঙক্তেয় পর্যায়ে নিক্ষিপ্ত হলো। শুরু হলো বাংলার 'মসলিন ধ্বংসের জন্য একপ্রকার 'মসলিন' যুদ্ধ"। আর সেই অসমান যুদ্ধে পরাধীন দেশের হস্তশিল্প তা যত নিপুণই হক না কেন তার 'অভিভাবক' দেশটির যন্ত্রে উৎপাদিত বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাস্ত হতে বাধ্য হলো।

ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব যুগে ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদ সাধন করা হয়। ভারতে তখন তা পাকাপোক্ত। ইংলণ্ডে সৃষ্টি হলো সর্বহারা শ্রেণী বা শ্রমিকশ্রেণীর শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং তা প্রতিষ্ঠার পর শ্রমিক সহজলভ্য হলো। এদেশে থেকেও অনেক ভূমিদাসকে ইংলণ্ডে চালান দেওয়া হলো। ইংলণ্ডে পাশাপাশি চালু হলো 'ফ্যাক্টরী অ্যাক্ট' সহ শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার্থে নানান রক্ষা কবচ। ভারতীয়দের ক্ষেত্রে ঠিক বিপরীত। ইংলণ্ডের ভারতীয় সামন্তশ্রেণী পুঁজিপতিদের সঙ্গে এদেশের বুকে গাঁটছড়া বাঁধলো নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য।

ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যের সূর্য কখনও অস্ত যেতো না। ফ্রান্সের নেপোলিয়নের সঙ্গে ব্রিটেনের দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয়ের ফলে বিভিন্ন উপনিবেশে তাদের ব্যবসা ইংরাজদের দখলে চলে গেল। নিজ দেশের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধনার্থ ব্রিটেনে চালু হয়েছিল ব্রিটিশ বাণিজ্য মূলধন বা 'মার্কেন্টাইল ক্যাপিটাল'। ইংলণ্ডে 'ব্যাংক অব ইংলণ্ড' শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের বাণিজ্য মূলধনের যোগান দেওয়ায় ইংলণ্ডে শিল্পস্থাপনের কাজ সহজতর হয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় উপনিবেশভুক্ত দেশগুলিতে লুঠের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা। ইংলণ্ডে বস্ত্রশিল্পের প্রচণ্ড গতিতে প্রসার হতে থাকায় ভারতীয় মসলিন বস্ত্র ইংলণ্ডে আমদানীর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী হয়েছিল। ভারতের যে বস্ত্রশিল্প ছিল অন্তর্বাণিজ্যে ও বহির্বাণিজ্যের প্রধান উপকরণ তখন তাকে বিপর্যস্ত করার নীতি অবলম্বন ইংলণ্ডের পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার অবশেষে পার্লামেন্টে আইন পাশ করে ভারতে ব্রিটিশ পুঁজি বিনিয়োগের সবপথ উন্মুক্ত করে দেয়। এর ফলে এদেশের হতশ্রী দরিদ্র জনসাধারণকে শোষণ করার বিশ্বায়নের নতুন পথটি ভালভাবে খুলে যায়।

ইংলণ্ড বাংলার সিল্ক ব্যবসায় দখলদারী কায়েম করেছিল ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার 'দেওয়ানি' দখল করে। কিন্তু ১৭৭০-৭১ খ্রীষ্টাব্দের বাংলার এক তৃতীয়াংশ মন্বন্তরে প্রাণত্যাগ করলে পরবর্তী কয়েকটি বছরে ওদের ব্যবসায়ে মন্দগতি দেখা দেয়। যার জন্য নিজেরা কিছু কিছু 'আড়ং' প্রাইভেটে অন্যান্য কোম্পানীর হাতে ছেড়ে দেয়। এরপর ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড শিল্পবিপ্লবের যুগে আবার রেগুলেশন পাশ করে। কাঁচা রেশম সুতা বা সিল্ক প্রেরনের একচেটিয়া অধিকার ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতেই চলে যায়। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে কাঁচা রেশম (raw silk) রপ্তানীর মোট মূল্য ছিল তৎকালীন বাজারমূল্যে ঊনত্রিশ লক্ষ টাকারও বেশি। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজদের সিল্ক ব্যবসায়ের মন্দা থেকে মৃত্যু ঘটে।

ইউরোপে ফরাসী বিপ্লব শুরু হওয়ার জন্য অবশ্য কোম্পানীর বাংলাপ্রদেশে কাঁচা মাল রপ্তানীর পরিমাণ কিছু হ্রাস পায়। গ্রেট ব্রিটেনের কাছে নেপোলিয়ান পরাস্ত হলেও প্রথমদিকে ইংলণ্ডে সিল্কবস্ত্রের কাঁচামাল প্রেরণের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা ছিল। ফলে বাংলার সিল্ক বা ইটালিয়ন সিল্ক লণ্ডনে প্রবেশ করতে পারতো না। আবার ঠিক বিপরীত কারণে ইংলণ্ডের বাজারে বাংলার মসলিনের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলার কোম্পানীর এজেন্টরা তাঁতীদের ওপর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বেপরোয়া অত্যাচার আবার শুরু করলো। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার বিভিন্ন আড়ংয়ে ইংরাজ, ওলন্দাজ এবং ফরাসীরা পৃথক পৃথক ভাবে তাঁতীদের দিয়ে যে পরিমাণ মসলিন উৎপাদন করিয়েছে তার মোট মূল্য এককোটী টাকাকেও অতিক্রম করে ছিল।

মসলিন যুদ্ধের অন্তিম পর্যায়ে ঃ— ঢাকাই মসলিন শেষপর্যন্ত সম্পূর্ণ মুখ থুবড়ে পড়লো কয়েকবছরের মধ্যেই। ব্রিটিশ সুতিবস্ত্র যন্ত্রে উৎপাদিত হওয়ার কারণে একদিকে

সংখ্যার দিক থেকে, অপর দিকে গুণমানে প্রচুর কদরলাভ করে। পাশাপাশি বাংলা থেকে আমদানী খরচ না থাকায় এবং ইংলণ্ডে প্রস্তুত বস্ত্রাদি স্থানীয় বাজারে ঢাকা মসলিনের থেকে অনেক কমমূল্যে বিক্রি হতে থাকায় তদুপরি ল্যাঙ্কাশায়ার, ম্যাঞ্চেষ্টার প্রভৃতি শহরের বস্ত্রশিল্পের মিলগুলি জীবন্ত রাখার তাগিদে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজরা ঢাকাই মসলিনের ওপর একচেটিয়া কায়েমী স্বত্ব বজায় রাখতে পেরেছিল। ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের বস্ত্রসম্ভারের মূল্য ইংলণ্ডে দারুণভাবে হ্রাস পায় সে প্রসঙ্গে ইংরাজলেখক গ্যার্ডগিল লিখেছিলেন "In the matter of quality, the Indian weavers could easily hold his own against the British weavers, but in the matter of price, he was hopelessly beaten by the machine-made goods".

(Ref. Cotton Weavers in Bengal by Dr. D. B. Mitra, P. 189)

অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তিম লগ্নে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় ব্রিটিশ বস্ত্র উৎপাদকদের নৈপুণ্য ভারতীয় শিল্পীদের থেকে বৃদ্ধি পায় তার মূলকারণই ছিল একপক্ষ যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন করে এবং অপরপক্ষ হস্তচালিত তাঁতে উৎপাদন করে। ভারতবর্ষের শাসকশ্রেণীও বাংলার তাঁতশিল্পীদের নৈপুণ্যবৃদ্ধির কোন প্রচেষ্টাই করেনি। কেবল শোষন, অত্যাচার আর মুনাফার লোভেই পরাঙ্গম থেকেছে।

ইংলণ্ডের বাজারে বাংলার মসলিন রপ্তানী রুদ্ধ করার জন্য তো বটেই। বাংলার মসলিন সমস্ত অভিজাতশ্রেণীর মানুষজন যেমন মোগল বাদশাহ, বাংলার ও অযোধ্যার নবাব প্রভৃতিদের অন্দরমহলে বিপুলভাবে আদরণীয়ও ব্যবহার্য্য বস্তু রূপে পরিগণিত হতো। বাদশাহী ও নবাবী আমল যখন পরিসমাপ্তির যুগে তখন গৌরবান্বিত মসলিনের বিক্রয়ে অনিচ্ছুক ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 'বোর্ড অব ট্রেড' এর কাছে ।

তাঁত শ্রমিকদের অভিযোগ এলো কোম্পানীর দুইজন এজেন্ট মিঃ দে মি. বিক্রম ঠাকুরের বিরুদ্ধে। ঢাকার কমার্শিয়াল রেসিডেণ্ট তখন ইংরাজ প্রতিনিধি মিঃ বারওয়েল। তাঁরই নিয়োগ করা ঐ দুই এজেন্ট হঠাৎ কোম্পানীর অন্যান্য দালাল (Dellols) এবং পাইকার (Pycars) দের বাতিল করে কোম্পানী প্রদত্ত যাবতীয় তাঁতীদেরকে দেয় অ্যাডভান্সের টাকা নিজেদের দুজনের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়। ঐ দুইজন এজেন্টের পূর্বের এজেন্টের নাম ছিল মিঃ কার্টার। এজেন্ট দে এবং ঠাকুর ঢাকার তাঁতীদেরকে তাদের কুঠিতে ডেকে এনে হুকুম করে এখন থেকে তাদের (দে এবং ঠাকুর) কে উৎপন্ন বস্ত্র (মসলিন) সরবরাহ করতে হবে এবং কার্টারের কাছ তারা যে কোয়ালিটির মাল সরবরাহ করতো সেই কোয়ালিটির মাল দিতে হবে! এর জন্য অবশ্য তাদের অ্যাডভান্স শতকরা কুড়ি ভাগ করা হবে! তাঁতীরা প্রত্যুত্তরে জানায় যে মিঃ কার্টারের কাছে গতবৎসর দাদন অগ্রিমের পরিমাণ শতকরা পঁচিশ ভাগ এমনিতেই ছিল। কিন্তু মিঃ দে এবং মিঃ

ঠাকুর সোজাসুজি ঐ দাবী নাকচ করে শতকরা কুড়ি ভাগ বৃদ্ধির বেশী 'অ্যাডভান্স' দেওয়া সম্ভব নয় জানিয়ে দেয়। কারণস্বরূপ তারা উভয়ে দুর্ভিক্ষের কথা এবং দুর্ভিক্ষের মৃত্যুর ফলে তাঁত শিল্পের মন্দার কথা উল্লেখ করে। তাঁতীরা উক্ত উভয় এজেন্টদের তিক্ততা পূর্ণ বিতর্কে ভীত হয়ে পলায়ন করে। এরপরের ঘটনা মারাত্মক।

উক্ত এজেন্টদ্বয় তাঁতীদের বাড়িতে বাড়িতে পিয়ন পাঠিয়ে সকলকে ধরে আনে এবং হুকুম করে যে, গতবৎসরের মানেই তাদের মাল দিতে হবে এবং 'অ্যাডভান্স' হবে খরচের শতকরা কুড়ি ভাগ। আর পণ্যের ওপর মার্কা দিতে হবে যথাক্রমে A. B. এবং C এইভাবে। অগত্যা ঐ পরিমাণ অর্থ তাঁতশিল্পীরা আগাম দাদন স্বরূপ গ্রহণ করে। কিন্তু এর অব্যবহিত পরেই ঐ দুই এজেন্ট মিঃ দে এবং মিঃ ঠাকুর তাঁতীদের নিজস্ব হেফাজতে অন্য এজেন্টদের অন্য যে উৎপন্ন বস্ত্র মজুত ছিল তাই তারা ছিনিয়ে নেয় আর একটাকা মূল্যের বিনিময়ে আট আনা থেকে দশ আনা দাম ধরে দেয়। তাঁতীরা এই অর্থ গ্রহণে অস্বীকার করলে এজেন্টরা তাঁতীদের বাড়ির দ্বারে পিয়ন বসিয়ে দেয় এবং তারা যা দিচ্ছে তা গ্রহণে বাধ্য করে এবং রসিদও আদায় করে নিয়ে যায়। তাঁতীদেরকে হুমকী দেওয়া হয় তারা এর পর থেকে অন্য কোন এজেন্টের অর্ডার ধরতে পারবে না। তাঁতীদেরকে বাধ্য করা হয়েছিল ঐ প্রস্তাব মেনে নিতে।

অগত্যা তাঁতীরা হুকুম মতো বয়ন কার্যে লিপ্ত হয় এবং সর্বোচ্চ গুণসম্পন্ন বস্ত্র ঐ দুই এজেন্টের কাছে সরবরাহ করে আবেদন করে যে, তাদের সরবরাহ কৃত পণ্যের ওপর যেন 'A' মার্কা দেওয়া হয়। এজেন্টরা তাঁতীদের আবেদন নাকচ করে তাদের পণ্যের ওপর মার্কা দেওয়া হয় ছয় নম্বরে। তাঁতীরা এজেন্টদের ঐ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে সকলকে ঘাড় ধরে 'আড়ং' থেকে বার করে দেওয়া হয়।

এইরূপ অভিযোগের নথি কলকাতায় কলেজ ষ্ট্রীটে অবস্থিত পশ্চিমবাংলা সরকারের আর্কাইভসে সন্ধান করলেই পাওয়া যাবে।

শিল্পীদের লিখিত অভিযোগ ঃ-মসলিন শিল্পী শ্রমিকদের শ্রমের প্রকৃত মূল্যের পর কিভাবে উদ্বৃত্ত মূল্যের সৃষ্টি হয় এবং সেই উদ্বৃত্ত মূল্য কোম্পানীর এজেন্টরা সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করতো তাই নয় সামান্যতম হেরফের হলে শ্রমিকদের অদৃষ্টে কিরূপ লাঞ্ছনা জুটতো তার কিছু উদাহরণ আমরা তুলে ধরছি। কোম্পানীর কাছে উপরোক্ত অত্যাচারের বিবরণ—

১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসের কথা। ঢাকার শিল্পীরা কোম্পানীর কাছে উপরোক্ত অত্যাচারের বিবরণ লিখিত অভিযোগ আকারে পেশ করে জানায় যে ঐ দুই এজেন্ট

কোম্পানী প্রদত্ত 'অ্যাডভান্স' এর টাকা আত্মসাৎ করেছে তো বটেই তাদের (তাঁতদের) উৎপন্ন বস্ত্রের দাম একটাকা হলে বিনিময়ে দেওয়া হয় দশ আনা থেকে বারো আনা এবং তাঁতীদেরকে বলা হয় ইচ্ছা হলে তারা এই অর্থ গ্রহণ করতে পারে (appendix no. 2) দ্বিতীয় ঘটনা, ঐ বৎসরের একই সময়ে ঢাকা ফ্যাক্টরীর অধীন সোনারগাঁও এর শিল্পীরা 'বোর্ড' অব ট্রেড' এর কাছে অভিযোগ করে যে ১১৮১ (বঙ্গাব্দ) সালে মিঃ বারওয়েল বিভিন্ন দালাল এবং এজেন্ট মিঃ দে কে বাতিল করে ফ্যাকটারীর দায়িত্ব গ্রহণ করার পর নিজ দেওয়ান নারায়ন দাস সমভিব্যাহারে উপস্থিত হয় সোনারগাঁওয়ে। তাঁতীদেরকে হুকুম করে মিঃ কার্টারকে যে গুণসম্পন্ন বস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছিল তা বজায় রাখতে হবে এবং 'অ্যাডভান্স' স্বরূপ কার্টারের কাছ হতে তাঁতীরা যা পেয়েছিল তার ওপর আরও শতকরা কুড়ি ভাগ অধিক 'দাদন' দেওয়া হবে। প্রত্যুত্তরে তাঁতীরা জানায় গতবৎসর এজেন্ট মিঃ গ্রুয়েবার তাদেরকে প্রতি একশত টাকায় পঁচিশ টাকা বেশি দিয়েছিল উপযুক্ত মানের পণ্য সরবরাহের জন্য। কিন্তু মিঃ গ্রুয়েবারের প্রস্তাবে সোনার গাঁওয়ের তন্তুবায়ীরা এক কথায় সায় দিতে পারেনি, কারণ ইতিমধ্যেই 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে' অনেক তাঁতীর জীবন বিশেষতঃ সুতাকাটুনির জীবন ছিনিয়ে নিয়েছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বিভিন্ন প্রয়োজনীয় মাল মশলার মূল্যবৃদ্ধি। এরপর 'আড়ং'য়ে প্রবেশ ঘটলো স্বয়ং এজেন্ট মিঃ দে'র। সে তন্তুবায়ীদের নির্দেশ দেয় গতবারের A,. B, ও C মার্কা এবং প্রথম তিন গুণসম্পন্নের তুলনায় আরও অধিক উন্নত বৈশিষ্ট্য ও মান সম্পন্ন বস্ত্র সরবরাহ করতে এবং এর জন্য তাদেরকে শতকরা কুড়ি ভাগ বেশি মূল্য দেওয়া হবে গতবছরের তুলনায়। এরপর ঐ এজেন্ট তন্তুবায়ীদের 'অ্যাডভান্স' নিতে বাধ্য করে শুধু তাই নয় প্রত্যেক রেজিষ্টার্ড তন্তুবায়ীর কাছ হতে অন্য এজেন্টকে উৎপন্ন বস্ত্র সরবরাহ করা থেকে বিরত করার জন্য মুচলেকায় স্বাক্ষর করিয়ে নেয়।

এরপরের ঘটনায় তন্তুবায়ীরা চরম অপমানিত হয়। ঐ এজেন্ট সোনার গাঁওয়ে প্রবেশ করে। প্রত্যেকটি মসলিন পরীক্ষা করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার। নির্দিষ্ট এবং অভিপ্রায় অনুসারে বস্ত্র প্রস্তুত করা হয়নি সে এই অভিযোগ করে। আর সেই ইচ্ছাকৃত এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত অভিযোগের ভিত্তিতে বস্ত্রের গুণ চিহ্নিতকরণের সময় ধরিয়ে দেয়, D, E ও F চিহ্নগুলি ; অর্থাৎ বস্ত্র 'উৎকৃষ্টতম' নয়। প্রতিটি বস্ত্রের মূল্য আনুপাতিক হারে ঐ এজেন্ট হ্রাস করে দেয়। এতে তাঁতশ্রমিকদের যে বিপুল ক্ষতির মুখোমুখি হতে হয় তা সীমাহীন। আর এই ক্ষতির বিষয় উত্থাপন করার কারণে এজেন্ট প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে সিপাই ডেকে প্রত্যেক শ্রমিককে বেদম প্রহারে জর্জরিত করে। তারপর একেবারে শূন্য হাতে আহত রক্তাক্ত শ্রমিকদের 'আড়ং' থেকে টেনে বার করে দেওয়া হয় (Appendix no. 3A)

তৃতীয় ঘটনা-এরপর আরেকটি ঘটনা 'বোর্ড অব ট্রেড (কমার্শিয়াল) 'এর নজরে আনা হয়। ঘটনাটি শান্তিপুরের তন্তুবায়ীরা (Sundry weavers) অভিযোগ আকারে পেশ করে।

ঘটনার সময়কাল ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস। শান্তিপুর আড়ংয়ের ইংরাজ এজেন্ট মিঃ বেব এবং আড়ংয়ের ম্যানেজার মিঃ বাউল্যাণ্ড। ম্যানেজার ছাড়াও আড়ংয়ে আছে কিশোর স্যাণ্ডেল নামে এক অত্যাচারী গোমস্তা, দালাল ভৃত্য ইত্যাদি। অভিযোগটি এক বৎসর পূর্বের। ১৭৮৪-৮৫ সালে আড়ংয়ের ম্যানেজার তাঁতীদেরকে চুক্তির জালে জড়িয়ে ফেলে। শান্তিপুরের তাঁতীরা যে সুপারফাইন বস্ত্র প্রস্তুত করে, ম্যানেজার এবং দালালরা তার নিন্দা করলো হলো 'সুপারফাইন' তো নয়ই, উল্টে 'ফাইন' বা জরিমানা তারপব দালালের দালালরা সেই মজুতকে নিকৃষ্টমানের তালিকাভুক্ত করে দেয়। ম্যানেজার শিল্পীদের কঠোর পরিশ্রমে উৎপন্ন যাবতীয় বস্ত্রকে 'ওলন্দাজদের নিমিত্ত' বা অতি সাধারণ মানে চিহ্নিত করে মূল্য হ্রাসের হুকুম করে। 'নযনসুখ' মসলিনের জন্য শিল্পীরা 'অ্যাডভান্স' পেয়েছিল সেইমতো তারা 'নয়নসুখ' মসলিন বস্ত্র প্রস্তুত এবং ডেলিভারী দিলেও ম্যানেজারের দৃষ্টিতে বস্ত্রের ঐগুণ ছিল না। বড়জোর ডাচেরা ঐ বস্ত্রগ্রহণ করতে পাবে এই ছিল তাদের অভিমত। কাজেই বস্ত্রের উচিত মূল্যের পরিবর্তে শিল্পীদের প্রাপ্তিযোগ অনেক কম হবে। এই মর্মে ম্যানেজার এবং এজেন্টের হুকুম জারী হয। তাঁতীরা অভিযোগ জানায় যে, সুতার অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং এজেন্ট ও ম্যানেজারের কুমতলবে তাদের দুরাবস্থা চরমে। যা প্রকৃত অবস্থা, তাতে জীবন ধারনের জন্য তাদের ঘটিবাটী বিক্রয় কবতে হচ্ছে। এজেন্ট, গোমস্তা আর তাদের দালাল ভৃত্যদের যাতে পরিবর্তন করা হয় তাব জন্য শিল্পীরা আবেদন জানায়। শিল্পী-শ্রমিকরা প্রস্তাব করে যেন এমন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদেরই 'আড়ং'যের ভারার্পণ করা হয় যাদের 'সুন্দর' সম্পর্কে জ্ঞান আছে। শ্রমিকরা এও প্রস্তাব করে যে, যদি দেখা যায় সত্যই গুণগতমান কিছু খারাপ আছে তবে তারা ফেরৎ নিতেও রাজি আছে (Appendix No 3B)

৪র্থ ঘটনা-নদীয়ার শান্তিপুরের তাঁতশ্রমিকরা আবেদন নিবেদনের ভাষাতেই তাদের দুরাবস্থার কথা কোম্পানীকে জ্ঞাত করায়। কর্তৃপক্ষ যদি তাদের অভিযোগের কোন প্রতিকার না করে তবে তারা বাঁচতে পারবে না এমন কথা লিখিত আকারে বিবৃত করে উপসংহারে নিজেরা যে কিরূপ দরিদ্র তার সবিনয় উল্লেখ করে—"We are poor people we await your orders" যে তাঁতীরা ও তাঁত শিল্প শতাব্দীর শেষে যখন ধ্বংসের মুখে তখনও ক্ষোভের প্রকাশ ঘটে আবেদন-নিবেদনের মধ্যই দিয়েই। ধ্বংসের কিনারা থেকে তাঁতশিল্পকে তুলে আনার কেউ ছিল না। বিদ্রোহের সামান্য প্রচেষ্টাও গড়ে ওঠেনি, সমস্ত প্রতিবাদেব ভাষা মূর্ত হয়ে ওঠে আবদনপত্রের মধ্যে। বিদ্রোহের পরিস্থিতি কেন গড়ে ওঠেনি তার কারণসমূহের মধ্যে কয়েকটি ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

৫ম ঘটনা-বাঁকুড়ার সোনামুখির সন্নিকটে মোহনপুর (Mohunpore), দুর্গাপুর (Durgapore), রামচন্দ্রপুর (Ramchunderpore) এবং মুরকার (Maurker)

মোকামের তাঁতশিল্পীরা ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে 'বোর্ড অব ট্রেড' এর নিকট তাদের করুণ অবস্থার কথা পিটিশনের মাধ্যমে পেশ করে। সুরুল (Sorool) কুঠির কর্তাদের অত্যাচাবের অনুপুঙ্খ বিবরণ ছড়িয়ে আছে পিটিশনের পৃষ্ঠায়। (প্রসিডিংস নম্বর ৪৬, ভলঃ ৯৩)।

প্রথমতঃ সুরুল কুঠির নায়েবগোমস্তারা পিযন-দারোগাদের হুকুম করে তাঁতশিল্পীদের প্রহার করার জন্য। তাঁতীরা এতে প্রচণ্ড অপমানিত বোধ করে-কুঠিতে যেতে বাধ্য না হলে কেউ বোধ হয় কুঠির ছায়া মাড়তো না।

দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন ফ্যাক্টরীতে তাগুংডার (Taggudgars) (বা তাগাদাদাব) নিয়োগ করাই শুধু নয় তাঁতশিল্পীদের প্রত্যেকের বাড়িতে পিয়ন বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে আর সেই পিয়নের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতে হচ্ছে, থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে দীনহীন হতশ্রী তাঁতশিল্পীকে। কোম্পানী কর্তৃক তাদের অর্থাৎ তাঁতশিল্পীদের উৎপন্ন বস্ত্রের জন্য যে বিনিময় মূল্য ধার্য আছে তার থেকে পিয়নের ব্যয়ভার বহন করলে প্রত্যেকের সমূহ ক্ষতি অনিবার্য।

তৃতীয়তঃ কোম্পানীর কাছে গুণসম্পন্ন বস্ত্র সববরাহ করলেও তা গ্রহণে অস্বীকার করাব জন্য ফেরৎ আসে। এখন তাঁতীদের প্রায়ঃশই নগদমূল্যের ব্যবস্থা কবা হয়েছে, কোন 'অগ্রিম' (বা advance) এর ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। 'অ্যাডভান্স' বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এবং উৎপন্ন বস্ত্র ঘনঘন ফেরৎ দেওয়ায় শিল্পীদের বেঁচে থাকাটাই অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

চতুর্থতঃ যে সমস্ত তাঁতশিল্পীর পক্ষে আর বয়নকার্যে লিপ্ত থাকা অসম্ভব তাদেরকেও জোর করে 'অ্যাডভান্স' নিতে বাধ্য করা হচ্ছে। এর ফলে ঐ তাঁতশিল্পীদের বাঁচবার জন্য বস্ত্র কিনে কোম্পানীর কাছে জমা দিতে হচ্ছে। দরিদ্র তাঁতশিল্পীদের পক্ষে এর ফলে টিকে থাকাই প্রায় অসম্ভব।

পঞ্চমতঃ তাঁতশিল্পীরা অভিযোগ করছে এই মর্মে যে, পূর্বে কোম্পানীব যাবতীয় কাপড় ধোয়ার কাজ হতো 'দিনাগুর' (Dinagur) কুঠিতে এখন আবার আদেশ হয়েছে 'সুরুল' কুঠিতে বস্ত্র ধোয়ার যাবতীয় কাজ হবে, দিনাগুর কুঠি থেকে নয়া সুরল কুঠিতে যেতে হলে তিন চারটি নদী পার হতে হয়। সমস্ত বস্ত্র দিনাগুর থেকে সুরুল কুঠিতে পাঠান হয় বলদ গাড়িতে। নদী পার হতে অনেক বস্ত্র বাণ্ডিল নদীর জলেই সিক্ত হয়। কোম্পানী সেসব বস্ত্র গ্রহণে অস্বীকার করে। ফলে শিল্পীদের বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। বর্ষাকালে পরিস্থিতি আরও চরমে উঠে। বস্ত্রের কোনখানে কাদার সামান্য দাগ দেখা গেলে বস্ত্র পিছু এক টাকা জরিমানা ধার্য অনিবার্য। এই ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন যাতে হতে না হয় তার জন্য কোম্পানী যাতে তাদের পূর্বের কুঠিতে বস্ত্র ধোয়ার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে তার জন্য তাঁতীরা আবেদন নিবেদন করে।

ষষ্ঠতঃ তাঁতশিল্পীরা অভিযোগ করে যে, কলকাতাস্থিত 'বোর্ড অব ট্রেড' এর কাছ হতে তারা এক হুকুমনামা নিয়ে এসেছে যাতে উল্লেখ আছে যে যদি কোন তাঁতী আর

তাঁত বুনতে না পারে তার ওপর যেন জোর খাটানো না হয়। যারা কোম্পানীর হয়ে কাজ করবে তারা স্বেচ্ছায় করবে, সেই 'হুকুমনামা' কুঠিতে জমা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা সত্বেও অক্ষম তাঁত শ্রমিককে 'অ্যাডভান্স' গ্রহণে বাধ্য করা হচ্ছে আর তা গ্রহণে অস্বীকার করলে গ্রেপ্তার আর প্রচণ্ড প্রহার। পত্রের শেষে উল্লেখ করা হচ্ছে—"We are poor artificiers and are labouring under this injustice. You are the master of the country and we humbly legs for redress that we may be able to remain in security. This is our request."

Signed Godadhur Dutt, Nayan Das, Neeta Kar, Manick Naik, Khanoo Sook, Roggnaut Doss. হরিপালের (Haripaul) এর আড়ং থেকে তাঁতশ্রমিকদের অভিযোগ পেয়ে কোম্পানীর 'বোর্ড অব ট্রেড' (কমার্শিয়াল) এর ২৯শে নভেম্বর, ১৭৯১ খ্রীঃ বৈঠকে পেশকরা হয় (প্রসিডিংস নং ৮০, ভল্যুমঃ ৯৫ (3D)

৬ষ্ঠ ঘটনা-হরিপাল 'আড়ং'য়ের তন্তুবায়ীরা অভিযোগ করে যে, তাদের উৎপন্নবস্ত্র ইতিপূর্বে তাদের সম্মুখেই ওজন করা হতো। ওজন যদি সামান্যতম কম থাকতো, আনুপাতিক বস্ত্রের মূল্যও হ্রাস পেতো শিল্পীরা দাম কম পেতো। ফেরতযোগ্য বস্ত্রসম্ভার সম্পূর্ণ ফেরৎ দেওয়া হতো না।

তন্তুবায়ীরা অভিযোগ করে যে, জনৈক দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (Debnath Bundapauda) যে বস্ত্র ওজন করে সে একজন ঘুষখোর। ঐ ব্যক্তি তাঁতীদের অনুপস্থিতিতে 'গোল্ড হেড' (Gold head) কাপড়ের পিসে ওজন কম দেখায়। টমাস ফিলপেট প্রথম ধোয়ার আগে ওজন করে এবং ওজনও সঠিক দেখা যায়। কিন্তু দেবনাথের বেলায় ওজন কম হয়। প্রথম ধোয়ার পর টমাস 'ওজনে কম হয়েছে' এই অজুহাতে বস্ত্রগ্রহণে অস্বীকার করে। যদিও বা ছয়-সাতশত পিস বস্ত্র সে গ্রহণ করে এবং ঐ সমস্ত কাপড়ের চারটি কোণ ইচ্ছাকৃত ভাবে কেটে দেয় যাতে বাজারে বিক্রী হতে না পারে। গৃহীত ঐ বস্ত্র সম্ভারের মূল্যও বাজারের অন্যান্য স্থানে যা মূল্য তার থেকে সে কম ধার্য করে।

যাদের বস্ত্রগুলির এমন হাল করেছিল গোমস্তরা, সেই সমস্ত তাঁত শিল্পীকে তাদের ফ্যাক্টরীতে আটক রাখা হয় দুদিন যাবৎ। ঐ দিনগুলিতে তাদের বাধ্য করা হয় নিজেদের ষ্টকে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে। দুদিন বন্দী তাঁতীরা অন্নজল গ্রহণ করতে পায় নি। একেবারে নিরম্বু উপবাস বলতে যা বোঝায়। দুদিন পরে আড়ংয়ে এসে উপস্থিত টমাস ফিলপেট। এসেই সে প্রত্যেক তাঁতীকে পিলারে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলতে হুকুম দেয় তারপর প্রত্যেককে চাবুক দিয়ে কুড়ি ঘা প্রাপ্য হিসাবে প্রহার করা হয়। পিয়নদের ওপর নির্দেশজারী হয় তাঁতীদের জমা রাখা বস্ত্রগুলোর মধ্যে যেগুলি উন্নত মানের সেগুলিকেও নিকৃষ্টমানের জঞ্জালে ফেলে দিতে। পিয়নরা তাই করে অর্থাৎ যে সব বস্ত্র রিজেকটেড বা বাতিল হয়েছে তার স্তূপে নিক্ষেপ করলো উৎকৃষ্ট বিবেচিত বস্ত্রসম্ভার। (3E)

৭ম ঘটনা-ঢাকা ফ্যাক্টরীর অধীন তাঁতীরা কমার্শিয়াল এজেন্ট টেলরের বিরুদ্ধে কলকাতায় 'বোর্ড অব ট্রেড (কমার্শিয়াল)' এর নিকট লিখিত অভিযোগ জানায় ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাসে। টেলর ঢাকা রেসিডেন্সীতে থাকাকালীন তাঁতিদের জব্দ করার জন্য A, B, এবং C মার্কা বস্ত্রগুলিকে ইচ্ছাকৃত ভাবে নিকৃষ্ট D তালিকায় ঢুকিয়ে দেয়। তাঁতীরা যখন প্রতিবাদ করে তখন বস্ত্রের দাম কমে যায় ভীষণ তাড়াতাড়ি। মার্কা দেওয়ার সময় নীচে নামতে নামতে সাত-আট নম্বরে নামিয়ে দেয়। বস্ত্রের ন্যায্য মূল্যও অনেক নীচে নেমে যায়। এই ভাবে তাঁতীদের পাওনায় টান পড়ে। আড়ংয়ের কাছে বহু অর্থ বাকী পড়ে থাকে। টেলরের এই কাজে সহায়তা করতো জাসেন্দার এবং গোমস্তারা। এইতেই শেষ নয়। টেলর হঠাৎ দশ পনেরো জন বাছাই করা তাঁতীর বিরুদ্ধে মামলা ঠোকে দেওয়ানি আদালতে। আদালতের হুকুমে ঐ তাঁতীরা বাধ্য হয় কারাগারবাসে।

কিস্তিবন্দী তাঁতীরা কোন একটি কিস্তি মেটাতে কোন সঙ্গত কারণে ব্যর্থ হলেই তার ওপব নেমে আসে জরিমানা। টেলর দাবী কবে বসে শতকরা পঁয়ত্রিশ ভাগ অতিরিক্ত লাভ এবং শতকরা একভাগ সুদ। তাঁতীরা এসবের প্রতিবাদ করে বর্ধিত অর্থের দাবী পরিত্যাগ করার আবেদন জানালে টেলর তা খারিজ করে অবিলম্বে বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার হুকুম করে এবং প্রত্যেক তাঁতীকে প্রবল বিক্রমে প্রহার করতে থাকে। ঢাকার তাঁতীরা তাদেরকে সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ইংরাজ কোম্পানীর নিকট উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন করেছিল কার্যতঃ তা বিফলে পরিণত হয়। আবেদনকারীদের স্বাক্ষরের নীচে তারিখ দেওয়া ছিল ৩রা চৈত্র, ১২০০ বঙ্গাব্দ। (3F)

৮ম ঘটনা-চট্টগ্রাম 'আড়ং'যের অধীন তিনশত ষাটজন তাঁতী ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কোম্পানীর 'বোর্ড অব ট্রেড (কমার্শিয়াল)' নিকট লিখিত অভিযোগ দাখিলের মাধ্যমে জানায় যে, ১৭৮৯ থেকে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মোট প্রায় ৪ বছর যাবৎ আড়ংয়ের এজেন্ট হ্যারিস এবং কোলেস আর তাদের গোমস্তা মায়া গোবিন্দী যৌথভাবে তাঁতীদের বঞ্চিত করে চলেছে। যেমন লাকিপুর আড়ংযে সিক্কা টাকায় কোন বাটা নেওয়া হয় না, অথচ গোমস্তারা যে অর্থ 'অ্যাডভান্স' স্বরূপ দেয় তার থেকে টাকায় সাড়ে সতেরো গণ্ডা নিয়মিত ভাবে কেটে নেয়। গোমস্তা কালেকটারের ট্রেজারী থেকে পুরা টাকাটাই তুলে আনে। কিন্তু তাঁতীদের প্রতি দেয় টাকা অনেক কম দেয়। ধাপ্পা দিয়ে 'কালেকটরের জন্য' এই খাতে সে তাঁতীদের কাছে ঐ পাঁচবছরে মোট এক হাজার ছয়শত কুড়ি টাকা কেটে নিয়েছে। ঐ গোমস্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে পিটিশনে তাঁতীবা বলে 'বস্ত্র মাপে ঠিক নেই' এই অজুহাতে তাঁতীদের প্রাপ্য পূর্ণ পরিমাণ থেকে পিস পিছু চার আনা, আট আনা এমনকি এক টাকা পর্যন্ত কেটে নিযেছে আর এই ধরনের অত্যাচারের ফলে তাঁতীরা মোট মজুরীর অর্ধেকও লাভ করে না, বা আদৌ পায় না। তাঁতীদের কাছে হতে কোম্পানীর যদি কোন প্রাপ্য বা পাওনা থাকে তবে গোমস্তারা

পাওনার ওপর সুদ আদায় করতো। যদি কোন তাঁতীর সামান্য ত্রুটি ধরা পড়ে তবে তাকে জরিমানা আদায় দিতে হয়। যদি জরিমানা সঙ্গে সঙ্গে জমা দিতে না পারে তবে তার কাছ থেকে লিখিত বণ্ড আদায় করে নেয়।

তাঁতীরা গোমস্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কবার সঙ্গে সঙ্গে আড়ংয়ের আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে (যেমন writer, zemmidar এবং zilader) দুর্নীতির অভিযোগ আনে। ঐসব দুর্নীতিবাজরা ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে কোম্পানীর অর্থ খাটায়। পিস প্রতি দুটাকা তাঁতীদেরকে 'অ্যাডভান্স' করে আবার উৎপন্ন বস্ত্র জমা নেবার সময় দাম কেটে নেয় দ্বিগুণ অর্থাৎ চার টাকা। এর ফলে আসলে 'অ্যডভান্সের' পরিমাণ পিস প্রতি দুটাকা থেকে বেড়ে তাড়াতাড়ি চার টাকা হয়ে গেল। যখন তাঁতীরা প্রদত্ত বস্ত্রের প্রকৃত মূল্য দাবী করে দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মচারীরা প্রতি পিস থেকে একটাকা নয়তো একটাকা চার আনা আগেই কেটে রাখে। ন্যায্য মূল্য পাওনা থেকে তাঁতীরা বরাবরই বঞ্চিত হতে থাকে। (3G)

৯ম ঘটনা ঃ-শান্তিপুর ফ্যাক্টরীর অধীন সোনাবাড়ি গ্রামেব আড়ংযের সঙ্গে যুক্ত তাঁতীরা ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী লিখিত অভিযোগ পত্রেব মাধ্যমে কলকাতাস্থিত 'বোর্ড অব ট্রেড (কমার্শিয়াল)' এর কাছে পেশ কবে যে গোমস্তা জগমোহন চৌধুরী ও ক্যাশিয়ার রামানন্দ ভাদুড়ি (উভয়েই মনোহর গঞ্জের ফ্যাক্টরীর) তাদের অর্থাৎ তাঁতীদের অগ্রিম দাদন দেওয়ার আগে আট-নয় টাকা থেকে একটাকা উপরি পাওনা স্বরূপ কেটে নেয়। তাঁতীরা অভিযোগ করে তাদের যখন আস্তার ??-ফ্যাক্টরীর কর্মচারীদের সামনে সবকিছু পরীক্ষা করা হয় এবং উৎপন্ন বস্ত্রগ্রহণ করা হয়, ঠিক তারপর তাঁতীরা প্রস্থান করলে তাদের অনুপস্থিতিতে প্রতিটি বস্ত্রের গুণাগুণ নির্বিশেষে তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম অক্ষর বসিয়ে দেয় এবং কলকাতায় পাঠিয়ে দেয়। এরফলে তাঁতীরা প্রতি পিস বস্ত্রে লোকসান সহ্য করতে বাধ্য হয়।

ঐ তাঁতীরা আরও অভিযোগ করে যে, তাদের প্রাপ্য থেকে প্রতি টাকায় আট আনা 'দালালি স্বরূপ' কেটে নেওয়া হয়। তারা জানেনা সরকারের কাছ হতে এই দালালরা কি পায়। কিন্তু গোল্ড মোহরের প্রিমিয়াম বাবদ এক আনা এবং দেড় আনা কেটে নেওয়া হয়। তাঁতীরা যে এই ধরনের লোকসান খেতে খেতে একেবারে সর্বস্বান্ত হওয়ার পথে যাত্রা শুরু করেছে সেই কথা জানিয়ে 'বোর্ড অব ট্রেড' এর কাছে দাবী করে যে ঐ কুঠির হেড গোমস্তা শিবরাম স্যাণ্ডাল, পচু জোছনদার, জগমোহন চৌধুরী (গোমস্তা) এবং রামনন্দ ভাদুড়ি (কোষাধ্যক্ষ) এদের প্রত্যেককে সমন করে আড়ংয়ে ডেকে যেন সব কিছু জানতে চাওয়া হয়। তারপর থেকে তাদের যেন কোনভাবেই 'অ্যডভান্স' দেওয়া না হয়। তাঁতীরা কোম্পানীর অধীনে তাঁতবস্ত্র বুনতে মোটেই রাজি নয়। (3H)

১১তম ঃ— গোলাগর (Golagore) কুঠিও ফ্যাক্টরীর তাঁতীরা অমানবিক এবং দুর্নীতিমূলক কাজকর্মের বহু উদাহরণ ১৮০৪ খ্রীঃ ১১ই জুলাই বোর্ড অব্ ট্রেড এর নিকট। গোলাগড় ফ্যাক্টরীর অধীন গৌড়িপুর, খানপুর, গুড়াপ, উইগড় এবং মাজে নান আড়ং গুলিররা পিটিশন দাখিল করে। অভিযোগ ছিল এই যে উইলিয়ামস্ তন্তুবায়ী ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে গোলাগড় ফ্যাক্টরীর রেসিডেন্ট হয়ে আসার পর থেকে তাঁতীদের কাছ হতে প্রায় নব্বুই হাজার টাকা আত্মসাৎ করেছে। বলা হচ্ছে যে, ঐসব টাকা কোম্পানীর পাওনা। পিটিশনে আবেদন জানানো হয় যে, আমীন পাঠানো হোক। তাঁতীদের কাছে কোম্পানীর পাওনা আমীনকে দিয়ে স্থির করা হোক। সবচেয়ে বড় আবেদন ছিল তাঁতীদের যেন তাদের নিজ গ্রাম ত্যাগ করতে এবং অন্য কোন গ্রামে বসবাস করতে অনুমতি দেওয়া হয় যাতে তারা অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে পারে।

ঐ পিটিশনে বা আবেদন পত্রে যারা স্বাক্ষর করেছিল তাদের নেতৃত্বে ছিল তন্তুবায়ী টুনু দাস, মথুর ওয়েন প্রভৃতিরা। এই ধরনের গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে ইংরাজ রেসিডেন্টের কাছে প্রতিবাদ জানানোর পদ্ধতিটি অভূতপূর্ব।

গৌরীপুর ফ্যাক্টবীর অধীন ১০৫১ জন, খানপুর ফ্যাক্টরীর অধীন ৭০০ জন, গুড়াপের ৪৭০ জন, বৃহত্তম গোলাগড় ফ্যাক্টরীব ১৪০০ জন, এবং মাজেনানের ৩৮০ জন একটি প্রতিবাদপত্রে মোট চার শত তাঁত শ্রমিক স্বাক্ষর করে জানায় মোট সাতদফা অভিযোগ। যথা,

১। রেসিডেন্ট মিঃ উইলিয়ামস্ পাঁচটি ফ্যাক্টবীর অধীন সকল তাঁতীর মধ্যে থেকে প্রত্যেকের কাছ হতে প্রথম বর্ণের (First Letter) চিহ্নিত বস্ত্রের মধ্যে দুইটি বস্ত্র প্রথমে গ্রহণ করে এবং তাদের মূল্য নির্ধারণ করে ছয় টাকা আট আনা কিন্তু যখন তাঁতীকে মূল্য দিতে হয় তখন দেওয়া হয় চার টাকা হারে। অভিযোগকারীবা দুর্নীতির হিসাব দেয় নিম্নোক্ত রূপ ঃ—উইলিযামস্ মোট আট হাজার পিস বস্ত্র গ্রহণ করে ছিল। মূল্য প্রতি পিস ৬ টাকা আট আনা, মোট মূল্য ৫২,০০০ টাকা। রেসিডেন্ট তাঁতীদের পেমেন্ট করেছে পিসপ্রতি ৪ টাকা হারে মোট ৩২,০০০ টাকা। রেসিডেন্টের কাছে তাঁতীদের পাওনা মোট ২০,০০০ টাকা।

২। ফ্যাক্টরীর গোমস্তার কাছে যে বস্ত্র মজুত হয় তা সে পরীক্ষা করে। কিন্তু যদি সামান্য ছিন্ন বা ক্ষতিগ্রস্ত দেখা দেয় তবে সেই সমস্ত বস্ত্র প্রেরণ করা হয় পাণ্ডুয়াতে (PUNDWA) অবস্থিত ফ্যাক্টরীতে। সেখানে তাঁতীদের অনুপস্থিতিতে সবকিছু যাচাই হয় এবং এক ও দুই নম্বর যুক্ত বস্ত্রগুলিকে চার ও পাঁচ নম্বর মার্কা দেওয়া হয়। এরপর পিস প্রতি এক আনা 'Washing charge' আদায় করা হয়। এই টাকাটা তাঁতীদেরই প্রাপ্য। প্রাপ্য মোট টাকার পরিমাণ ১০,০০০ টাকা।

৩। আড়ং (Aurungs) এর ফ্যাক্টরীগুলিতে যেখানে বস্ত্রবয়ন কার্য হয় সেখানে উৎপন্ন বস্ত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা না করে পাণ্ডুয়া (PUNDWA) ফ্যাক্টরীতে উৎপাদক

তাঁতীদের অনুপস্থিতিতে পরীক্ষা হতে থাকে। ঐসব বস্ত্র বাতিলের পর্যায়ে পড়ে যায়। প্রাপ্য অনেক হ্রাস পায় এ ক্ষেত্রে তাঁতীদের মোট প্রাপ্য ২০,০০০ টাকা।

৪। পাণ্ডুয়া ফ্যাক্টরীতে তাঁতীদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে উৎপন্ন বস্ত্রগুলিকে গোমস্তা বাছাই করে। বস্ত্রগুলি ছিল অত্যন্ত উন্নত মানের। মার্কা দেওয়া ছিল ১ম ও ২য় স্থানের। কিন্তু চার পাঁচ মাস পরে জানা গেল ঐ বস্ত্রগুলিকে চার ও পাঁচ নম্বর পর্যায়ে নিক্ষেপ করা হয়েছে। এই বাবদ প্রাপ্য মোট ২০,০০০ টাকা। তাঁতীরা অভিযোগ পত্রে সুস্পষ্টভাবে জানায় যে গোলাগড় রেসিডেন্টের কাছ হতে তাদের সত্তর হাজার টাকা পাওনা আছে।

৫। হেড ফ্যাক্টরীর কর্মচারীগণ যথা নন্দ কুমার (Nund Coomer), দেওয়ান রামজীবন মুখোপাধ্যায়, রাধু সরকার এবং গোবিন্দ দালান প্রতি বৎসর প্রত্যেক তাঁতীর কাছে হতে পাঁচ ছয় টাকা উপরি পাওনা গ্রহণ করে যাঁর পরিমাণ হয় মোট ২০,০০০ টাকা।

হেডফ্যাকটরীর কর্মচারীগণ ব্যতীত অন্যান্য অধঃস্তন ফ্যাকটারীগুলিতে কর্মচারীগণ যেভাবে অর্থগ্রহণ করে থাকে তার মোটপবিমাণ ৯০,০০০ টাকা (২০,০০ টা + ১০,০০০ টাকা + ২০,০০০ টাকা + ২০,০০০ টাকা + ২০,০০০টাকা = ৯০,০০০ টাকা)

যোগফল দাঁড়াচ্ছে ৯০,০০০টা + পূর্বোক্ত মোটপবিমাণ যা তাঁতীদের পাওয়াব কথা তাও ৯০,০০০ টাকা। তাঁতীবা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করে যে নব্বই হাজার টাকা আগেই তারা নিশ্চিতভাবেই কোম্পানী গোমস্তার কাছে পাবে।

৬) তাঁতীদের কাছ হতে আবেদনপত্র পেয়ে জনৈক কর্মচারী মিঃ মানি 'বোর্ড অব ট্রেড' এর জ্ঞাতসারে জমাকৃত বস্ত্রসম্ভাবের ওপর 'A' মার্কা দেয় এবং ছয়টাকা আট আনা পিস প্রতি মূল্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। সেইমতো তাঁতীরা বস্ত্র সরবরাহ কবছিল, কিন্তু মিঃ উইলিয়ামস্ পুনর্বার বাছাই করে। কিন্তু ঐ রেসিডেন্ট পূর্বোক্ত প্রতিশ্রুতিমতো তাঁতীদের প্রাপ্য না দিয়ে তাদের প্রহারে জর্জরিত করে চরম দুঃখের জীবনে নিক্ষেপ করে।

গণদরখাস্তে তাঁতীদের দাবী ছিল সমস্ত হিসাব নিকাশ পরীক্ষা করে দেখা হোক এবং মিঃ মানি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিমতো মিঃ উইলিয়ামস্ যেন তাঁতীদের সরবরাহ কৃত বস্ত্রের উপযুক্ত মূল্য দিয়ে দেন।

৭) চার সহস্রাধিক তাঁতশিল্পী উইলিয়ামসের বিরুদ্ধে বোর্ডেব কাছে অভিযোগ করে এই মর্মে যে উক্ত রেসিডেন্টের পূর্বে যিনি রেসিডেণ্ট ছিলেন সেই কোম্পানী মেসার্স কুক এণ্ড মানি যারা সমস্ত উৎপাদিত বস্ত্র পাণ্ডুয়া ফ্যাকটরীতেই বাছাই করতো এবং সেই বাছাই পর্ব চলতো তাঁতশিল্পীদের সম্মুখে কিন্তু উইলিয়ামসের আমলে পুরা পদ্ধতিটার আমূল পরিবর্তন হয়ে যায়। এইরূপ পরিস্থিতিতে তাঁতশিল্পী ও তাঁতশ্রমিকগণ আবেদন

করে যে, একজন বিশ্বস্ত কর্মীকে দিয়ে যেন বাছাইয়ের কাজ পরিচালনা করা হয় এবং তাঁত শ্রমিকদের উপস্থিতিতে এবং গুণাগুণের ভিত্তিতেই যেন সবকিছু যাচাই করা হয়।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে নদীয়া (NUDDEA) জেলার দেগঙ্গা (Degong) এবং শ্রীনগর (Sreenaggur) আড়ংয়ের তন্তুবায়ীরা এবং শ্রীনগর (Sreenaggur) চাকলা গ্রামের তন্তুবায়ীরা লিখিতভাবে ইংরাজ কোম্পানীব কাছ হতে কোন প্রকার অ্যাডভান্স গ্রহণ করতে গররাজী হয়। রেসিডেন্ট কে জানানো হয়েছিল যে গ্রামগুলির তন্তুবায়ীরা কেবল ধুতি উৎপাদনে দক্ষ, অন্য কোন মহার্ঘ বস্ত্র প্রস্তুতের তারা কিছুই জানে না। অথচ সিবাতী (Seebattee) ফ্যাক্টরীর (শান্তিপুরের অধীন) নতুন গোমস্তা দেবীপ্রসাদ (Deby Prasad, এবং হুর চান্দর (Hur Chander) চৌধুরী অ্যাডভান্স হাতে নিয়ে সমস্ত তাঁতশ্রমিককে হাইরোডে কব্জা ক'রে ফ্যাক্টরীর গোডাউনে পুরে দেয়, মারধর করে শেষে 'অ্যাডভান্স' নিতে সকলকে বাধ্য করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁতশিল্পীদের মধ্যে প্রবল ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেয় দেগঙ্গা (Degong) র তিলক চন্দ্র চন্দ (Tiluck Chander Chund), রামমোহন বিশ্বাস এবং শ্রীনগর নিবাসী রঘুনাথ দত্ত এবং ভৈরব (Bhyrub) চন্দ্র (Chunder) সেন প্রমুখ তন্তুবায়ীগণ। এদের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী আড়ংয়ের অনেক তাঁতশ্রমিক যোগ দেয় যারা কোনমতেই কোম্পানীর কাছ হতে 'অ্যাডভান্স' গ্রহণে রাজী নয়। বোর্ডের কাছ হতে এজন্য তারা সুস্পষ্ট পরোয়ানা দাবী করে।

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তন্তুবায়ীদের সংগ্রাম ঃ—পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছিল তন্তুবায়ীরা ইংরাজবণিকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য সংগ্রাম গড়ে তুলতে পারে নি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরাজবণিকদের অত্যাচার চরমে ওঠে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে সমস্ত বিদ্রোহের কথা পাঠযোগ্য হিসাবে পরিগণিত হয়েছে তাদের মধ্যে তন্তুবায়ীদের বিদ্রোহের কথা স্থান পায়নি। কিন্তু ঘটনা হলো সন্ন্যাসী বিদ্রোহ যার ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে সূচনা হয় এবং সমাপ্তি ঘটে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে তার মধ্যে ঢাকা, শান্তিপুর, সোনামুখী, হরিপাল, গোলাগড় প্রভৃতি আড়ংগুলির তন্তুবায়ীরা মাঝে মধ্যেই বিদ্রোহ করত।

বণিকদের মধ্যে দ্বন্দ ঃ—১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের কথা। শান্তিপুরের রেসিডেন্ট ফ্লেচার 'বোর্ড অব ট্রেড' এর কাছে প্রতিবেদন পাঠিয়ে জানান যে ইংরাজবণিকদের চাইতে অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকরা এবং প্রাইভেট বণিকগণ শান্তিপুরের তন্তুবায়ীদের অনেক বেশী মজুরী দিচ্ছে ফলে ইংরাজ বণিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। প্রকৃতঘটনা তাই-ই অর্থাৎ শান্তিপুরের তন্তুবায়ীরা ইংরাজবণিকদের অত্যাচার এবং কম মজুরী প্রদানের জন্য প্রবল বিক্ষুব্ধ হয়ে ইংরাজদের 'আড়ং' যে উৎপন্ন বস্ত্রাদিতে গররাজি হয়। ইংরাজদের পরিবর্তে অন্য বণিকদের বেশি পছন্দ করতো। শান্তিপুরের মসলিনের প্রচুর খ্যাতি ছিল দেশে এবং বিদেশে।

শান্তিপুরের তাঁতীদের ক্ষোভ ও সংগ্রামের কথা ঃ—শান্তিপুরের তাঁতশ্রমিকদের কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। যে বিষয়টি উল্লেখ করা প্রয়োজন এই প্রসঙ্গে যে শান্তিপুরের শ্রমিকরা অনেকটা ইচ্ছাকৃতভাবেই ইংরাজদের অপেক্ষাকৃত কম গুণসম্পন্ন বস্ত্র সরবরাহ করতো। কিন্তু অন্যান্য প্রাইভেট ট্রেডার্সদের সঙ্গে বা ডাচ্ বা ফরাসী বণিকদের আড়ং'য়ে উৎকৃষ্ট মসলিনই পৌঁছে দিত। ফলে ইংরাজদের থেকে অনেক বেশি বস্ত্রের মূল্য শ্রমিকরা অর্জন করতো। ইংরাজদের সমস্ত ক্রোধ বর্ষিত হলো তাঁতশ্রমিকদের ওপর। এই ভাবেই দুইবৎসরাধিক কাল গড়িয়ে যায়।

১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের 'রেগুলেশন' অনুযায়ী ইংরাজ কোম্পানীর মনোভাব কঠোরতর হয়ে ওঠে।

ইংরাজ রেসিডেন্ট ফ্লেচার ঘোষণা করেন কোম্পানীর তালিকাভুক্ত প্রত্যেক তাঁতীকে আড়ং'য়ে এসে লিখিত চুক্তিতে স্বাক্ষর দিতে হবে যে সে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ব্যতীত অন্য কোন কোম্পানী বা প্রাইভেট ট্রেডারের কাছে যাবে না বা এধরনের অন্য কোন বণিককে বস্ত্রপণ্য সরবরাহ করতে পাববে না। শান্তিপুরের তাঁতীরা ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে কোন লিখিত চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে সরাসরি অস্বীকার করলো। কারণ ইংরাজ বণিকদের চরিত্র সম্বন্ধে তারা ছিল সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। যদি নির্দিষ্ট মান এবং নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদিত পণ্য ইংরাজকুঠিয়ালের কাছে জমা না পড়ে তবে অনিবার্যভাবে নেমে আসতো শাস্তির খাঁড়া।

ঠিকাদার ব্রাকোয়ার কুঠিয়ালের কাছে প্রতিবেদন পাঠায় এই মর্মে যে শান্তিপুরের তন্তুবায়ীরা কৌশলে চুক্তি এড়িয়ে চলেছে। যে সব কোম্পানীর সঙ্গে কোন চুক্তি সম্পাদন হয়নি তাদেব জন্য গোপনে অব্যাহত রেখেছে বস্ত্র সরবরাহ ব্যবস্থা।

এরপর অপর একজন ঠিকাদার বোল্যাণ্ড শান্তিপুরে তাঁতশিল্পীদের গোপনব্যবসা বন্ধ করবার জন্য অত্যন্ত সক্রিয় হয়। তার কার্যকলাপে উত্যক্ত হয়ে তাঁতীরা প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে তন্তুবায়ীদের সংগঠন 'গিল্ড' বা 'অ্যাসোসিয়েশন'। গিল্ডের আহ্বান বা শঙ্খের আওয়াজ উঠলেই তারা প্রত্যহ জমায়েত হতো গোপন স্থানে। সেইখানেই চলতো বিস্তৃত আলোচনা। পঞ্চায়েত হতো প্রকাশ্যস্থানে। ঘন্টার আওয়াজ কানে প্রবেশ করতেই শান্তিপুরের তাঁতীরা বেরিয়ে আসতো তাঁতবন্ধ করে। একেবারে সৈনিকসুলভ আচরণ। যে, যে অবস্থায় যা পরিধানে আছে তা নিয়েই বেরিযে পড়তো পথে। শুরু করতো বিক্ষোভ প্রদর্শনের মহড়া।

শান্তিপুরের তাঁতীদের বিক্ষোভের ঝড় পৌঁছে যেত পার্শ্ববর্তী আড়ংয়ে। পরপর আড়ং গুলোর বিক্ষুব্ধ তাঁতীরা যোগ দিত শান্তিপুরের বিদ্রোহী তাঁতীদের সঙ্গে। সর্বত্র এমন অবস্থা সৃষ্টি করলো বিদ্রোহীরা যে কেউ আর ইংরাজদের বস্ত্র বিক্রী করেনা বা 'অ্যাডভান্স'ও নেয়না। চুক্তিতে স্বাক্ষর করা তো পরের কথা। কোম্পানীর ঠিকাদাররা কোম্পানীর নিকট দাবী করে যে বিদ্রোহী তাঁতীদেরকে কারারুদ্ধ করতে হবে। 'রেগুলেশন'

এর মুগুরতো আছেই। ঠিকাদারদের দাবী বা পরামর্শমতো কোম্পানীও সক্রিয় হয়ে ওঠে। বিদ্রোহী তাঁতীদের নয়জন নেতাকে শান্তিপুর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই নয়জন বিদ্রোহী নেতার মধ্যে ছয়জন ভালমানুষ হিসাবে বাস করবে এবং ইংরাজদের চুক্তিতে স্বাক্ষর দেবে এই শর্তে মুচলেকা দিতে সম্মত হলে তাদের মুক্তি হয় কিন্তু বাকী তিনজনকে কোনও প্রকার মুচলেকায় স্বাক্ষর করতে অসম্মত হওয়ায় তাদের দেওয়ানি আদালতে সোপর্দ করা হয়। আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ তখন ছিল না। বিচারকের রায়ে ঐ তিনজন প্রত্যয়দৃপ্ত বীর, বিদ্রোহীরূপে নিজেদের পরিচয় অক্ষুন্ন রাখায় দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড ভোগ করতে বাধ্য হয়।

তিনজন নেতার মুক্তির দাবীতে শান্তিপুর পুনরায় তোলপাড় হয়ে পড়ে। গ্রেপ্তার হওয়া বিজয়রাম ছিলেন শান্তিপুরের বিদ্রোহী তাঁতশ্রমিকদের নেতা। আটক অবস্থাতেই তার মৃত্যু হলে আন্দোলনের নেতৃত্বে আসেন লোচন দালাল, রামহরি দালাল, কৃষ্ণচন্দ্র বড়ালি, রামরাম দাস প্রমুখ শ্রমিক সংগঠকরা। (সূত্র ঃ কৃষক ও তন্তুবায়ীগনের সংগ্রাম। লেখক— সুপ্রকাশ রায়) দেশের গভর্ণর জেনারেলের কাছে প্রতিবাদ পত্র পাঠায় শান্তিপুর বাসীরা সকলকেই সেই গণস্বাক্ষর পত্রে স্বাক্ষর দেয়। প্রতিবাদ পত্রে শান্তিপুরবাসীরা কোম্পানীর ঠিকাদার এজেন্ট জন বেব এবং তার অধীন ঠিকাদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যাবতীয় তথ্য সরবরাহ করে। গণস্বাক্ষর সম্বলিত প্রতিবাদ পত্রের বয়ান ছিল এইরূপঃ-

"কলকাতার উচ্চ আদালতের জজ গ্লাডষ্টোন সাহেবের নিকট কনট্রাক্টর বেব আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন এবং সে চক্রান্ত করিয়া আমাদের তিনজনকে আটক করিয়াছে।...বিজয়রাম পূর্বেই আপনার নিকট সুবিচারের প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। বেব তাঁহাকেও বলপূর্বক গ্রেপ্তার করিয়া শান্তিপুরে ফ্যাক্টরীতে আটক করিয়াছে। সেখানে তিনি গুরুতররূপে অসুস্থ।" (সুপ্রকাশ রায় কৃষক ও তন্তুবায়ীগণের সংগ্রাম, পৃঃ ৭৩) শান্তিপুরের তাঁতীরা ইংরাজদের সঙ্গে কোনপ্রকার সহযোগীতার পথে যেতে রাজী হয় নি। এই দৃষ্টান্তে অন্যান্য আড়ংয়ের তাঁতীরা অনুপ্রাণিত হয়। দৃষ্টান্তমূলক এই বিদ্রোহ সম্পর্কে ডাঃ ডি.বি. মিত্র তাঁর 'Cotton Weavers in Bengal' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন—

"The Santipore Weavers thus showed some capactity for combined resistance which perhaps have been more successfull. But it was true that circumstances were less favourable and the success of such resistance was very united and hence forward they had mainly to depend upon more petitions for the redress of their grievances. (P.141)। শান্তিপুর উত্তপ্ত হওয়ার পশ্চাতে কারণও নিহিত ছিল। প্রথমত ইংরাজ কোম্পানী সুবিধামতো মসলিন সংগ্রহের পদ্ধতি ধার্যমূল্য সবই পরিবর্তন করে। এবং জোরজুলুম খাটানো। দ্বিতীয়তঃ তাঁতশিল্পীদের অপমান করার ঘটনা, দৈহিক নির্যাতন।

পলাশীযুদ্ধের পূর্বের পরিস্থিতি এবং পরবর্তীকালের পরিস্থিতির ভিন্নতর ছিলনা। আলিবর্দীর নবাবীআমলে সপ্তদশ শতকের শেষ এবং অষ্টদশ শতকের প্রথমভাগে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁতীদেব দাদন (ইনভেষ্টমেন্ট) দেওয়ার জন্য একপ্রকার দালাল যাদের শুদ্ধভাষায় বলা হতো 'দাদনী মার্চেন্ট' তাদের হাতে তাঁতীদেরকে দেয় দাদনের অর্থ, 'ইনভেষ্টমেণ্ট' আকারে তুলে দিত। এতেও তাঁতীদের কিছু স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সিরাজ উদ-দৌলার আমলে জন্ম হলো 'গোমস্তা' নামক আর এক ইংরাজ দালাল শ্রেণীর। তাঁতীদের ওপর এই গোমস্তাদের নির্বিচার অত্যাচার শান্তিপুবের তাঁতীদের কেবল ন্যায় সমগ্র বাংলার তাঁতীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। গবেষক এন. কে. সিংহ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Economic History of Bengal (Vol-1)' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, ''তাঁতশিল্পীদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের ক্ষমতা যথেষ্ট ছিল এবং ইহা সন্দেহাতীত যে শান্তিপুর তন্তুবায়ীগণ সেই ক্ষমতা উত্তমরূপেই প্রয়োগ করিয়াছিল।'' (পৃঃ-১৬৯)

ধূর্ত ইংরাজবণিকরা গোমস্তাদেব লেলিয়ে দিয়েছিল শান্তিপুরের দবিদ্র নিরক্ষর তাঁতশিল্পীদের পিছনে। শৃগালের মতো গোমস্তারা তাঁতীদেব তাড়া কবে বেড়াত। গোমস্তারা তাঁতীদেরকে জোর করতো বণ্ডে স্বাক্ষর করার জন্য। ঐ বণ্ড বা মুচলেকায় একবার স্বাক্ষর করতে সক্ষম হলে তাঁতী সম্পূর্ণ রূপে রূপান্তরিত হতো গোলাম শ্রেণীতে। একটা নির্দিষ্ট মাপের, নির্দিষ্ট গুণসম্পন্ন এবং নির্দিষ্ট দিনেব ও সময়ের মধ্যে 'অ্যাডভান্স' গ্রহণেব জন্য বস্ত্র সরবরাহ কবতে বাধ্য হতো তাঁতী। কোম্পানীর গোমস্তাদেব রেজিষ্টার খাতায় একবাব তাঁতীর নাম রেজিষ্টারী হয়ে যাওয়ার পর অন্য কোন বণিকেব কাছে সে এক পিস বস্ত্রও বিক্রয় করতে পারতো না। শান্তিপুরের তাঁতীরা প্রত্যক্ষ করে তারা যদি স্বাধীনভাবে উৎপন্ন বস্ত্র খোলাবাজারে বিক্রয় করতে পারতো তবে তাবা অনেক বেশী উপার্জন করতে পারতো। ইংরাজরা শতকরা পনের থেকে চল্লিশ টাকা কম মূল্য দিত। ফলে গোপনে অন্য বণিকদের কাছে বস্ত্র বিক্রয়েব প্রবণতা তাঁতীদের মধ্যে বৃদ্ধি পেল।

গোমস্তারা এই প্রবণতা রোধে পাল্টা ব্যবস্থা স্বরূপ প্রত্যেক তাঁতীব গৃহ মধ্যে পিয়ন বসিয়ে দেওয়ার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনুমোদন গ্রহণ করে। পিযনরা সর্বদা তাঁতীর প্রাত্যহিক জীবনে নাক গলাত। বাড়ির মধ্যে ঘুরঘুর করে। পিয়ন পুষতে যে খরচ হয় কোম্পানী তাঁতীর কাছ হতে সে খরচ অনায়াসেই কেটে নেয়। গোমস্তা আর তাদের উপদালাল পিযনদের অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে অতিষ্ঠ জর্জরিত শান্তিপুরের তাঁতশ্রমিকরা ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর কোম্পানীর 'কোর্ট অব ডিরেক্টর বোর্ড' এর কাছে নালিশ জানায়। কিন্তু বোর্ড সেই অভিযোগ কর্ণপাত করে না।

এর পরের ঘটনা ছিয়াত্তরের মৃত্যুর মিছিল। 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের' পর ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ২রা এপ্রিল 'বোর্ড অব ট্রেড (কমার্শিয়াল)' এর কার্য বিবরণীতে বোর্ডের প্রেসিডেন্টের বক্তব্য নথিভুক্ত হওয়ায় ঘটনাক্রমে জানা যায় যে বোর্ডও শান্তিপুরের

তাঁতশ্রমিকদের বক্তব্য একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেনি। যে গোমস্তারা ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিপুর সহ অন্যত্র সর্বত্র তাঁতশ্রমিকদের ওপর অত্যাচার শুরু করেছিল তা ভয়াবহ আকার ধারণ করে পলাশীপ্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর। তবে আরও দশবছর পরে ১৭৬৭ গোমস্তারা একেবারে লাগামছাড়া হয়ে অত্যাচার শুরু করায় শ্রমিকরা উপায়ান্তরের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। ওই সময় কোম্পানীর 'ইনভেস্টমেন্ট' অনুযায়ী ইংলণ্ডে রপ্তানীমূল্য প্রতিবছরই হ্রাস পেতে থাকায় কোম্পানী মুনাফার মাত্রাবৃদ্ধি কল্পে একাধিক 'রেগুলেশন' পাশ করে তাঁতীদেরকে আইনের বেড়াজালে আবদ্ধ করে।

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে সেপ্টেম্বর পুরাতন রেগুলেশনে কোম্পানী সংশোধনী আনে, তার প্রতিক্রিয়ায় শান্তিপুরের তাঁতীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এই রেগুলেশনের খাঁড়া লিখিতচুক্তিতে স্বাক্ষরের পর তা প্রতিপালন করতে অক্ষম হওয়ায় তাঁতীকে শতকরা পঁয়ত্রিশভাগ কোম্পানীকেই উল্টে ক্ষতিপুরণ দিতে হতো। ক্ষতিপূরণ দিতে অসমর্থ হওয়ার কারণে তাঁতীকে দেওয়ানী আদালতে সোপর্দ করা কারাবাসের আদেশ প্রভৃতি সত্ত্বেও তাঁতীদের মনোবলে বিন্দুমাত্র চিড় ধরাতে পারেনি। শান্তিপুরে আরেক এজেন্ট ফ্লেচার ঠিক এই মর্মেই কলকাতাস্থিত 'বোর্ড অব ট্রেডে'র নিকট রিপোর্ট প্রেরণ করেন।

বাঁকুড়া জেলার সোনামুখি, পাত্রসায়ের (Pattersayeer), বীরভূমের সুরুল প্রভৃতি স্থানের তাঁতীদের যারা অগ্রগামী অংশ সেইসমস্ত হেড উইভার্সদের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় তাঁতীরা শান্তিপুরের পথে অগ্রসর হতে থাকে। নেতৃত্বদানকারী তাঁতীদেরকে ছাঁটাই করার সিদ্ধান্ত কোম্পানী ঘোষণা করার সাথে সাথে অনিচ্ছুক তাঁতীরা সম্মতিজ্ঞাপন করতে থাকে কারণ তাঁতীরা মনে করে কোম্পানীর অধীনে কাজ করা অসম্মানজনক। "Dissmision was rather considered as a favour than a disgrace" সোনামুখির কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট জন চিপের বহু প্রয়াসও ব্যর্থ হয়। জন চিপের উদ্দেশ্য ছিল 'হেড উইভাবস্' দের সঙ্গে সাধারণ তাঁতীদের যোগাযোগ শিথিল করা অথবা একেবারে ছিন্ন করা। বীরভূম জেলার সুরুলে অবশ্য জন চিপের প্রয়াস কিছুটা সফল হয়েছিল কিন্তু সোনামুখি এবং পাত্রসাহেবের পুরাপুরি ব্যর্থ। জন চিপ বোর্ডকে জানায় সোনামুখীর কারিগরগণ দীর্ঘকাল কোম্পানীর কাছে কোন লিখিত মুচলেকা দিতে অস্বীকার করছে।

'বোর্ড অব ট্রেড' এর সভা ২২শে জুলাই, ১৭৯৪ খ্রীঃ, ৪৫ নম্বর প্রসিডিংস অনুযায়ী উক্ত তথ্য জানা যায়।

(Mr. Cheap tried much to break such an influence of the head weavers and though he became successful in this at Sorool he failed miserably in all the out factories, where the head weavers Constantly sought to have the weavers collected together often pretending that it was merely because the weavers wished to see each other"

(Ref: Cotton weavers of Bengal by Dr. D. B. Mitra P. 141)

তাঁতীদের ওপর শতকরা পঁয়ত্রিশভাগ ক্ষতিপূরণের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে মালদহে তাঁতীদের মধ্যে বিক্ষোভের বিস্ফোরণ হয়। মালদহের তাঁতীদের ভয় হয় স্বাক্ষরিত শর্ত প্রায়শঃই তাদের পক্ষে সারা সম্ভব হবে না। অসুস্থতা, উপযুক্ত সুতার অভাব, উপযুক্ত সময়ে সুতা না পাওয়া অথবা জমিদারদের সঙ্গে বিরোধের জেরে চুক্তির খেলাপ হওয়া প্রভৃতি প্রকাশ প্রায়ঃশই ঘটতে পারে। এই আশঙ্কায় মালদেহের তাঁতীরা 'পেনালটি রেগুলেশনের বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠে।

ঢাকা শহরের তাঁতীদের মধ্যে 'পেনালটি রেগুলেশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। নেতৃত্বদানকারী তাঁতশ্রমিকদের সঙ্গে সাধারণ তাঁতশ্রমিকদের দৃঢ় ঐক্যে চিড় ধরাবার জন্য ঢাকায় কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট টেলর সন্ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টায় ছয়জন নেতৃস্থানীয় তাঁতশ্রমিককে দেওয়ানী আদালতের পরিবর্তে 'ফৌজদারী' আদালতের কাঠগড়ায় তুলে ধরে এবং সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে 'ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী' এজেন্সী প্রথা (এজেন্ট নিয়োগ) বাতিল করে কনট্রাষ্ট প্রথা (বা ঠিকা) চালু করে। এই প্রথা নবাবীআমলে চালু ছিল, পরে বাতিল হলেও ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে থেকে পুনরায় চালু করা হয়। কনট্রাক্টররা তাঁতীদের সঙ্গে এমন ব্যবহার শুরু করে যেন তারাই 'আড়ং' গুলোর মালিক মহাজন। তারাই যেন কোম্পানীর প্রতিনিধি। কনট্রাক্টররা যখন তখন তাঁতীদের বাড়ি পিয়ন বসিয়ে দেয়, যখন তখন দারোগা উপস্থিত হয় তাঁতির কুটির দ্বারে।

কনট্রাক্ট প্রথা চালু হওয়ার পর তাঁতীরাও অধিক সতর্কতা অবলম্বন করে। যেমন শান্তিপুরের তাঁতীরা এরপর থেকেই অধিকতর কমগুণ সম্পন্ন (বা নিকৃষ্টমানের) সুতার সাহায্যে উৎপন্ন বস্ত্র 'আড়ং' যে উপস্থিত না করে সোজা খোলা বাজারের বিক্রী করে দিতে শুরু করে। প্রাইভেট ট্রেডাররা সেই বস্ত্র সস্তার সোৎসাহে ক্রয় করে। ইংরাজ রেসিডেন্টের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে অনিচ্ছুক তাঁতী বা প্রাইভেট ক্রেতাকে চিহ্নিত করা। কমদাম পাওয়ার জন্য যেটুকু তাঁতীদের ক্ষতি হতো তাঁতীরা সেই ক্ষতি পূরণের জন্য 'সুদমুক্ত অ্যাডভান্স' গ্রহণ করতে থাকে। আর উৎপাদিত বস্ত্র পূর্বের মতো একমাসের মধ্যেই সরবরাহ না করে তিন মাস থেকে পাঁচ-ছয় মাস পর্যন্ত নিজের হেফাজতেই জমা করে রাখে অথবা গোপনে বিক্রয় করে পরবর্তী কোন সময়ে পুনরুৎপাদন করে দেয়।

ঢাকা শহরের লাকিপুরে অবস্থিত 'ফ্যাক্টরী' এবং 'আড়ং'য়ে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ বস্ত্রের উৎপাদন হু হু করে বৃদ্ধি পায়। অন্যত্রও একই পরিস্থিতি। সর্বত্র মসলিন বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে কারণ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব এবং ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের পরিসমাপ্তি যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা যুদ্ধে শান্তিস্থাপনের ফলে ভারতীয় বস্ত্রের চাহিদা এরূপ বৃদ্ধি পায় যে কমগুণসম্পন্ন মসলিনবস্ত্রও বাজারে জমজমাট ভাবে বিক্রী হয়ে যায়।

অভাবী তাঁতীদের হাতে দুপয়সা আসে। কিন্তু বাংলার ইংরাজ বণিকরা এতে প্রমাদ গোনে। ইংরাজকুঠিয়ালের আড়ংয়ে হয়তো বস্ত্র মজুত আছে এবং তাঁতীও সেই আড়ংয়ে তার বস্ত্রসম্ভার নিয়ে উপস্থিত। যদি তার উপস্থিতির সময়কালে কোন এক সময়ে পিয়ন কোন কারণে কোন কাজে বাহিরে যায়, তাঁতীও তার লাট নিয়ে সরে পড়ে এবং খোলা বাজারে প্রাইভেট ট্রেডারদের কাছে বিক্রী করে দেয়। এই ঘটনায় ইংরাজরা মহাসমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়ে। তাঁতীদের জব্দ করার জন্য মরীয়া হয়ে ওঠে।

১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের শেষে ঢাকার লাকিপুরের রেসিডেন্ট মিঃ স্কট কলকাতায় বোর্ডের কর্তাদের জানায় যে, লাকিপুরের তাঁতশ্রমিকরা তাদেব কুটিরে পিয়ন বসাতেই সম্মতি দিচ্ছে না, রেসিডেন্টের মত ঘন ঘন সব তাঁতীদেরকে আদালতে সোপার্দ করা বন্ধ করা হ'ক, কারণ সেটা ব্যয় বহুলও বটে। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা। লাকিপুরের তদানীন্তন রেসিডেন্ট মিঃ সি আর. প্রেমেলিন লাকিপুর আড়ংয়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে বোর্ডের নিকট যে তথ্য সরবরাহ করে তাতে উল্লেখ করে যে তাঁতীরা নাম্বার যুক্ত তাঁতী হতে তীব্র অনিচ্ছা প্রকাশ করছে। নম্বরযুক্ত করা—এটা অপমান ব্যতীত অন্য কোন বিষয় হতে পারে না। এই সময়ে চালু ছিল কোম্পানীর সঙ্গে 'কিস্তবন্দী' (Kist bundee) চুক্তি। তাঁতীরা কোম্পানীর কাছ হতে গ্রহণ করা অ্যাডভান্সের টাকা ফেরৎ দিতে আগ্রহী ছিল। তথাপি তারা ইংরাজদের অধীনে কাজ করতে রাজী নয়। তাঁতীদের মধ্যে ইংরাজদের ফ্যাক্টরীতে কাজ করতে অস্বীকার করার সংখ্যা তখন ক্রমবর্ধমান ছিল। তাঁতীদের বক্তব্যছিল এইরূপ "I will not go either to this Moffussil or Sudder factory, nor I will work more for this Company if you want the cloths I will not give them but if you will send your people here and sele my account the balance shall be paid to you".

(Ref. Dr. D. B. Mitra P. 131 Cotton W....in Bengal)

রেসিডেন্ট আরও জানাচ্ছেন যে, যে তাঁতী চুক্তি খেলাপ করেছে বা করছে তাদের কুঠি বা আড়ংয়ে ডেকে আনতে কোন ব্যক্তি বা পিয়নকে কোম্পানী পাঠালে উল্টে সেই পিয়ন বা ব্যক্তিকেই বিক্ষুব্ধ তাঁতীরা আটক ক'রে ভয়ঙ্কর মারধোর করে। আদালতে নালিশ করাটাও বিচক্ষণতার মধ্যে পড়ে না। কোম্পানীর কোন তাঁতীই সেই সময়ে আর তাঁতের কাজই করতো না। রেসিডেন্ট আশঙ্কা প্রকাশ করেন এই সময়ে অর্থাৎ ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই কোম্পানীর অধীনে বয়নকার্য তাঁতীরা বন্ধ করে দেবে।

ঢাকার তিতাবাদী আড়ংয়ের সঙ্গে যুক্ত তন্তু কারিগররা কোম্পানীর কাছ হতে অ্যাডভান্স গ্রহণ করে অষ্টদশ শতকের নব্বুইয়ের দশকের প্রথমে অথবা পূর্বে আন্দোলন-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার কথা উল্লেখ করেছেন ডঃ দেবেন্দ্র বিজয় মিত্র তাঁর গবেষণা গন্থে।

এর ফলে ঐ আড়ংয়ের তাঁতীদেব অর্থনৈতিক দুরাবস্থা নেমে আসে। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তিতাবাদী কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত রেজিষ্টার্ড তাঁতশ্রমিকদের পরিবারের সংখ্যা ছিল নয়শত, দশবাবো বৎসরের মধ্যে (১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে এর মধ্যে) সেই সংখ্যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায়, মাত্র পাঁচশতে। এই দ্রুত সংখ্যা হ্রাসের কারণ সম্পর্কে বলা হয় যে তাঁতীদের অত্যন্ত স্বল্প মজুরী এবং অর্ধাহারে অনাহারে মৃত্যু ঘটছে। ৮ই মার্চ, ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে 'বোর্ড অব্ ট্রেড (কমার্শিয়াল)' এই বৈঠকে এসম্পর্কে একটি চিত্র উপস্থাপিত করা হয়। চিত্রটি ছিল নিম্নরূপ ঃ—কোম্পানীর পক্ষে কাজ করতে অনিচ্ছুক তাঁতীর সংখ্যা ২২৯১

ধ্বংস প্রাপ্ত তাঁতের সংখ্যা ১০৪৮

মোট ৩৩৩৯
নম্বব যুক্ত রেজিষ্টার্ড তাঁতের সংখ্যা-৯৯৪৭
(-)৩৩৩৯

৬৬০৮
বসবাস ত্যাগকাবীর সংখ্যা ৬১০৮
মৃত্যু ১৩৮

৩১আগষ্ট, ১৭৯৫ (অবশিষ্ট) ৫৯৭০

ঢাকা ফ্যাক্টরীব রেসিডেন্ট টেলর চেষ্টা কবেন তাঞ্জীব ও মলমল খাস মসলিনেব পূর্বের ধার্য মূল্যের কিছুটা হ্রাস কবতে। সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে তিতাবাদীকেন্দ্রেব তাঁতশিল্পীরা। এবা কোম্পানীব পাশ কবা 'রেগুলেশন' সম্পর্ক নীববতা ভেঙ্গে ফেলে চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার কবে অ্যাডভান্স গ্রহণ কবতেও অস্বীকার কবে। পার্শ্ববর্তী জঙ্গলবেরী ও বাজিতপুর আড়ংয়ে এই বিক্ষোভের দ্রুত বিস্তার ঘটে। তিতাবাদী আড়ংযের কারিগর বোষ্টম দাস ইংবাজদেব— শর্ত মেনে চুক্তির কাগজে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করায় গ্রেপ্তাব হয়। কুঠির কারাগারে তার ওপব দৈহিক নির্যাতনেব ফলে তার মৃত্যু ঘটার সংবাদ তাঁতশিল্পীদের মধ্যে পৌছলে শিল্পী শ্রমিকরা প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তিতাবাদীর অন্যতম তন্তুবায়ী শ্রমিক চুনিবাম পালের নেতৃত্বে তাঁতশ্রমিকরা ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে। লাগাতার ধর্মঘটে বিপর্যস্ত ইংরাজ কুঠিয়াল এবং ঢাকার কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট জন টেলর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 'বোর্ড অব ট্রেড' এর নিকট নিম্নোক্ত মর্মে বার্তা পাঠান ঃ—

"ঢাকার তন্তুবায়গণ তাহাকে সমবেতভাবে জানাইয়া দিয়াছেন যে সমস্ত জিনিষপত্রের মূল্যবৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া পূর্ব-নির্দিষ্ট মূল্যে কোম্পানীকে বস্ত্রসরবরাহ করা তাহাদের

পক্ষে আর সম্ভব নহে।'' টেলর জানাচ্ছেন যে সে তাঁতশিল্পীদের দাবী মানতে অপারগ হওয়ায় ঐ তাঁত শিল্পীরা কোম্পানীর বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাত শুরু করেছে। উৎকৃষ্ট সুতার পরিবর্তে নিকৃষ্ট মানের সুতা দিয়ে বস্ত্র প্রস্তুত করে সেই বস্ত্র আড়ংয়ে এনে ঢেলে দিচ্ছে এই ভাবে নিজেদের ক্ষতিপূরণ করে নিচ্ছে। ঢাকার তিতাবাদী জঙ্গলবেরী, বাজিতপুর, সোনার গাঁও প্রভৃতি আড়ংয়ে বিদ্রোহের ঝড় ওঠে। এর ফলে কোম্পানী নির্যাতন হ্রাসে বাধ্য হয়। বেআইনী গ্রেপ্তার ও আটক করার ঘটনা থেকে জোরপূর্বক লিখিত চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর আদায় অনিচ্ছুক তাঁতীকে 'অ্যাডভান্স' নিতে বাধ্য করার ঘটনার সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে ফলে শিল্পীরা কিছুটা রিলিফ পায়।

সুপ্রকাশ রায় তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'ভারতের কৃষকবিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম' গ্রন্থে সঠিকভাবেই উল্লেখ করেছেন যে অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে বাংলা প্রদেশের তন্তুবায় শ্রমিকরা বাঁচার আকাঙ্খায় যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন তা সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনেরই অনুরূপ। তাঁর এরূপ মন্তব্যের কারণ অত্যন্ত যুক্তি-সঙ্গত এই জন্য যে, এই সময় তাঁত শ্রমিকরা 'গিল্ড' বা 'অ্যাসোসিয়েশন' গঠন করে নিজেদের মধ্যে আন্দোলনের কৌশল, অত্যাচার প্রতিরোধেব বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে গভীর আলোচনা করতো। নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে নেতাব আহ্বানে সমবেত হতো। সুপ্রকাশ রায় আধ্যাপক গবেষক হরিরঞ্জণ ঘোষালের গবেষণার কথা উল্লেখ করেছেন এবং ঘোষালের প্রণীত 'Trade union spirit among the weavers of Bengal towards the close of 18th Century' থেকে নিম্নোক্ত মতের যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেই মতাটি লেখক গবেষক হরিরঞ্জন ঘোষালের নিজস্ব।

''ভারতবর্ষের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সাধারণত পশ্চিমের প্রভাবেবই ফল বলিয়া কথিত হয়। এই ধাবণার মধ্যে কিছু সত্য থাকিলেও ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। এক সময়ে 'গিল্ডপ্রথা' ছিল ভারতের প্রধান শিল্পসংগঠন এবং তাহার মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বীজ নিহিত ছিল। ইহা উল্লেখযোগ্য যে কয়েকবৎসর পূর্বে যখন আমি কলিকাতায় বঙ্গদেশের পুরাতন সরকারী দলিলপত্র লইয়া গবেষণা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলাম, তখন আকস্মিকভাবেই কয়েকখানি অপ্রকাশিত দলিল আমার হস্তে পতিত হয়। সেইগুলি পাঠ করিলে দেখা যায় যে, এমনকি 'অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও বঙ্গদেশের তন্তুবায়ীগণ বিভিন্ন সময় যে আন্দোলন করিয়াছিল তাহা বর্তমান কালের ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনেরই অনুরূপ।''

শান্তিপুর, ঢাকার এবং সোনামুখির তন্তুবায়ীদের কথা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। সোনামুখির তাঁতশিল্পীরা ইংরাজদের কাছ হতে 'দাদন' বা 'অ্যাডভান্স' গ্রহণ

করে। লিখিত চুক্তিতে স্বাক্ষরও করেছে যাতে আছে চুক্তির কঠিন শর্তাবলী, বিশেষ নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট মানের বস্ত্রসম্ভার আড়ংয়ে পৌঁছে দেবে। আবার সেই চুক্তি লঙ্ঘন করার উদগ্র বাসনায় প্রাইভেট ট্রেডার্স ও অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদের কাছে উৎপন্ন বস্ত্র সরবরাহ করে যায়। সোনামুখির তাঁত শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে এবং সংগঠিত ভাবেই ইংরাজ কোম্পানীর 'আড়ং' গুলিকে বয়কট করার সিদ্ধান্ত করে। পুরাতনদের ডিঙিয়ে নতুন নতুন তন্তুবায়ীরা এইভাবে ইংরাজদের সঙ্গে পাল্লা দিতে সাহসী হয়েছিল। কোম্পানীর এজেন্ট এবং সোনামুখির রেসিডেন্ট চীপসাহেব চিন্তা করলেন যে, তাঁতশিল্পীদের নায়কদের সঙ্গে সাধারণ তাঁতীদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে পারলেই জোট গঠন করে ইংরেজদের আদেশ বা চুক্তির শর্তাদি অমান্য করার সাহস হবে না। সেই পথেই জন চীপ অগ্রসর হতে থাকে। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে জুলাই জন চীপ সোনারুণ্ডি (বর্তমান কাটোয়া মহকুমার) গ্রামের আড়ংয়ের সঙ্গে রেজিষ্টার্ড তাঁতীদের নায়কদের ওপর অন্যান্য সাধারণ তাঁতীদের কিরূপ প্রভাব প্রতিপত্তি আছে সে সম্পর্কে 'বোর্ড অব ট্রেড' এর নিকট রিপোর্ট পাঠান। রিপোর্টে উল্লেখ করা হলো যে, সোনারুণ্ডি গ্রামের তন্তুবায়ীদের নিয়ন্ত্রণ করে ইজারাদার (Lease holders) এবং গ্রাম্যপ্রধানরা (maundals or village head) ঐ ব্যক্তিগণের কাজ হলো ফ্যাক্টরীর সঙ্গে তাঁতীদের বিরোধ সৃষ্টি করা। গ্রামের মধ্যে পরস্পরে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে বসবাসের ফলে নেতাদেব সঙ্গে সাধারণ শ্রমিকদের যোগাযোগ নিবিড় হওয়ায় রেসিডেণ্টের পক্ষে সেই বন্ধন ছিন্ন করা আদৌ সম্ভব নয়। চীপ জানান যে, অতীতের অত্যাচারের নানান ঘটনা এই আড়ংয়ে তরুণদের সংখ্যা বিশেষত যারা তাঁত বুনবে সেই ধরনের তরুণদের সংখ্যা নিতান্তই স্বল্প। এদের পিতা মাতা অভিভাবকরাও আর কোম্পানীর অধীনে বয়ন কাজ করার শিক্ষা দেয় না তাতে যত কষ্টই হউক না কেন মাঠে চাষের কাজে অংশগ্রহণকেই তারা শ্রেয় বোধ করে।

হরিপাল (Hurripaul) আড়ংয়ে কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট স্যামুয়েল বীচ ক্রফট্ 'বোর্ড অব ট্রেড' কে ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ঐ কেন্দ্রের তাঁত শিল্পীদের মধ্যে 'আইন' অমান্য করার যে সকল ঘটনা ঘটেছে তা সবিস্তারে কারণসহ যে প্রতিবেদন পাঠান তাতে বলা হয়েছিল যে, এরা যা তৈরী করে তা অত্যন্ত সূক্ষ্ম। কিন্তু তাঁতশিল্পীরা সুতা এবং শস্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং দুষ্প্রাপ্যতাব কারণে প্রথমে অতিরিক্ত মূল্য দাবী করে। যা তৈরী করে তা অত্যন্ত সূক্ষ্ম। কিন্তু ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে কোন তাঁতশিল্পী 'দাদন' গ্রহণ করতে রাজী হয়নি। তাদের বক্তব্য তাদের উৎপন্ন বস্ত্রের মূল্য যে হারে দেওয়া হয় তার দ্বারা তাদের কষ্টের কোন লাঘব হয় না। দু তিনটি পাশপাশি গ্রামের তন্তুবায়ীরা একই পথের পথিক হয়। রেসিডেন্ট জানাচ্ছেন এদের যে কোনদিন আর বুঝিয়ে সুঝিয়ে বা জোর খাটিয়ে কোম্পানীর শর্তে বস্ত্র বয়নের কাজে লিপ্ত করানো যাবে আর সম্ভাবনা

প্রায় নেই বললেই চলে। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে হরিপাল আড়ংয়ে কাঁচা সুতার দাম প্রতি তোলায় পাঁচগণ্ডা যা খুবই সস্তা পূর্বের থেকে। ফলতঃ একপিস আদ্দাতি মিডলিং (Addaties) বস্ত্রের (যার মেঝের আয়তন ২১×২১/৪ গজ) জন্য তাঁতীর লোকসান পড়ে টাকায় ছয় আনা। কোসি মিডলিং (Cossaes) বস্ত্রের (যার আয়তন ৪০×৩ গজ) জন্য এক টাকা এক আনা, কোসি কগমারিয়া (যার মেঝে ৪০×২১/২ গজে) র জন্য বারো আনা, হাম্মাম অর্ডিনারী (আয়তন×৩ গজ) বস্ত্রের পিছনে ১০ আনা, হামাম (Hummams) মিডলিং (যার আয়তন ২৪×৩ গজ) আট আনা এইভাবে লোকসানের বহর তাঁতীদের বেড়েই চলে। কিন্তু তাঁত শিল্পীদের মধ্যে আইনজ্ঞ ব্যক্তির অভাবের জন্য অর্থাৎ রেগুলেশন বা আইন না জানার ফলে ব্রিটিশ কোর্টে অবিরাম সোপর্দ হওয়ার ঘটনাও বেড়ে চলে। ফলে নেতৃত্বের বেড়াজাল ভাঙতে ইংরাজদের খুব একটা অসুবিধা হয় না। এ সম্পর্কে ডঃ ডি. বি মিত্রের অভিমত নিম্নরূপ ঃ— Combinations, among the weavers were widespread and to break these combinations the Commercial Residents had to use all possible means in their power. However in almost all cases of such resistance the weavers had evantually to yield'' ('Cotton Weavers in Bengal.' P. 143)

পাটনা ফ্যাক্টরীর অধীন জেহানাবাদ পরগনার তাঁতীদের প্রসঙ্গে আসা যাক। কোম্পানীর কাছে এরা অভিযোগ করে যে তারা বস্ত্রের যা মূল্য পাচ্ছে তার দ্বারা কেবল সুতার দাম ওঠে, শ্রমের কোন মূল্য পাওয়া যায় না। তাঁতীরা দাবী করে জমিদারদের সৃষ্টি সন্ত্রাস-অত্যাচার থেকে তাদেরকে যেন রক্ষা কবচ দেওয়া হয়। তাহলে তারা কোম্পানীকে অনেক বেশি বস্ত্রসম্ভার সরবরাহ করতে পারে।

এই এলাকার তাঁতীরা কোম্পানীর কাছ হতে প্রাপ্ত মূল্য বাবদ টাকায় একআনা অথবা কাঁচামালের দাম ও শ্রমের মূল্যের যোগফলের ৬১/৪ ভাগ লাভ পায়। বহু ক্ষেত্রে কোন লাভই পায় না। বহু ক্ষেত্রে তাঁতীরা 'জার্নিমেন' নিয়োগ না করে নিজের পরিবারের সদস্যদেরই সেই কাজে নিয়োগ করে ব্যয় সঙ্কুলান করে। যদি কোন তাঁতী 'জার্নিমেন' নিয়োগ করে তবে তার জন্য খরচ সুতার দামের সঙ্গেই কোম্পানী কর্তৃপক্ষের কাছে দাবী করে বসে। ইংরাজ কোম্পানীর আড়ংয়ে কাজ করা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ও তাঁতীরা পায় না। কারণ অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদের ও প্রাইভেট ট্রেডারদের কারবারের তখন প্রায় অন্তিম কাল।

'দেউড়ী ট্যাক্স' বন্ধের দাবীতে আন্দোলন ঃ—মালদাতে অবস্থিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ফ্যাক্টরীতে বয়নকার্য যারা করতো তাদের বেশিরভাগেই বসবাস ছিল দিনাজপুর জেলায়। মালদহের ইংরাজ কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট মিঃ জর্জ উদনী একবার

রংপুরের কালেকটার মিঃ রিচার্ড গুডল্যাণ্ডকে এক পত্রে জানাচ্ছেন যে তিনি স্বরূপগঞ্জ আড়ং পরিবদর্শনে গেলে সহস্রাধিক তাঁতী তাঁর কাছে এক ডেপুটেশন দেয়। তাঁতীরা অভিযোগ করে তাদের বলপূর্বক প্রায় দশদিন যাবৎ আটক করে রাখা হয়েছে ঐস্থানে এই জন্য যে, তারা দিনাজপুরের রাজার মৃত্যুজনিত সৎকারের খরচ বাবদ 'দেউড়ী খরচা' (Deury Khurcha) নামে একপ্রকার কর দিতে রাজী হয় নি। এই তাদের অপরাধ। আর এই অপরাধের জন্য মাহনগর (Mahyanuggur) এর নায়েব তাদের ওপর নানাভাবে অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। পরবর্তীকালে কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট চার্লস গ্রান্টয়ের আমলে ঐ 'দেউড়ী খরচা'য় নির্মিত একটি হিন্দুমন্দির বেআইনী রূপে ঘোষিত হয়। যদিও এই 'দেউড়ী খরচা' এর একটা অংশ কোম্পানীও পাবে বাংলার দেওয়ান হিসাবে। গ্রাণ্ট দিনাজপুরের কালেক্টর গুডল্যাণ্ডকে লিখলেন যে, তিনি রাজস্ব আদায়ের খুঁটিনাটি ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চান না কিন্তু 'দেউড়ী খরচা' (ট্যাক্স) একবার যেহেতু আদায় হয়েছে তাই প্রতিবছরই প্রত্যেকের কাছ হতে আদায় করা হবে এবং এটা স্থায়ী ব্যাপার তাই বিষয়টি খুবই অযৌক্তিক এবং বেআইনী নয়।

দেওয়ান দেবীসিংহের নির্মমতা ঃ—বিষয়টি শেষ পর্যন্ত কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট বনাম দিনাজপুরের কালেকটারের মধ্যে পত্রযুদ্ধে পরিণত হলো। দিনাজপুরের নাবালক রাজার ইংরাজ কোম্পানী নিযুক্ত দেওয়ান ছিল দেবী সিংহ। এই ব্যক্তি ভাগ্যান্বেষনে পশ্চিম ভারতের পানিপথ থেকে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হয়ে কোম্পানীর কৃপালাভ করে। দেবী সিংহের মস্তিষ্ক প্রসূত 'দেউড়ী ট্যাক্স' বাবদ জনসাধারণের বিশেষতঃ তাঁতশিল্পীদের কাছ হতে যা আদায় হতো তার একটা ভাগ দিনাজপুরের কালেকটরও পায়। অপর কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট দেখলেন যে তাঁর 'ইনভেস্টমেন্ট' খাতে যে ব্যয় হয় দেবীসিংহের কার্যকলাপের ফলে তাতে ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। কালেকটার রিচার্ড গুড্‌ল্যাণ্ড যখন দেউড়ী ট্যাক্স আদায়ের স্বপক্ষে তখন কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট সম্পূর্ণ বিপক্ষে। কালেকটার বলছেন 'দেউড়ি ট্যাক্স' দিতেই হবে গত বছরের হারে। কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট কালেকটারের অনুমোদনের বিরোধিতা করেন এই অর্থে যে ঐ ট্যাক্স বা কর গভর্ণর জেনারেলের অনুমোদিত নয়। তাছাড়া পূর্ববর্তী বৎসরের আদায় বা জোর জুলুম অব্যাহত থাকবে, এটা হতেই পারে না। রেসিডেন্ট দিনাজপুরের রাজাকে অনুরোধ করেন 'মালগুজারী' ছাড়া অন্য কোন কর আদায় যেন তিনি না করেন। কিন্তু স্বয়ং কালেকটর খারিজ করে দেন রেসিডেন্টের দাবী। কালেকটর দাবী করেন তাঁতীদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে যে কর রাজাকে দিতে হচ্ছে তা হলো 'দিনাজপুরের প্রথা'। এ প্রথা ভাঙ্গা বা অমান্য করা গুরুতর অপরাধ কার্যতঃ রাজাকে অমান্য করা। প্রকৃতপক্ষে এই দাবী দেওয়ান দেবী সিংহের। সেই দাবীর ওপর কালেকটর বাবার ষ্ট্যাম্প মারলেন। দেওয়ান দেবী সিংহ ও কালেকটরের দাবীর স্বপক্ষে যে 'দিনাজপুরের প্রথা'র উল্লেখ করা হয় রেসিডেন্ট চার্লস গ্রাণ্ট তারও প্রতিবাদ

করেন এই জন্য যে, ঐ প্রথা দুর্বলের ওপর সবলের আস্ফালন ছাড়া অন্য কিছু নয়। রাজপরিবারে তো অসংখ্য বিবাহ, জন্ম ও মৃত্যুর ঘটনা ঘটবে আর তার খরচের জন্য হতভাগ্য তাঁতীদের কাছ হতে 'খরচার' নাম করে ট্যাক্স আদায় করা হবে কেন? দিনাজপুরের রাজার পারিবারিক খরচ জনসাধারণের কাছ হতে আদায়ের প্রথাকে বলা হতো 'জুম্মা' কিন্তু 'দেউড়ী খরচা' কে কোন মতেই 'জুম্মা'র সঙ্গে এক ক'রে দেখতে রেসিডেন্ট সম্মত হলেন না।

দেওয়ান দেবীসিংহ খাজনা বা কর আদায়ে জন্য ক্রমশই নৃশংস হয়ে ওঠে। কর এবং খাজনা আদায় করার জন্য হতভাগ্য মানুষদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে সার দিয়ে দাঁড় করানো হত। এরপর শুরু হতো বেত্রাঘাত, রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত হতভাগ্য লোককে অবশেষে নিক্ষেপ করা হতো কারাগারে। উত্তরবঙ্গ প্রায় মহাশ্মশানে পরিণত হলো। যারা বেঁচে রইলো তাদের কাছ হতে দেবী সিংহ আর দলবল দিনাজপুর, রংপুরের কালেকটরগণের সহায়তায় কর আদায়ের কাজ অব্যাহত রাখলো।

কৃষক এবং তন্তুবায়ীগণ দেবীসিংহের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার আশায় দেশীয় মহাজনদের দ্বারস্থ হয়। মহাজনদের কাছে নিজেদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে অর্থ সংগ্রহ করে দেবী সিংহের চাপানো কর মিটিয়ে দিতে থাকে। মহাজনরা এই সুযোগ হাতছাড়া করেনি, তারাই ঋণের ওপর সুদের হিসাব কষতে থাকে চক্রবৃদ্ধি হারে। সুদই মেটানো অসম্ভব হয়ে পড়ে সাধারণ মানুষের পক্ষে তো আসল পরের কথা। তাঁতীরা তাঁত বিক্রয় করে দিয়ে কর্মহীন হয়ে পড়লো, কৃষকরা জমিহারা হলো। মানুষ পথে পথে ঘুরতে লাগলো ভিটাচ্যুত হয়ে। পিতা পুত্রকে বিক্রয় করে, স্বামী স্ত্রীকে বিসর্জন দেয়। দিনাজপুরের রাজা আর দেওয়ান দেবী সিংহের কর্মচারীরা অবাধে হতভাগ্যদের স্ত্রী কন্যার ওপর পাশবিক অত্যাচার চালিয়ে যায়। চক্ষুর সম্মুখে মানুষ তার নিজগৃহ ভস্মীভূত হতে দেখে পাগল হয়ে যায়। অবশেষে অত্যাচারিত শ্রেণীর মানুষগুলো ঘুরে দাঁড়িয়ে যায় ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে। দেবী সিংহ, দিনাজপুরের রাজা ও ইংরাজ কালেকটরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিল। দিনাজপুর, রংপুর, মালদহ, কোচবিহার সর্বত্র হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে কৃষক ও তন্তুবায়ীগণ ঐক্যবদ্ধভাবে দেবী সিংহের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করলো। প্রকাশ্যে জনসাধারণের 'নবাব' নূরুলউদ্দীন বিদ্রোহ পরিচালনা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 'দেউড়ীখরচা'র পরিবর্তে বিদ্রোহ পরিচালনায় অর্থব্যয় সঙ্কুলানের জন্য ধার্য হলো 'ডিংখরচা'।

এই বিদ্রোহের অনিবার্য পরিণতিতে এলাকার নায়েব, দেওয়ানরা নিহত অথবা বিতাড়িত হয়। এক জমিদারের প্রাণহানি ঘটে। দেবীসিংহের যে সমস্ত কর্মচারী অত্যাচার চালাতো তাদের অনেকেরই জীবনান্ত ঘটে।

ক্ষিপ্ত দেবীসিংহ রংপুর ও দিনাজপুরের কালেকটার রিচার্ড গুডল্যাণ্ডের শরণাপন্ন হলে কালেকটারের আদেশে বিরাট সৈন্য ও পুলিশবাহিনী নিয়ে লেফ্‌টন্যান্ট ম্যাকডোনাল্ড ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী ভোরে বিদ্রোহীদের সমাবেশে গুলিবর্ষণ শুরু করে। আকস্মিক আক্রমণে হতচকিত বিদ্রোহীরা পাল্টা আক্রমণ শুরু করলে গুডল্যাণ্ডের বাহিনী সাময়িক পশ্চাদপসারণ করতে বাধ্য হয়। অনেক সৈন্য ও পুলিশ বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হয়। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে সুদক্ষ অমিত বিক্রমশালী আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রে সুসজ্জিত ইংরাজবাহিনীর কাছে বিদ্রোহীরা পিছু হঠতে বাধ্য হয়। বিদ্রোহীরা চূড়ান্তভাবে পরাজয়বরণ করলে পৈশাচিক তাণ্ডবে মেতে ওঠে ইংরাজ ও দেবীসিংহের মিলিত বাহিনী। দেবীসিংহ প্রজাদের ওপর নির্ম্মম অত্যাচার চালিয়ে প্রায় সত্তর লাখ টাকা সংগ্রহ করে কলকাতায় কোম্পানী কর্তৃপক্ষের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে হাজির হয়। কোম্পানী নিযুক্ত তদন্ত কমিটি দেবী সিংহ এবং গুড্‌ল্যাণ্ডকে সম্পূর্ণ নির্দোষ সার্টিফিকেট দিয়ে বিদ্রোহীদের 'দস্যু' 'ডাকাত সর্দার' ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করে।

ইংলণ্ডের পার্লামেন্টে ওয়ারেন হেস্টিংসের বিচার পর্বে বিখ্যাত বাগ্মী এডমণ্ড বার্ক রংপুর ও দিনাজপুরে দেবী সিংহের অত্যাচারের বিবরণ পেশ করতে গিয়ে এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি সেদিন আর বক্তৃতাই করতে পারেননি। ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃপক্ষ ছিল অত্যাচারী দেবী সিংহের প্রত্যক্ষ মদতদাতা এবং সাহায্যকারী।

এই সশস্ত্র বিদ্রোহের ফলশ্রুতিতে দেবীসিংহ প্রজাদের কাছ হতে তারপর আর কোন কর আদায় তো করতেই পারেনি, উল্টে তাঁতীদের ওপর চাপানো 'দেউড়ী খরচা' বা ট্যাক্স আদায় বন্ধ করতে বাধ্য হয় এবং যা আদায় হয়েছিল তা প্রত্যার্পনে সম্মত হয়।

(Ref. Rungpore District Records. Vol-II Page. 211-12)

কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট বনাম কালেকটারের বিরোধ ঃ—তবে শত্রু চুপ করে বসে থাকার পাত্র নয়। দিনাজপুরের কালেকটার রিচার্ড গুডল্যাণ্ড কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট জর্জ উদনীকে লিখিতভাবে জানান যে বেছে বেছে তাঁতীদের জমিজিরেত যা ব্যক্তিগত ভোগ দখলে আছে তা মাপা হবে এবং যে সমস্ত রায়ত তাঁতী নয় তারা যে হারে কোম্পানী ও রাজাকে কর দেয় আনুপাতিক ভিত্তিতে সেই হারে ধার্য করের পুনর্বিন্যাস করে নতুন কর ধার্য করা হবে। জর্জ উদনী অবশ্য কালেকটারের এই সিদ্ধান্তে দ্বিমত পোষণ করেন এবং কালেকটারকে স্পষ্টভাবে এই অভিমত জানিয়ে দেন যে, নতুন এই পদ্ধতি চালু করলে তন্তুবায়ীদের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হতে পারে। উদনীর এই আপত্তির ফলে সাময়িকভাবে কর পুনর্বিন্যাসের বা নির্ধারনের কাজ স্থগিত রাখতে হয়। কিন্তু তাঁতীরা

যে জমি জিরেত ভোগদখল করে তা জরিপের কাজ শেষ করা হয়। কোম্পানীর স্বার্থ অন্যদিকে বিঘ্নিত হবে উদনীর চিন্তা ছিল। মসলিন বস্ত্রের জন্য যে লগ্নী কোম্পানী 'দাদন' হিসাবে তাঁতীদের অগ্রিম দেয় তা লাভের আকারে হয়তো উঠে আসবে না ফলতঃ, বস্ত্রবয়নকার্যের গতি ব্যাহত হবে।

কিন্তু দিনাজপুরের রাজা ও দেওয়ান দেবী সিংহের কাছ হতে উৎকোচগ্রহণকারী কালেকটর কিছুকাল নিষ্ক্রীয় থাকার পর আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে। তাঁতীদের কাছ হতে বলপূর্বক পুনর্নির্ধারিত কর অন্যান্যদের সঙ্গে সমান ক'রে দিয়ে আদায় করতে থাকে। বিভিন্ন 'আড়ং' থেকে তন্তুবায়ীরা রেসিডেন্টের কাছে উপস্থিত হয়ে নালিশ করে এই মর্মে যে, তাদেরকে জমির নতুন পাট্টা (Pottah) নিতে হয়েছে এবং তাদের কর যা ছাড় ছিল তা বাতিল করে অন্যান্য রায়তদের সঙ্গে সমান হারে আদায় করা হয়েছে। তন্তুবায়ীরা বর্ধিত হারে নির্ধারিত কর দিতে আদৌ রাজী নয়। তাঁতীদের প্রতিবাদের ঝড় দিনাজপুরে কালেকটরেটে আছড়ে পড়ে।

১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ শে জুলাই গভর্ণর জেনারেল-ইন কাউন্সিল রেগুলেশন পাশ করে এই মর্মে যে, তাদের পাট্টাতে যে কর ধার্য আছে তার বেশি কোন কর তাঁতীদের দিতে হবে না। জমিদার, জোতদার বা কালেকটর কোন কারণেই এক তরফা কোন কর তাঁতীদের ওপর ধার্য করতে পারবে না।

এই রেগুলেশনের ধাক্কায় কিছুটা ফল হয়। অবশ্যই তা ইতিবাচক। তন্তুবায়ীদের ওপর নানানধরনের করের বোঝা (abwabs) যা অপরাপর রায়তদের কাছ হতে আদায় করা হয় তা বন্ধ হয়ে যায়। রেসিডেন্টের যুক্তি ছিল যে তাঁতীদের ঘর বা বাসস্থান তো নির্দিষ্ট এবং কোম্পানীর কাছে গচ্ছিত। ইচ্ছা করলেই তাঁতীরা স্বাধীনভাবে অন্যত্র বসবাস করতে পারবে না। তাদের তো দাদন নেওয়া আছে। 'ইনভেস্টমেন্ট' যা হতো যদি সুদে আসলে চক্রবৃদ্ধিহার উশুল করে নেওয়া না যায় তবে তো কোম্পানীর ক্ষতি হয়ে যাবে। তাঁতীদের নির্দিষ্ট স্থানে স্থায়ী বসবাসের জন্য জমিদারদেরও তো লাভ হওয়ার কথা। কারণ, তারা তাদের প্রাপ্য খাজনা নির্দিষ্ট হারে তাঁতীদের কাছ হতে সহজেই আদায় করতে পারে। কাজেই এদের ব্যাপারে কিছুটা শিথিলতা দেওয়া যেতেই পারে। রেসিঃ উদনীর আরও জোরালো বক্তব্য এই যে তাঁতীদের ওপর কর বা খাজনার বোঝার বৃদ্ধি ঘটলে ওরা বিক্ষুব্ধ হয়ে কোম্পানীর স্বার্থে বয়নকার্যই বন্ধ করে দেবে, যে উন্নত মানের বস্ত্রের প্রয়োজন তাও পাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠবে।

উদনী লড়ে যাচ্ছেন দিনাজপুরের রাজা, জমিদার, দেওয়ান, কলেকটারের সঙ্গে, নিজের স্বার্থে নয়। কোম্পানীর স্বার্থ সুরক্ষিত করতে তাঁতীদের স্বার্থের সপক্ষেও তাঁর ভূমিকা শীতলতম। কিন্তু কিছুই করতে পারছেন না বা এঁটে উঠতে পারেননি। তাঁর কাছে বিভিন্ন আড়ং থেকে পুনরায় তাঁতীরা অভিযোগ জানাতে আসে যে, তাদের কাছ থেকে কর এবং খাজনা আদায়ের জন্য জোর জুলুম সমানে চলেছে, অত্যাচার সহ্যের সীমা লঙ্ঘন করছে। কালেকটাররা গভর্নর জেনারেল ঘোষিত রেগুলেশনের তোয়াক্কা না করে খাজনা বা করের জন্য তাঁতীদেরকে আটক করা হচ্ছে, জেল-জরিমানা আদায় করা হচ্ছে। কোম্পানীর কাছে রেজিষ্টার্ড নম্বরযুক্ত তাঁতীরা জেলখানার নম্বরযুক্ত সাজা প্রাপ্ত আসামীর মতো দীন দরিদ্র শতছিন্ন শীর্ণকায় বেশে ঘুরে বেড়ায়। উদনী আর গুডল্যাণ্ড উভয়েই ইংরাজ এবং উপনিবেশবাদী সাম্রাজ্যবাদী, উভয়ের উদ্দেশ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্বার্থ এদেশে রক্ষা করা। উভয়েই অত্যাচারী তথাপি দেখা যাচ্ছে উভয়ের লক্ষ্য এক হলেও পথ ছিল ভিন্ন। উদনী যে আড়ংগুলোয় বসে তাঁতীদের কাছ হতে রেগুলেশন অনুযায়ী বস্ত্র উৎপন্ন করা হয়েছে কিনা পরীক্ষা করে অত্যন্ত কম মূল্যে নানাপ্রকার প্রতারনার সাহায্যে বেয়াদপ তাঁতীকে পিটিয়ে রক্তাক্ত করে ছাড়তো, আর সেই পথও নির্মম রক্তাক্ত হতো, পথে হতভাগ্য তাঁতীর মৃতদেহ ফাঁসীতে ঝুলতো। গুডল্যাণ্ড তাঁতীদের বিক্ষোভ আর বেয়াদপীর আঁচ পেয়ে উৎপীড়ন করার নিজস্ব পথ খুঁজে নিয়েছিল। সে হাঁটতো অন্যপথ দিয়ে তবে সে পথের আকার-আকৃতি একই প্রকার ছিল।

তাঁতীদের তাঁত বস্ত্র বয়ন ব্যতীত অন্য কোন কাজ জানা ছিল না। আর 'রেগুলেশন' এর খাঁড়া তোলা থাকায় চাষের কাজে নামার অধিকারও ছিল না। পুরুষানুক্রমে যারা তাঁতবস্ত্র বয়নের কাজ নৈপুণ্যের সঙ্গে সমাধা করে এসেছে তারা অনেকে শত অত্যাচারেও পূর্বপুরুষের পেশা পরিত্যাগ করতে ইচ্ছুক ছিল না। যদিও অনেকে আবার অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে এই পেশা যাবজ্জীবন পরিত্যাগ করার বাসনায় অদম্য থেকে নিজেদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নিজেরাই কেটে ফেলে দিয়েছে। আবার অন্য ইউরোপীয় কোম্পানী বা প্রাইভেট ট্রেডার্সদের কাছে অধিক মূল্য প্রাপ্তির আশায় তাঁতীরা যাতে গোপনে যোগাযোগ করতে না পারে বা সাহস না করে বা কোম্পানীর কাছ হতে নেওয়া 'দাদন' গ্রহণের শর্তাবলী অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয় যাতে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী বস্ত্র সরবরাহে তাঁতী বাধ্য হয় সেজন্য উডল্যাণ্ড, গুডল্যাণ্ড, উদনী, ফ্রেচার, ব্রীটক্রফট ট্রেচারদের পক্ষ থেকেও বেআদপ বিদ্রোহী তাঁতীর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কেটে ফেলে দিয়ে তাঁতীকে যাবজ্জীবন কর্মহীন ভিক্ষুকে পরিণত করে তাঁতীদের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টা করতো। জেল-জরিমানা-রক্তাক্ত করার ঘটনা তো ছিল আকছার।

অন্য ইউরোপীয় প্রাইভেট ট্রেডারদের সঙ্গে বিরোধ ঃ— বাংলায় মসলিন যুদ্ধের ময়দানে ইংরাজদের একচেটিয়া অধিকারের সঙ্গে অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তি এবং এদেশীয় প্রাইভেট ট্রেডারদের বারেবারে সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু কেন এই বিরোধ। ইতিপূর্বে ওলন্দাজদের সঙ্গে তাঁতীদেরকে ভাগ বাঁটোয়ারা করা নিয়ে একটা মীমাংসায় ইংরাজরা উপনীত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তারপরও বারে বারে ঐ একই ওলন্দাজ এবং ফরাসী, দিনেমার, এশীয় আর্মেনীয়, পর্তুগীজ প্রভৃতি শক্তি গুলোর ব্যবসা নিয়ন্ত্রন করতে ইংরাজ কোম্পানীকে লড়াইয়ে নামতে হয়েছে। এদেশে বস্ত্র ব্যবসায়ের ওপর একচেটিয়া অধিকার কায়েম রাখতে ইংরাজরা শেষপর্যন্ত রাষ্ট্রক্ষমতা প্রয়োগ করেছে যার ফল হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের আগমনের পূর্বেই এদেশের তাঁতবস্ত্র শিল্পকে ধ্বংসের পথে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

ওলন্দাজ, ফরাসী ইত্যাদি ইউরোপীয় কোম্পানীগুলির শক্তি বৃদ্ধি হয়েছিল আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে গ্রেট ব্রিটেনের পরাজয়ের ফলে। তার ওপর মসলিন বস্ত্র প্রস্তুতকারক তাঁতীদেরকে প্রলুব্ধ করার জন্য উৎপন্ন বস্ত্রের জন্য ইংরাজরা যে মূল্য দিত তার থেকে কোন কোন ক্ষেত্রে এরা শতকরা চল্লিশভাগ বেশি মূল্য দিত। তাছাড়া অত্যাচারের মাত্রার দিক থেকে ইংরাজদের তুলনায় তারা ছিল অনেক নমনীয়। ইংরাজরা তাঁতীদেরকে একটা সুবিধা দিত। তাঁতীকে বস্ত্র উৎপন্ন হওয়ার বহুপূর্বেই 'অ্যাডভান্স' দিয়ে দিত। এটা অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানী বা প্রাইভেট ট্রেডারদের পক্ষে সর্বদা সম্ভব হতো না। আবার ইংরাজরা যে 'অ্যাডভান্স' করতো অনেকসময় তাও সুদহীন ছিল। কিন্তু রাজা জমিদার এবং কালেকটাররা ইংরাজ কোম্পানী কর্তৃক রেজিষ্ট্রীকৃত তাঁতীদের কাছ হতে বৃত্তিকর (Professional tax) আদায় করতো এবং অত্যন্ত চড়া হারেই তা আদায় করা হতো। এরসঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বর্ধিত হারে জমির খাজনার বোঝা।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বস্ত্র বাণিজ্য থেকে যে বিদেশী স্বর্ণমুদ্রা আমদানী হতো তাতে যাতে ঘাটতি না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রেখে ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে পরপর কয়েকটি নিয়ন্ত্রনমূলক ধারা সংযোগে গর্ভণরজেনারেল কর্তৃক 'রেগুলেশন' পাশ করানো হয়। যেমন তার আট নম্বব ধারায় ছিল যে, কালেকটার তন্তুবায়ীদের কাছ হতে 'বৃত্তিকর' আদায় করবে বাংলা গত ১১৭৯ সালের হারে। জমিদার, জোতদার বা কালেকটার খুশিমতো তাঁতীদের কাছ হতে কর আদায় করবে না। 'নয় নম্বর' ধারা বলা হয়েছিল কোন গোমস্তা, অথবা কোন কর্মচারী বা তাঁতী যারা কোম্পানী দ্বারা নিযুক্ত তাদের ওপর জমিদার কোনো রাজস্ব আরোপ, পিয়ন নিয়োগ করতে পারবে না বা তাদের কাছারীতে আনতে সমনজারী

করতে পারবে না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তন্তুবায়ীরা জমিদার, রাজা বা ইংরাজ কালেকটারের অত্যাচারের হাত থেকে অব্যাহতি পায়নি। বৃত্তিকর ও রাজস্ব আদায়ের প্রচণ্ড চাপ অব্যাহত ছিল। বিশেষতঃ 'ডিফলটার' তাঁতীদের জমিজিরেত ভিটা বাজেয়াপ্ত করার হুকুম জারী হতে বহু তাঁতী একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে তাঁত বস্ত্র বুনন পরিত্যাগ করে অপরের জমিতে জনমজুর খাটতে আরম্ভ করলো।

মিঃ উদনী, রেসিডেন্ট অব্ মালদহ, ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে দিনাজপুরের তৎকালীন কালেকটার মিঃ হ্যাচকে এক পত্রে জানান যে সৌমগঞ্জে (Saumgunge) হাঙ্গামা শুরু হয়েছে। আড়ংয়ের তাঁতীদের পিয়ন পাঠিয়ে ধরে আনা হচ্ছে কাছারীতে, তাদের উৎপন্ন বস্ত্র কেটে নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে, তাদের প্রহার কবা হচ্ছে এবং বর্ধিত কর দিতে বাধ্য করা হচ্ছে যদিও তারা পাট্টায় নির্দিষ্ট ধার্য কর মিটিয়ে দিয়েছে। উদনীর চিঠির ভাষা কিয়দংশ নিম্নরূপ ঃ—"all is uproar, weavers are carried away by the peons, confined, cloths cut off from their backs; they are beaten and forced to give the excessive rent demanded of them, notwithstanding they have regularly paid or are ready to pay the just amount of their Pottahs. They have deserted their houses"

(Dinajpore District Records, vol I, P 94)

অবশ্য উদনীর এই পদক্ষেপের ফলে তন্তুবায়ীদের ওপর নিপীড়ন কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল। উদনীর উদ্দেশ্য উপনিবেশবাদীদের স্বার্থ সুবক্ষা হলেও তাঁতীরা জমিদার, তালুকদার, রাজাদের অত্যাচারের হাত থেকে কিছুটা রিলিফ পেয়েছিল, তবে তাঁতীবা পরিণত হয়েছিল নামহীন নম্বরযুক্ত তাঁতবিহীন তাঁতশ্রমিকে।

প্রাইভেট ট্রেডার্স ঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও অন্যান্য বিদেশী কোম্পানীগুলির ভারতের মাটীতে পা দেওয়ার পর কোম্পানীগুলির কর্মচারীরাও সুতি ও মসলিন বস্ত্রের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে নেমে পড়ে। কেহ কেহ মনে করেন স্বল্প বেতনের জন্যই কোম্পানীর কর্মচারী ভয়ঙ্কর দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তাছাড়া বেতন কম সম্ভবতঃ এই কারণেই কোম্পানী তার কর্মচারীদের এই অবৈধ কাজে নিষেধাজ্ঞা জারী করেনি। এদেরই বলা হয় 'প্রাইভেট ট্রেডারস্'। পরবর্তীকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ব্যতীত অন্যান্য কোম্পানীগুলি মৃতপ্রায় হয়ে পড়লে কেবল ইংরাজরাই 'প্রাইভেট ট্রেড'য়ে আত্মনিয়োগ করে। আর প্রাইভেট ট্রেডারের ভূমিকা গ্রহণ করে তারা নিয়মিত ভাবে প্রচুর মুনাফা অর্জন করতে থাকে। কোম্পানী তার তালিকাভুক্ত রেজিষ্ট্রিকৃত এবং নম্বরযুক্ত তাঁত শ্রমিকদের কাছ হতে আগাম

'দাদন' দেওয়ার বিনিময়ে যে মূল্যবান বস্ত্রসম্ভার যে মূল্যে সংগ্রহ করতো 'প্রাইভেট ট্রেডারস্'রা তার থেকে অধিকতর মূল্য দিয়ে সেই একই বস্ত্র সংগ্রহ করতো। ফলে কোম্পানীর ব্যবসায় প্রচুর লোকসান হতো।

ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে আসতে অনিচ্ছুকের সংখ্যা ইংলণ্ডে ক্রমশঃ বেড়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়ে কোম্পানী তাদের দেশের যুবকদের এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে এদেশে নিয়ে আসে যে, তারা এদেশে থাকাকালীন স্বাধীনভাবে প্রাইভেটে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতে পারবে এবং কোম্পানীর অধিকারের মতোই তারা তা বিনা শুল্কে চালাবে।

কোম্পানীর কর্মচারীরা এদেশের মাটীতে 'প্রাইভেট ট্রেডিং' চালাতে গিয়ে দ্রুত নৈতিকতাবোধ হারাতে বসে। ব্যক্তিগত ব্যবসা শেষ পর্যন্ত এমন এক পর্যায়ে উপস্থিত হয় যে কোম্পানী গভর্ণর জেনারেলের মাধ্যমে 'প্রাইভেট ট্রেডিং' বেআইনী ঘোষণা করে।

'প্রাইভেট ট্রেড' এর পিছনে আরও কিছু ইতিহাস আছে। ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে মুঘলবাদশাহ ফারুখ শিয়ার প্রথম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে এক 'ফরমান' বলে এদেশের বুকে বিনাশুল্কে ব্যবসা করবার ছাড় পত্র দেন। 'ফরমান' অনুসারে কোন পণ্য নিয়ে বিনা শুল্কে এদেশে ব্যবসা করতে হলে ইংরাজ অধিকর্তার কাছ হতে 'ছাড়পত্র' সংগ্রহ করতে হবে। একে বলা হতো 'দস্তক'। 'দস্তক' বা ছাড়পত্র মিললে সেই সকল পণ্য অবাধে দেশের মধ্যে চলাচল করতে পারবে। গোলমাল শুরু হলো যখন ইংরাজ কর্মচারীরাও এই সুযোগ গ্রহণ করে বিনাশুল্কে ব্যক্তিগত ব্যবসা আরম্ভ করে। এতে এদেশীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারী স্তরের বণিকরাও ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। 'প্রাইভেট ট্রেড' আইন বলে উৎপাদক তন্তুবায়ীদের কাছ হতে মহাজন 'প্রাইভেট ট্রেডার'রা সরাসরি পণ্য ক্রয়বিক্রয় করতে পারতো। বাংলার নবার মীরকাশিম কোম্পানীর এজেন্টের কাছে অভিযোগ জানান যে, কোম্পানীর কর্মচারীরা 'প্রাইভেট ট্রেড' নিয়ে এত মগ্ন যে, তারা কোন পণ্য বাজারদরের চেয়ে এক চতুর্থাংশ কম মূল্যে ক্রয় করে আবার সেই একই পণ্য বিক্রয় করার সময় রায়তদের কাছ হতে অনেক বেশি অর্থ দাবী করছে। ইংরাজ রাজকর্মচারীরা যখন এই ব্যবসায়ে ফুলে ফেঁপে উঠছিল তখন অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানীর কর্মচারীরাও একই পথে প্রলুব্ধ হওয়ায় নবাবের রাজস্বতহবিলে আদায়ও সংকুচিত হয়ে পড়ে। নবাব ইংরাজ কোম্পানীর তৎকালীন গভর্ণর বা অধিকর্তার কাছে 'প্রাইভেট ব্যবসা' বন্ধ করার দাবী জানালে প্রত্যাখ্যাত হন। তখন যুদ্ধে ইংরাজদিগকে পরাস্ত করে দেশীয়ব্যক্তিদের ব্যবসা এবং রাজস্ব আদায়ে মীরকাশিম কৃতসংকল্প হন (১৭৬৪ খ্রী)। পলাশীযুদ্ধের পর নবাব মীরকাশিমও বকসাবের যুদ্ধে চূড়ান্ত ভাবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সামরিক শক্তির কাছে

পরাস্ত হলে দিল্লীর পুতুল মুঘল বাদশাহ শাহ আলমের কাছ হতে বকসার যুদ্ধে পরাজয়ের পরবৎসর অর্থাৎ ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট ক্লাইভ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার 'দেওয়ানি' ভার গ্রহণ করেন।

'প্রাইভেট ট্রেড' বাংলার অর্থনীতিকে ধ্বংসের মুখে টেনে নিয়ে যায়। 'প্রাইভেট ট্রেডার্স'দের দাপটে বাংলার কৃষকরা সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে। তন্তুবায়ীরা তাঁতবিহীন তাঁতশ্রমিকে পরিণত হয়। বাংলার রাজস্বে প্রবল ঘাটতি পড়ে। লর্ড রবার্ট ক্লাইভ ছিলেন প্রাইভেট ব্যবসার উদোক্তা। তিনি 'প্রাইভেট ট্রেডার্স'দের নিয়ে বাংলায় গঠন করেছিলেন 'সোসাইটি ফর ট্রেড' বাংলার বুকে যাদের কয়েকটি একচেটিয়া অধিকার কায়েম হয়। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে মন্বন্তর সৃষ্টির অন্যতম কারণ ছিল কোম্পানীর কর্মচারীদের 'প্রাইভেট ট্রেডিং'। তাঁতবস্ত্র (মসলিন, সুতি এবং রেশম) এবং খাদ্য শস্যের ব্যবসার ওপর ছিল প্রাইভেট ট্রেডারস্‌দের একচেটিয়া অধিকার এবং যথেচ্ছাচার।

এডমণ্ড বার্কের ভূমিকা ঃ— বাংলার তাঁতশ্রমিকদের ওপর ইংরাজ রেসিডেন্ট, গোমস্তা, দারোগা এমনকি পিয়নরা কিরূপ নিষ্ঠুর বর্বরতম দৈহিক অত্যাচার করতো তার বিশদ বিবরণ ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষে একটানা কয়েকদিন বক্তৃতার মাধ্যমে ব্রিটিশজাতির নিকট তুলে ধরেছিলেন বিশিষ্ট বাগ্মী দক্ষ পার্লামেন্টোরিয়ান এডমন্ড বার্ক। বক্তৃতায় তিনি যখন অত্যাচারের খুঁটিনাটি বিবরণ সভার মাঝে তুলে ধরছিলেন তখন লেডি সেরিডন নিজেই বিহ্বল হয়ে পড়েন। তিনি অচৈতন্য প্রায় হয়ে যাওয়ায় একসময় বার্ক বক্তৃতা বন্ধ রাখতে বাধ্য হন। পার্লামেন্টে তখন ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের বিচার-প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে (Impeachment of Warren Hastings) হেস্টিংসের আমলেই ঘটেছিল একদিকে মন্বন্তর, অন্যদিকে কৃষকদের ও তাঁতীদের ওপর অকথ্য নির্যাতন। যার ফলে বহুকৃষক ও তাঁতীপরিবার দেশ ও ভিটার মায়া ত্যাগ করে দুমুঠো অন্নের আশায় নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। এদের জমি-জিরেত-ভিটা সমস্ত হাতছাড়া হয়ে যায়। বার্ক তাঁর বক্তৃতার পঞ্চম দিনে ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী ওয়ারেন হেস্টিংয়ের আমলে নিষ্ঠুরতার কীর্তিকলাপ পার্লামেন্টে ফাঁস করে দিয়ে বলেন যে, শিল্পীদের আঙ্গুলগুলি চিরতরে নষ্ট হয়ে যেতো। আঙ্গুলগুলিতে দড়ি জড়ানো হতো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে এমন নিষ্ঠুরভাবে যে আঙ্গুলের মাংসপেশী এক জায়গায়

জড়ো হয়ে যেতো। হাতের মাংসপেশীও পিণ্ডাকারে দৃঢ় সংলগ্ন একত্রিত হয়ে যেতো হাতের চেটো এবং আঙ্গুলগুলি চিরতরে নষ্ট হয়ে যেতো। সংলগ্ন হাতের অঙ্গুলিদ্বয়ের ফাঁকে ফাঁকে কাঠ অথবা লোহা বিদ্ধ করতো, যন্ত্রণায় ছটফট করতো শিল্পী একেবারে পাঁঠা কাটার মতো। তাঁতীর আর্ত চীৎকারে কুঠিয়ালরা, গোমস্তারা, জমিদাররা উল্লাস প্রকাশ করতো। হতভাগ্য নিঃস্ব শারীরিকভাবে দুর্বল তাঁতশ্রমিক চিরদিনের জন্য বিকলাঙ্গ জীবন যাপন করতে বাধ্য হতো। হাতগুলো চিরতরে এমনভাবে নষ্ট করে দেওয়া হতো যে তারা আর জীবনে কখনও স্বহস্তে অন্নজল মুখে তুলতে পারতো না।

বার্ক তাঁর অভিযোগে বলেন যে গ্রামে প্রকাশ্য স্থানে দুজন শ্রমিককে একসঙ্গে বাঁধা হতো। তাদের দুই দুই একত্রে চারটি হাত এবং চারটি পা পিঠোপিঠি বাঁধা হতো ভীষণ শক্ত দড়ির সাহায্যে। একটি ঝুলন্ত লোহাদণ্ডের সঙ্গে তাঁতীর একজোড়া পা দড়ির বন্ধন দিয়ে মাথা নীচের দিকে পা উপর দিকে এরূপ অবস্থায় পায়ের চেটোয় ক্রমাগত আঘাত করা হতো পেরেক ঠোকা হতো। যতক্ষণ না বিদ্ধ পেরেকগুলো পায়ের মাংস-চর্ম ভেদ করে অতঃপর বার হয়ে আসতো ততক্ষণ পায়ের চেটোয় ক্রমাগত আঘাত করা হতো। এর ফলে তাঁতীর জিভ ঝুলে পড়তো। চোখে মুখ নাখ দিয়ে ক্রমাগত রক্ত ক্ষরণ হতো। জ্ঞান হারিয়ে মাথাটাই ঝুলে পড়তো। কাঁটা সমেত বেলগাছের ডাঁটার বেত তৈয়ারী করে তা দিয়ে পায়ের চেটোয় ক্রমাগত আঘাত করা হতো। চামড়াসমেত মাংস বের হয়ে আসতো। বিচুটি গাছের ডাল পাতা দিয়ে এমন প্রহার করা হতো যার ফলে পুঁজরক্ত জমে 'গ্যাংরিন' হয়ে যেতো। শ্রমজীবি মানুষগুলোর হতভাগ্য জীবনের ঐখানেই পরিসমাপ্তি ঘটতো।

পাশবিক অত্যাচারের এই খানেই শেষ নয়। শীতের রাত্রে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে তাঁতীকে জলে ফেলে রাখা হতো দীর্ঘক্ষণ। হয়তো দমবন্ধ হয়ে তাতেই তার ভবলীলা সাঙ্গ হতো। কারাগারে আবদ্ধ করে রাখা হতো অনেককে। কারাগারের অভ্যন্তরে প্রত্যুষে সন্ধ্যায় চাবুক মারা হতো নিয়মিত করে। তাঁতীকে লোহার রড বা বেড়ি পরিয়ে রাখা হতো। যেন ওরা কোন যুদ্ধে পরাজিত সৈনিকের দল।

ওয়ারেন হেস্টিংসের আদেশে গ্রামে শ্রমজীবি মানুষদের ওপর কিরূপ ভয়ঙ্কর অত্যাচার চালানো হয়েছিল তার বিবরণ পেশ করে বার্ক বলেন যে পিতা ও পুত্রকে মুখোমুখি করে বেঁধে এমন ভাবে উভয়কে প্রহার করা হতো যে জ্ঞান হারিয়ে পিতা পুত্রের গাত্রে, পুত্র পিতার গাত্রে পড়ে থাকতো। উভয়েই তখন অজ্ঞান অবস্থায়। গোমস্তা, দারোগা, পিয়ন, সিপাইরা এমনভাবে প্রহার করতো যেন একটা মারও বৃথা না যায়।

স্বামীর কাছ হতে স্ত্রীকে কেড়ে নিয়ে বিবস্ত্রা করে প্রকাশ্যে ঘোরানো হত। হেস্টিংয়ের আমলে এই ভাবে মানুষের স্বাধীনতাকে কবরে পাঠানো হয়েছিল। হতভাগ্য তাঁত শ্রমিকদের অপরাধ তারা হয়তো ইংরাজ বেনিয়াদেরকে উৎপন্ন বস্ত্র না দিয়ে কোন প্রাইভেট ট্রেডারের কাছে অথবা অন্য ইউরোপীয় বণিকের কাছে বস্ত্র সরবরাহ করেছে অথবা বৈশিষ্ট্যে কিছুটা খামতি ঘটেছে অথবা বৃত্তিকর দেওয়া হবে না বলেছে, এমন কতক অভিযোগ তুলে তাঁতীর প্রাণান্ত ঘটিয়ে দেওয়া হতো। এই একই ভাবে শিল্পটিকেও জাহান্নমে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা পাকা করা হয়েছিল। বার্ক অভিযোগ করেন এই মর্মে যে হেস্টিংস এবং তাঁর সরকারের কর্মচারীদের অত্যাচারে পারিবারিক বন্ধনগুলো, তার মানবিক দিকগুলো শুষ্ক হয়ে যায়। খাজনা ও করের জন্য আদায়কারীরা এমন জুলুম করতো যে পিতা তার সন্তানদের, স্বামী তার প্রিয়তমা স্ত্রীকে বাজারে এনে বিক্রী করে দিতে বাধ্য হতো। সুকুমারমতি কিশোরদের স্নেহের আবেদনমূলক সম্পর্কগুলো পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে গেছলো।

হেস্টিংসের সম্পর্কে এডমণ্ড বার্কের অভিযোগ ছিল যে তিনি ছিলেন ঘুষখোর। হেস্টিংসের অপরাধ সম্পর্কে গঠিত তদন্ত কমিশনার মিঃ পিটারসন ঐ সময়ে ভারতীয়দের ওপর জঘন্য বর্বরতার যে সাক্ষ্য প্রমাণাদি পেয়েছিলেন তার নজীর বাগ্মী বার্ক তাঁর বক্তৃতায় পার্লামেন্টের সদস্যদের সম্মুখে তুলে ধরেছিলেন। প্রধানতঃ রংপুর এবং দিনাজপুরের রায়তদের (তাঁতীসহ) ওপর শাস্তি ও বর্বরতার কথা উত্থাপিত হয়েছিল তাঁর বক্তৃতায়। কমিশনারের রিপোর্ট থেকে বার্ক নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি দেন ঃ—

"That the punishment inflicted upon the ryots, both of Rangpur and Dinajpur for non-payment were in many instances of such a nature, that would rather wish to draw a veil over them, then shock your feelings by the details; but that, however disaplicable the task may be to myself, for the sake of justice humanity and the honour of the government that they should be exposed to be prevented in future."

শাস্তির পদ্ধতি সম্পর্কে বার্ক বলেন—"My Lords, they began by winding cords round the fingers of the unhappy free holders of those provinces until they clung to and were almost incorporated with one another and then they hammered wedges of iron between them, until regardless of the cries of the suferers, they had bruised pieces and for ever crippled those poor, honest

innocent, laborious hands which never been raised to their mouths but with a penutious and scanty proportions of the fruits of their own soil, but those fruits (denied to the wants of their own children) have for more than fifteen years past furnished the investment for out trade with China.

দৈহিক নিপীড়নের দৃষ্টান্ত আরও সবিস্তারে তুলে ধরার জন্য বার্ক পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে উচ্চকিত কণ্ঠে বলেন ঃ—

"I am next to open your Lordship, what I am, hereafter to prove that most substantial and wading yeomen the responsible farmers, the parochial magistrates and clits of villages were tied to and to by cheeks the legs together and their tormentors, throwing them with their heads downwards over a bar beat them on the sores of the feet with ratans until the nails fell from the toes and then attacking them at their head, as they hung downwards as before at their feet, they beat them with their sticks and other instruments of blind fury, until the blood gushed out their eyes, mouths and noses."

ভারতীয় তাঁতশিল্পী ও কৃষকদের ওপর কিরূপ ভয়াবহ অত্যাচার করা হয়েছিল এডমন্ড বার্ক তাঁর নিজ স্বদেশবাসী ইংরাজদের বিরুদ্ধে অভিযোগের তীর নিক্ষেপ করেন। হতভাগ্য মানুষগুলোকে 'বিচুটি গাছ' দিয়ে পেটানো হত। 'বিচুটি গাছ' সম্পর্কে তিনি যা জানতেন তাহলো অত্যন্ত বিষাক্ত এবং তীব্র ক্ষয়কারক এক ধরনের গাছ। সেই গাছের ডাল কেটে তা দিয়ে প্রহার করা হলে ক্ষতস্থানে মারাত্মক পুঁজ বা দূষিত রক্ত জমে যায়, গ্যাংরিন হয়ে যায়, সর্বাঙ্গে ঘা হয়ে যায় অবশেষে জীবন সংশয় হয়ে ওঠে।

অত্যাচারিত শ্রেণীর মানুষগুলোর ওপর রাত্রিকালে বা শীতের রাত্রেও নির্যাতন করা হতো নিষ্ঠুরতম পদ্ধতি প্রয়োগ করে। কুঠিয়াল, 'আড়ং'গুলোর মালিক, মহাজন, গোমস্তারা অতিরিক্ত ধনলিপ্সার টানে জোর জুলুম চালাতে থাকে বিনা বাধায়। বন্দীদের অন্ধকার কুঠরীতে নিক্ষেপ করা হতো, তিনবার পরপর চাবুক মারা হতো, মধ্যবর্তী সময়ে কিছুটা বিশ্রাম দিয়ে পুনরায় মানসিক এবং দৈহিক নিপীড়ন শুরু করা হতো। অসহ্য শীতের রাত্রে রক্তাক্ত থেঁতলানো আহত দেহগুলোকে জোর করে টেনে টেনে জলভর্তি গভীর গর্তে ছুঁড়ে ফেলে দিত।

সমস্ত দিনব্যাপী চক্রাকার অত্যাচারের পর লুণ্ঠিত এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রামগুলির মধ্য দিয়ে রাত্রে রক্তাক্ত মানুষগুলোকে টেনে নিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করা হতো। বদ্ধ অন্ধকার কুঠুরীতে পুরে দিয়ে হতভাগ্যগুলোকে চাবুক মারা হতো। সকাল হতে আবার চাবুক পড়তো। দিনের বেলায় ভিক্ষা করতে পাঠানো হতো, রাত্রে ফিরিয়ে আনা হতো অন্ধকারে কুঠুরীতে। দিনের পর দিন ভীতি প্রদর্শন, অপমান জনক ব্যবহার, জোরজবরদস্তি প্রয়োগ করে রাত্রিবেলায় শৃঙ্খলাবদ্ধ করা, বেড়ি পরানো, বেত্রাঘাত সহ্য করাই ছিল হতভাগ্য মানুষগুলোর দৈনন্দিন জীবন। অত্যাচারিত ভারতীয়দের পক্ষাবলম্বন করে ইংলণ্ডের পার্লামেন্টে নির্ভীক বাগ্মী এডমণ্ড বার্ক ভারতের বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংসের বিচার প্রার্থনা করে বজ্রকণ্ঠে দাবী করলেন—

"I impeach him in the name of humanity, I impeach him in the name of the people of India whose rights he has trampled under foot."

বার্ক ইংরাজ রাজপুরুষদের অত্যাচারের বিবরণের কাহিনী পার্লামেন্টে বর্ণনা করতে যেয়ে বারে বারে নিজেই বিহ্বল হয়ে পড়তেন। বাংলার কৃষক, বাংলার তন্তুবায়ী, বাংলার রায়তদের অনেকেই কষ্টসহিষ্ণু ছিল। যন্ত্রনায় নিষ্পিষ্ট হলেও তাদের মনোভাবের বার্ক প্রশংসা করেছিলেন। নিষ্ঠুরতার ভয়াবহ চিত্রটি অসভ্যতা, বর্ব্বরতার ক্ষেত্রে অতীতের সমস্ত রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। যেমন পিতামাতার সম্মুখে শিশুদেব হত্যা করা হতো। পিতা ও পুত্রকে মুখোমুখি, উভয়ের শরীর জড়িয়ে পরস্পরকে এমনভাবে বাঁধা হতো যেন পিতার প্রাপ্য প্রহার বা লাথি সরে গেলে পুত্রের ওপর আঘাত হতে পারে। অনুরূপভাবে পুত্রের প্রাপ্য প্রহার ফসকে গেলে পিতার ওপর পড়বে। স্বামীর বাহুবন্ধন থেকে স্ত্রীকে জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে লুঠ করা হতো তার সম্ভ্রম, শেষে উভয়েরই জীবনটুকুও। তারপর পাশাপাশি কবরস্থ করা হতো উভয়কে। মহিলাদের আটক করে স্তনে বাঁশ চালিয়ে দলা হতো। যতক্ষণ না তার মৃত্যু ঘটে। মানুষগুলোকে জন্তু-জানোয়ারেরও অধম করে তোলা হয়েছিল।

শেষাবধি বার্ক হেস্টিংসসহ সমস্ত রাজপুরুষদের অত্যাচারের ফলাফল এবং সমাজে তীব্র প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে নিম্নোক্ত চিত্র সভায় তুলে ধরেন—"All the relations of life are at once dissolved. His parents are no longer his parents, his wife is no longer his wife, his children, are no longer to regard him as their father. It is something far worse than complete

outlawry, complete attainder and universal ex-communications. It is a pollution ever to touch him and if he touches any of his old caste, they are justifed in putting him to death.

এডমণ্ড বার্ক অত্যন্ত অর্থাবেগমথিত বক্তব্য রাখেন সকলের সম্মুখে এবং অত্যাচারের বিশদ বিবরণ পেশের পর সভার সদস্যদের কাছ হতে ন্যায় বিচার দাবী করে বলেন—

"Your lordship will not wonder that these monstras and oppressive demands, exacted with such tortures threw the whole province into despair. They abandoned their crops on the ground. The people in a body would have fled out of its confines but bands of soldiers invested the avenues of the province and making a line of circumvallation drove back those wretchs who saught exile as a relief, into the prison of their native soil suffered to quit the district, They fled to the many wild thickets which opression had scattered throught it and sought amongst the jungles and dens of tiger, a refuge from the tyrrany of Warren Hastings. Not able long to exist here, pressed at once by wild beasts and famine, the same despair drove them back and seeking their last resource in arms. the most quiet, the most passive, the most timid of human race rose up in a universal insurrection and will always happen in a popular thumbs, the effects of the furey of the people, fell on the and sometimes reluctant instruments of the tyranny who in several places were massacared."

এই পর্যন্ত দীর্ঘ বক্তৃতা শেষ করে বার্ক রঙপুর ও অন্যান্য জেলার সঙ্ঘটিত বিদ্রোহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। বিদ্রোহগুলি সঙ্ঘটিত হওয়ার পিছনে কি কারণ থাকতে পারে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তিনি 'Details of the cruelty of peace' এর বর্ণনা দিয়ে শেষে বলেন—"The insurrection began in Rangpur and soon spread its fire to the neighbouing provinces, which has been harrassed by the same persons with the same oppression"

রঙপুর এবং দিনাজপুরের বিদ্রোহ ছিল সর্বাত্মক। 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' চলছে, সর্বত্র এর মূলকারণ ইংরাজ কোম্পানীর আড়ং ও কুঠির কুঠিয়াল আর তাদের অধীন ভূস্বামী, নায়েব, জমিদারের গোমস্তা, পাইকার, দালাল, দারোগা, পিয়নদের অত্যাচার গ্রামের পর গ্রামকে শ্মশানে পরিণত করেছিল। 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহে'র সংবাদ বার্ক খুব ভালোভাবেই

রাখতেন। এই বিদ্রোহে রায়ত চাষী, তাঁতী ও অন্যান্য পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা দলে দলে যোগ দিয়েছিল এবং বিদ্রোহ ছিল সশস্ত্র ও নিরস্ত্র উভয়তই। এড্‌মণ্ড বার্ক রঙপুর, দিনাজপুর সহ সমগ্র উত্তরবঙ্গব্যাপী বিদ্রোহ সম্পর্কে পার্লামেণ্টে বর্ণনা প্রসঙ্গে ইংলিশ চীফস্‌দের ভূমিকা প্রসঙ্গে বলেন যে ইংলিশ চীফস্‌রা প্রথম দিকে ছিল বিদ্রোহের নীরব দর্শক। প্রকৃতপক্ষে তিনি ইংলিশ চীফ্‌স বলতে চেয়ে ছিলেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তাদের কথা। বার্কের মতে কোম্পানীকর্তারাই এ দেশীয় প্রজাদের সর্বস্বান্ত করা, এদেশের শিল্প বিশেষতঃ তাঁতশিল্পকে ধ্বংস করার দুষ্কর্মের প্রধান অংশীদার ছিল (abettor)। শিহরণ জাগানো সন্ত্রাসের জনক কোম্পানীর কুঠিয়াল, আড়ংয়ের মালিকরা প্রথমে অনিয়মিত সিপাহী পরে নিয়মিত ফৌজ তলব করে বিদ্রোহ দমনের জন্য। ভয়াবহ সামরিকশক্তি প্রয়োগ করে নিরস্ত্র অসংগঠিত হতাশাগ্রস্ত তন্তুবায়ী মানুষদের নিশ্চিহ্ন করে ছেড়েছিল।

উৎপীড়নের বর্ণনা দিতে অক্লান্ত বার্ক শেষপর্যন্ত নিজেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন এই মর্মে নিজেই ঘোষণা করতে বাধ্য হন এবং বিদ্রোহ দমনে কোম্পানীর ভূমিকা এবং আক্রমণকে 'in human war' রূপে অভিহিত করেন। তাঁর ভাষা ছিল নিম্নরূপ" "I am tired with the details of the cruelty of peace, I spare you these of a cruel and in human war, and of the execution which without law and process or even the shadow of authority, were ordered by the English Revenue Chief in that Province." এখানে 'Province' বলতে তিনি বাংলা প্রদেশকেই উল্লেখ করেছিলেন।

এডমণ্ড বার্ক বাংলার রায়তদের দুর্দশার চিত্র বর্ণনা করার পর নিজের চিন্তাভাবনার কথা পার্লামেন্টের সদস্যদের সম্মুখে ব্যক্ত করেন বন্দী রায়তদের ওপর অমানবিক পীড়নের পর তার কাছে অস্বাভাবিক দাবীর ব্যাপারে কুঠিয়ালকে কি সে দেবে চিন্তা করতে পারে না। সে দেখছে তার যা ছিল প্রায় সব কিছুই তো বাজেয়াপ্ত হয়ে গিয়েছে। যা যৎসামান্য অবশিষ্ট আছে তার মূল্য এত কম যে তার দ্বারা দাবীর অর্ধেকও তো মেটানো সম্ভব নয় এরপর তার মুক্তির কথা সে চিন্তাই করতে পারে না, গোটা বিশ্বটাই যেন তার কাছে কারাগার। কারারুদ্ধ অবস্থায় ঐ রায়ত তার ভাগ্যে আরও কঠিনতর শাস্তি জোটার কথাই কেবল চিন্তা করে তার পরিবারে অসম্মান ঘটলো, অত্যাচারের ফলে তার জীবন জীবিকা, মনুষত্ব, সামাজিক পরিচয় সবকিছুই ধুলায় লুটিয়ে পড়েছিল। এরপর সে আর কিছু চিন্তা করে ইতিকর্তব্য স্থির করতে পারে না। এ সম্বন্ধে মানবতাবাদী

এডমন্ডের ভাষা ছিল নিম্নরূপ"...Conceive to yourselves what must be the situation of a ryot, when he sees everything he has in the world seized, to answer an exaggerated demand and sold at so a low brice as not to answer one half of the demand when he finds himself so far from being released, that he remains still subject to corporal punishment"

এডমণ্ড বার্ক কেবল বুদ্ধিজীবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন যথার্থই বাংলা তথা ভারত বন্ধু, যথার্থই বাগ্মী এবং অত্যাচরিত শ্রেণীর পক্ষে মানবতাবাদী এক পার্লামেন্টারিয়ান। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতের তাঁত শিল্প ও শিল্পীরা ইংরাজ বণিকদের অত্যাচারে অস্তিত্বের ঘোরতর সংকটের আবর্তে আবর্তিত হতে হতে যেভাবে শূন্যে বিলীন হয়ে যায় তার প্রকৃত কারণ এবং স্বরূপ বার্ক অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে, প্রত্যয়দৃপ্ত ভাষণে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর অবদানের জন্য তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার করা প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্তব্য। ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাসনা ছিল এদেশে স্থিতু হওয়া। পলাশীর ঘটনার পরে ইংরাজ রাজপুরুষগণ ভারত শাসনের অধিকার লাভের শুরুতেই বাংলার গৌরব মসলিন বস্ত্র ধ্বংস হয়ে গেল।

❑ বাংলার রেশমশিল্প শ্রমিকদের সংগ্রাম (১৭৭০-১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ) ❑

সুবে বাংলার মুর্শিদাবাদ, মালদহ, রংপুর, বীরভূম প্রভৃতি জেলা ও পরগণায় রেশম চাষে দক্ষ কৃষকদের ঘনবসতি ছিল। তুঁতগাছে গুটিপোকা লালন পালন করাই ছিল তাদের প্রধান কাজ। রেশম সুতা প্রস্তুত হয় রেশম গুটি থেকে। কৃষকরা জমিদার, তালুকদার বা নায়েব-গোমস্তাদের কাছ হতে গুটি পোকা চাষ্কার্যের জন্য প্রকৃতপক্ষে তুঁত গাছের চাষের জমি লীজ নিত। আর যারা মৃত গুটি পোকার লালা থেকে রেশম সুতা টেনে বার করার কাজটি করে থাকে তারা এবং তন্তুবায়ী উভয়েই এদেশের বুকে ইংরাজ দাপিয়ে বেড়াবার পূর্বে যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করতো। মোগল আমলে বাদশাহর বেগম মহলে রেশম বস্ত্রের চাহিদা ছিল উত্তুঙ্গে। জগদ্বিখ্যাত রেশম বস্ত্রের ওপর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মুনাফা লোটার লোভাতুর দৃষ্টি পড়ে। ইংরাজ বণিকরা মসলিন ও সুতিবস্ত্রের ব্যবসার কায়দায় রেশম বস্ত্র ব্যবসা পরিচালনা করতে থাকে। এখানেও পাইকারদের দাপট। পাইকাররা ছায়ার মতো রেশম চাষীর উৎপন্ন গুটি অনুসরণ করতে থাকে। তারা কৃষকদের কাছ হতে জোর জবরদস্তি, ভীতি সন্ত্রাস সৃষ্টির পথে নামমাত্র মূল্যে রেশম গুটি কিনে নিয়ে যারা সুতা প্রস্তুত করে সেই 'নাগাউর' বা তন্তুবায়ীদের

কাছে নিয়ে যায়। তন্তুবায়ীরাও নামমাত্র মজুরীর বিনিময়ে সুতা বার করে দিত। এরপর পাইকাররা সুতার বাণ্ডিল মজুত করে তা ব্যবসায়ীদের কাছে অধিক দামে বিক্রয় করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করতো। প্রসিদ্ধ ইংরাজ ঐতিহাসিক উইলিয়ম বোল্ট ঐ সময় ভারতে বা বাংলায় ছিলেন। তিনি লিখেছেন "লর্ড ক্লাইভের দ্বিতীয় বারের শাসন কালে কাঁচা রেশম উৎপাদন কোম্পানীর লগ্নীর অতি উৎসাহের জন্য নাগাউরদের উপর এরূপ অত্যাচার ও কঠোরতা অনুষ্ঠিত হইত যে, মানব সমাজের পবিত্রতম অনুশাসনগুলিও লঙ্ঘন করা হইত।"

(সু. রায়-ভারতের কৃষকবিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, পৃঃ ১০৩)

(Consideration of Indian Affairs, William Bolt, P. 195)

রেশমচাষীরা কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারী (প্রাইভেট ট্রেডার্স), জমিদার, গোমস্তা, নায়েবদের রোমহর্ষক অত্যাচারের ভয়ে রেশমচাষীরা তুঁত চাষই বন্ধ করে দেয়। অনেকে ভিটামাটির মায়া পরিত্যাগ করে জঙ্গলে পলায়ন করে। তন্তুবায়ীরাও কৃষকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এবং উভয়েই সন্ন্যাসী বিদ্রোহ এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। অনেকে নিজের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নিজেই বাদ দিয়ে ফেলতো যাতে ইংরাজদের মুনাফার জন্য তাকে উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করতে না হয়। উদ্ধৃতিঃ—"This last kind of workmen (winders of raw silk) were pursuid with such riguor during Lord Clives' late government in Bengal, from zeal for increasing the companys investment of rawsilk, that the most sacred Laws of Society was atrociously violated."

(P. 112, Ruins of Indian Trade & Industry by Major B.D. Basu)

রেশম গুটির লালন পালনের কাজে যারা ব্যাপৃত থাকতো সেই সমস্ত কৃষকগণকে কোম্পানীর পক্ষ থেকে অ্যাডভান্স দেওয়া হতো। এই অগ্রিম দাদন তন্তুবায়ী 'নাগাউর'রা (Winders) গ্রহণ করতে বাধ্য ছিল। শ্রমের বিভাজন কিরূপ ছিল তা নিম্নে উল্লেখিত হলো ঃ—Advances of money before each bund or crop, were made to two classes of persons–first to the cultivators who reared the cocoons; next the large class of winders who formed the mass of population of this surrounding villages. By the first, raw materials was secured, by the last, the labour for working it. These advances were regarded as legal earnest money, or as pledges by the receivers to confine their dealings to the party disbursin it.

উপরোক্ত বক্তব্য জনৈক হেনরি গৌগর নামক একজন ভ্রাম্যমান পর্যটকের যাকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী আদালতের বিচারে বার্মায় দুবছর কারাবাস করতে হয়েছিল (যাঁর গ্রন্থের নাম— Personal Narrative of the two years imprisonment in Burmah"))।

হেনরী তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করেছিলেন নিজ গ্রন্থের মধ্যে। সম্ভবতঃ তিনি রেশম গুটির ব্যবসায়ও শুরু করেছিলেন। হেনরী লিখেছেন—

"A native wishing to sell me the cocoons he produces for the season, takes my advance of money; a village of winders does the same. After the contrast is made, two of the Resident's servants are despatched to the village, the one bearing a bag of rupees, the other a book, in which to register the names of recipients."

(p. 91, Ruins of Indians Trade and Industry by Major B. D. Basu).

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষের সর্বত্র 'ফ্রি ট্রেড' এর অনুমোদন লাভ করে সর্ব প্রথম বস্ত্র ব্যবসায়ে ঝুঁকে পড়ে। জগদ্বিখ্যাত মসলিন এবং সিল্ক (রেশম) বস্ত্রের উৎকৃষ্টতা ইংলণ্ডের তাঁতীদেরকেও ঈর্ষান্বিত করে। বাংলার রেশম বস্ত্র (সিল্ক) উৎপাদন করা যাতে কেবল কাঁচা রেশম (raw silk) উৎপাদন করে তার জন্য ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ ইংলণ্ডে অবস্থিত কোম্পানীর ডাইরেকটার্স বোর্ড ভারতবর্ষের প্রতি নির্দেশ জারী করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় আর আরেকটি নির্দেশনামা। তাতে বলা হয় যে, রেশমগুলি থেকে যারা সুতা প্রস্তুত করে তারা নিজগৃহে বসে এই কাজ করতে পারবে না। তাদের কাজ করতে হবে কোম্পানীর নিজস্ব ফ্যাক্টরীর কমন শেডের তলায়।

ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটির সঙ্গে এ প্রসঙ্গে যে পত্রবিনিময় হয় তা পাঠ করলে তৎকালে উপনিবেশবাদী ইংরাজদের প্রভুত্ববাদ নীতির স্বরূপ উন্মোচিত হবে।

'ডাইরেকটার্স বোর্ড' লণ্ডন থেকেই উক্ত 'কমিটি'কে নির্দেশের কথা জানাচ্ছে ঃ— "বিশেষভাবে যে সকল রেশমসূত্র উৎপাদনকারী নিজ গৃহে বসিয়া স্বাধীনভাবে কার্য করে তাহাদিগকে আমাদের ফ্যাক্টরীতে আনয়নের ব্যাপারে এই নির্দেশটি বিশেষ ফলপ্রদ হইয়াছে। যদি এই নিয়ম (নিজ গৃহে বসিয়া স্বাধীনভাবে কার্য করা) আমাদের অসতর্কতার জন্য আবার প্রচলিত হয় তাহা হইলে উচিত হইবে উহা চিরতরে বন্ধ করিয়া দেওয়া

এবং তাহা আমাদের সরকার কর্তৃক কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা দ্বারা এখনই কার্যকরীভাবে করা যাইতে পারে।" (ভারতের কৃষক বিদ্রোহ.........সুপ্রকাশ রায়)

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অনুসৃত নির্দেশাবলী অমান্য করলে শাস্তি প্রদানের সুপারিশের প্রতি পার্লামেণ্টের সিলেক্ট কমিটি সম্পূর্ণ সমর্থন জানায়। সিলেক্ট কমিটির প্রতিবেদনে উল্লেখিত নির্দেশের সমর্থনে নিম্নরূপ মন্তব্য করা হয় ঃ—

"কোম্পানীর পত্রখানিতে উহার নীতি সম্বন্ধে এবং বঙ্গদেশের রেশম বস্ত্রের উৎপাদনকারীদের কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ ও উৎসাহদানের বিষয়ে একটি নিখুঁত পরিকল্পনা দেওয়া হইয়াছে। এই নীতি অবশ্যই ব্যাপকভাবে কার্যকরী করিতে হইবে। আর তাহা করিতে হইবে এমনভাবে যাহাতে বঙ্গ দেশের রেশম বস্ত্রের উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়। যাহাতে এই শিল্পোন্নত দেশটির (বঙ্গদেশের) অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে এবং এই দেশটি গ্রেট ব্রিটেনের শিল্পোৎপাদনের চাহিদা অনুযায়ী কাঁচামাল সরবরাহের ক্ষেত্রে পরিণত হয়। সেই ভাবেই এই নীতি কার্যকরী করিয়া তোলা অবশ্য কর্তব্য"।
(ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ❑ সুপ্রকাশ রায়—পৃঃ ১০১)

বাংলাদেশের জগদ্বিখ্যাত রেশমবস্ত্র বা সিল্ক বস্ত্র প্রস্তুতে বাধা সৃষ্টি করা না হলে ইংলণ্ডের সিল্ক বস্ত্র উৎপাদকদের মাথায় হাত পড়তো। ইংলণ্ডে চলছিল শিল্পবিপ্লবের যুগ। হস্তচালিত তাঁতশিল্প যুগেব পরিসমাপ্তি ঘটেছে ইংলণ্ডে। সিল্কবস্ত্র উৎপাদিত হচ্ছে ঢালাও ভাবে। কাজেই বাংলা দেশে যাতে রেশম বস্ত্র উৎপাদন বন্ধ হয় তার চেষ্টা করতেই হবে নচেৎ বিশ্বের বাজারে ইংলণ্ডের সিল্কবস্ত্র স্থানই পাবে না। বাংলার রেশম সিল্ক তখন স্পেন ও ইতালির রেশমবস্ত্র অপেক্ষা অনেক উন্নত গুণসম্পন্ন ছিল। ইংলণ্ডের যে সকল অধিবাসী কোম্পানীর অধীনে কর্মচারী হিসাবে চাকুরী করতো তারা অধিক উপার্জনের জন্য প্রাইভেট ট্রেড এর অঙ্গনে ইতিপূর্বেই প্রবেশ করেছিল। তারা রেশম শিল্পীদের ওপর জোর জুলুম চালিয়ে নারকীয় অত্যাচারে তাকে পঙ্গু করে শিল্পটাকেই গ্রাস করেছিল। আর বাংলার রেশমশিল্প শ্রমিকরা কর্মহীন হয়ে খানিক ভবঘুরে জীবন যাপন করতে করতে অবশেযে সন্ন্যাসী বিদ্রোহে যোগ দিয়ে ইংরাজদের অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের পথে নেমেছিল।

১৫

ইংলণ্ডের প্রখ্যাত মানবতাবাদী, প্রতিবাদী বাগ্মী পার্লামেন্টের সদস্য এডমণ্ড বার্কের কথা ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি। ইংরাজ বণিকরা যেভাবে বাংলার রেশমবস্ত্র

শিল্পের মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছিল তার আনুপূর্বিক কারণ ব্যাখ্যা করে এডমন্ড বার্ক ইংরাজ শাসনকে বাংলায় 'মৃত্যুর শাসন' বা 'ওরাঙ্গ ওটাঙ্গ বা এক বন্যজন্তুর শাসন' ইত্যাদি নামে বা অলঙ্কারে ভূষিত করেছিলেন। এর থেকে নিন্দাজনক ভাষা এক স্বদেশবাসীর কাছ থেকে কোম্পানীকে আর লাভ করতে হয়নি। ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা তথা ভারতবর্ষের শাসক হলো বাংলা বিহার উড়িষ্যার স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলাকে যুদ্ধে পরাজিত করে এবং বিশ্বাসঘাতকদের সাহায্যে তাঁকে হত্যা করার ঘটনার পর। এরপর থেকে শাসনের নামে কেবল শোষণ আর অত্যাচার। সামান্যতম মানবিক মূল্য বোধের কোন পরিচয় শাসনকর্তারা দেখায়নি। কেবল লুঠ, অর্থলুঠ, শিল্প বাণিজ্য ধ্বংস, ইজ্জত লুঠ করা এই ছিল উপনিবেশবাদী ইংরাজদের কাজ।

উত্তরবঙ্গে সন্ন্যাসী বিদ্রোহে যারা ক্রমান্বয়ে যোগ দিয়েছিল তারা ছিল ছিন্নমূল রায়ত কৃষক, তাঁতী, কারিগর। এরা নিজ কর্ম থেকে উচ্ছেদ হয়ে বেকার হয়ে কিছুটা ভবঘুরে জীবন যাপন করতো, খাদ্য বস্ত্র বাসস্থানের সন্ধান করতো। কিছু হয়েছিল অরণ্যবাসী।

বাংলা তথা ভারতবর্ষে ইংরাজদের ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতাদখলের ঘটনা যদি না ঘটতো তবে বাংলার মসলিন বাংলার রেশম বা সিল্ক বস্ত্র ধ্বংস হতো না, একথা সহস্রবার বলা যায়। ইংরাজ ঐতিহাসিক উইলসন স্বয়ং ইংরাজদের ভূমিকার তীব্র সমালোচক ছিলেন। তাঁর সমালোচনার ধার ছিল নিম্নরূপ ঃ—"Had India been independent, she would have retaliated, would have imposed prohibitive duties upon British goods and would thus have preserved her productive industry from annihilation This act of self defence was not permitted her, she was at the mercy of the stranger. British goods were forced upon her without paying any duty, and the foreign manufacturer employed the arm of political injustice to keep down and ultimates strangle a competetor with whom he could not have contended on equal term".

ইংরাজ শাসকগণের এদেশীয়গণের প্রতি কোন রাজনৈতিক সদিচ্ছাই ছিল না। ইংলণ্ডে যে রেশমবস্ত্র বাংলা তথা তামাম হিন্দুস্তান থেকে রপ্তানী হতো তার ওপর তৎকালীন সময়ে শতকরা একাশি পাউণ্ড শুল্ক চাপানো হতো কিন্তু ইংলণ্ড থেকে যে সব ভারী পণ্য এদেশে আসতো তার ওপর শুল্ক ধার্য ছিল এদেশীয় মুদ্রায় শতকরা আড়াই টাকা মাত্র। এভাবেই ইংলণ্ডের বণিকগণকে 'রক্ত চোষা বাদুড়' নামক প্রাণী বিশেষের সঙ্গেই কেবল তুলনা করা হতো।

পরবর্তীকালে উনবিংশ শতাব্দীতে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের কমনস সভায় দাঁড়িয়ে পার্লামেণ্ট সদস্য মিঃ লার্পেন্টি ভারতের শিল্পধ্বংসের ওপর আলোচনার সময় মন্তব্য করেছিলেন—'আমরাই' (অর্থাৎ ইংরাজরাই) ভারতের শিল্পসমূহ ধ্বংস করেছি।" এইরূপ স্বীকারোক্তি খুব কম পার্লামেন্ট সদস্যের কাছ হতেই শোনা গিয়েছিল।

কালমার্কসের বিশ্লেষণ ঃ 'ভারতে ব্রিটিশ শাসন' প্রসঙ্গে বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবি কার্ল মার্কস যা লিখেছিলেন তা আজও প্রাসঙ্গিক। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে মার্কস বলেছিলেন—"স্মরণাতীত কাল থেকে ইউরোপ ভারতীয় শ্রমের সৃষ্টি অপূর্ব বস্ত্র পেয়ে এসেছে এবং তার বদলে পাঠিয়েছে ধাতু।.....বৃটিশ হামলাদাররাই এসে ভারতীয় তাঁত ভেঙ্গে ফেলে, ধ্বংস করে চরকা। ইংলণ্ড শুরু করে ইউরোপের বাজার থেকে ভারতীয় তুলাবস্ত্রের বিতাড়ন, অতঃপর সে হিন্দুস্থানে সুতা পাঠাতে থাকে এবং ভারতীয় তুলার মাতৃভূমিকেই কার্পাস বস্ত্র চালান দিয়ে ভাসিয়ে দেয়। ১৮২৪ সালে ভারতে ব্রিটিশ মসলিনের চালান ১০,০০,০০০ গজও নয়। অথচ ১৮৩৭ সালে তা ৬,৪০,০০,০০ গজও ছাড়িয়ে যায়। অথচ একই সময়ে ঢাকার জনসংখ্যা ১,৫০,০০০ থেকে ২০,০০০ এ নেমে আসে। ......'সারাভারতবর্ষ জুড়ে কৃষি ও হস্তচালিতশিল্পের যে ঐক্য ছিল বৃটিশ বাষ্পীয় ইঞ্জিন তার মূলোৎপাটন করে দিয়েছে। ....ইংরেজের হস্তক্ষেপে সুতা কাটুনির স্থান গ্রহণ করেছে ল্যাঙ্কাশায়ার এবং তাঁতীর স্থান রেখেছে বাংলা।" মহান আন্তর্জাতিকতাবাদী কার্ল মার্কস ভারতবর্ষের পরাধীন জনগণ, বিশেষতঃ তন্তুবায়ীদের দারিদ্র এবং দুরাবস্থার প্রকৃত বা সঠিক চিত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। সমগ্র বিশ্বে যিনি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের, কমিউনিজমের মতাদর্শগত সংগ্রামের জনক ছিলেন, যিনি রচনা করেছিলেন কমিউনিষ্ট ইশতেহার তিনিই রচনা করেছিলেন আমাদের ভারতবর্ষীয়দের কাছে অমূল্য অধ্যায় 'Future Results of British Rule in India' সম্বলিত মহান মতাদর্শ গ্রন্থ 'পুঁজি' (Capital) গ্রন্থটি। ভারতবর্ষের তন্তুবায়ী এবং মহান শিল্পটির ভবিষ্যৎ যে ধ্বংসের পথে চলে গেছে সে সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন আমাদের অমূল্য পাথেয়।

কাল মার্কসের জ্ঞানের দৃষ্টি ভারতবর্ষের গ্রাম্য সমাজের চিত্রটি বিশ্লেষণ করেছিল। তৎকালীন বাংলাদেশের গ্রাম্য সমাজের অর্থনীতির মূল বনিয়াদ বা ভিত্তিটাই উপড়ে তুলে ফেলে দিয়েছিল ভারতে ব্রিটিশ শাসন। কৃষকরা জমি পেয়ে একদা রায়ত হয়েছিল! এই রায়তদের মধ্যেই ছিল তাঁতী, কামার-কুমোর প্রভৃতি কারিগররা। মোগল আমলে রায়তদের ফসলের ভাগ দিতে হতো আমীর, নবাব-বাদশাহদের হুকুমে। জমির ওপর

রায়তদের সাধারণ অধিকার ছিল। কিন্তু ইংরাজ আমলে নবাব বাদশাহ গেল কিন্তু এলো কারা? জমিদার নায়েব গোমস্তা দারোগাদের সাহায্যে এল ব্রিটিশ লুঠেরার দল। গ্রাম্য সমাজে যারা দরিদ্র তারা নানান যুগে নানান দেশী বিদেশী রাজশক্তির আক্রমণে অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারলেও ব্রিটিশ যাদের সাহায্যে এদেশে শাসন ক্ষমতা দখল করেছিল বা শাসনব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে তুলেছিল সেই নতুন শিক্ষিত বিশেষতঃ প্রতীচ্যের আলোকে আলোকিত কিছু সমাজ সংস্কারক।

জমিদার শ্রেণী (১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের পর) মহাজন, তালুকদার, পত্তনীদার, আয়মাদার, গোমস্তা যাদের রক্তে ছিল বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর, উমিচাঁদ, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ ইত্যাদির রক্তের মিশ্রণ তারা বাংলার নতুন বুর্জোয়া সামন্তশ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করা শুরু করেছিল। এঁদের অনেকে বাংলার পশ্চাৎপদ নানান কুসংস্কার বিমোচনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে মহান চিন্তানায়কের আসন লাভ করেছিলেন, অনেকে প্রাচ্য শিক্ষাদর্শের সঙ্গে প্রতীচ্যের শিক্ষাদর্শের একটা সমন্বয় বা মিলন ঘটিয়ে মিশ্র শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনের ধারকবাহক হতে পেরেছিলেন, অনেক সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, কবি সম্মান লাভ করেছিলেন, কিন্তু এঁরা যদি গ্রাম্য সমাজের অর্থনীতির মূল ভিত্তিটা ধরে টান মারতেন, অত্যাচারে জর্জরিত গ্রামকে গ্রাম শ্মশানে পরিণত হতো না।

বিদ্রোহী তাঁতী ও কৃষকদের 'ডাকাত', 'খুনি', 'দঙ্গল', 'সমাজবিরোধী' বলে ইংরেজরা আখ্যায়িত করেছে তা নিয়ে এঁরা প্রতিবাদ করেন নি। উল্টে সিপাহীবিদ্রোহ যা কিনা স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় (যার দেড়শত বছর পূর্তি আসন্ন) অক্ষয় অমর কাহিনী রূপে সম্মানিত হয়েছে, ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রেরণা যুগিয়ে এসেছে, সমাজ সংস্কারকরা সেই 'সিপাহী বিদ্রোহ'কেও 'উচ্ছৃঙ্খল' 'দেশবিরোধী কার্যকলাপ' ইত্যাদি গালমন্দ করতে পিছপা হন নি। এঁদের বশম্বদতায় সন্তুষ্ট হয়ে এঁদের অনেককেই তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশরাজ বেছে বেছে রায়বাহাদুর, রায় সাহেব, খান সাহেব, সি. আই. ই., নাইট প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করেছিল। তাঁতী প্রমুখ হস্তশিল্পীরা উৎপাদন সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সন্ন্যাসী ফকিরে পরিণত হলেও বাংলার তদানীন্তন কালের রাজা, জমিদার, মহাজন শ্রেণী আর তাদের তাঁবেদাররা তন্তুবায়ীদের দিকে ফিরেও তাকায়নি। এঁদের অনেকেরই বাংলা শিক্ষাবিস্তার, সমাজসংস্কারে ইতিবাচক ভূমিকা থাকলেও এবং বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের দিকপাল রূপে খ্যাতি অর্জন করে থাকলেও শ্রেণী আন্দোলনের প্রতি কোন সমর্থন জানান নি। এটাই আমাদের দুর্ভাগ্য তৎকালীন গ্রাম বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষ (হিন্দুস্থান) আর তার প্রসিদ্ধ হস্তশিল্প

কিভাবে অস্তিত্বের সংকটে নিমজ্জিত হয়েছিল তার একটা সুস্পষ্ট চিত্র আমরা অনুধাবন করি সেই মহান চিন্তাবিদ, বিশ্বের পুঁজিবাদী সমাজের আমূল পরিবর্তনের দিশারী মহান কার্ল মার্কসের রচনা থেকে। উদ্ধৃতিটি এইরূপ ঃ—

"জমির উপর সাধারণ অধিকার, কৃষি ও হস্তশিল্পের সংমিশ্রণ এবং এমন একটা অপরিবর্তনীয় শ্রমবিভাগ যাহা কোন নূতন গ্রাম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া মাত্র একটা ছককাটা নিয়ম হিসাবে ব্যবহৃত হতো। এই ছিল ভারতীয় গ্রাম সমাজের ভিত্তি।....সর্বাপেক্ষা সরল রূপের গ্রাম-সমাজে সকলে একত্রে মিলিয়া জমি চাষ করিত এবং সমাজের সকল সভ্যের মধ্যে উৎপন্ন ফসল ভাগ করা হতো। তার সঙ্গে পরিবারে সহায়ক শিল্পরূপে সুতাকাটা ও বস্ত্রবয়নের ব্যবস্থা ছিল, জনসাধারণ যখন সকলে একত্রিত হয়ে একই কাজ করতো, তখন সমাজের 'প্রধান ব্যক্তি' ছিল একধারে বিচারক, পুলিশ ও কর অদায়কারী।...."

বঙ্গদেশের জমিদাররা শাসক ইংরাজ বণিকদের সহায়তায় কৃষক, তন্তুবায়ী ও অন্যান্য প্রজাদের কাছ হতে জোর জবর দস্তি করে দারোগা পাঠিয়ে 'কাজির বিচার' এর আতঙ্ক ছড়িয়ে যে সমস্ত কর আদায় করতো তার একটা তালিকার দিকে দৃষ্টি দিলে এ সত্য আরও স্পষ্ট হবে।

জেলা ঃ সিরাজগঞ্জ ঃ সময়কাল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যকাল। অবৈধ উপায়ে খাজনা ব্যতীত আরও যে সমস্ত খাতে জমিদাররা অর্থ আদায় করতো তার একটা তালিকা ঃ—

১। তহুরী-বৎসরের শেষে সমস্ত করের হিসাব নিকাশ করার সময় আদায়যোগ্য কর।

২। জমিদার বাড়ীর বিবাহ-উৎসব বাবদ যে ব্যয় হবে তার সঙ্কুলান খরচবাবদ কর।

৩। পার্বনী-জমিদার বাড়ীর দেবদেবীর পূজা বাবদ যে ব্যয় হতো ত'র জন্য কর।

৪। স্কুল খরচা-জমিদার স্কুলকলেজ তৈরী করতে যে অর্থ ব্যয় করতেন তা আদায়ের জন্য কর।

৫। তীর্থ খরচা-জমিদার ও তার পরিবারের লোকজন তীর্থ করতে যাওয়ার জন্য যে খরচ হতো তা আদায়ের জন্য কর।

৬। রসদ খরচা-জমিদার কোন ইংরাজ আমলার বাড়িতে খাদ্য দ্রব্য উপহার স্বরূপ পাঠালে যে ব্যয় হতো তা আদায়ের জন্য কর।

৭। গ্রাম-খরচা-গ্রামে কোন সার্বজনীন কাজের জন্য যে ব্যয় জমিদারকে করতে হয় তা আদায়ের জন্য কর।

৮। ডাক খরচা— ইংরাজ গভর্নমেন্ট আরোপিত ডাক-খরচা।

৯। ভিক্ষা-খরচা— জমিদারের কোন দেনা হলে তা মেটানোর জন্য জনসাধারনের কাছ হতে আদায় যোগ্য কর।

১০। পুলিশ-খরচা-জমিদার বাড়িতে কোন কারণে পুলিশ উপস্থিত হলে যে ব্যয় হতো তা আদায়ের জন্য কর।

১১। আয়কর-খরচা-গভর্ণমেন্টকে জমিদার যে আয়কর দিত তা আদায়ের জন্য কর।

১২। ভোজ খরচা-জমিদারের বাড়িতে ভোজ দিতে যে খরচা হয় তা আদায়ের জন্য।

১৩। সেলামী বাবদ-রায়ত কোন জমি বা সম্পত্তি কিনলে বা লীজ নিলে তাকে এই কর জমিদারকে দিতে হতো।

১৪। খারিজ দাখলি—জমিদারের প্রজা রূপে গণ্য হবার জন্য চাষী যে আবেদন করতো তার জন্য ধার্য কর।

১৫। নজরানা-জমিদারের নায়েব খাজনা ও অন্যান্য উপরোক্ত কর (বলা হতো আবওয়াব) আদায় করতে বের হলে যে ব্যয় হতো তা আদায়ের জন্য এই কর।

উপরোক্ত বেআইনী কর বা খাজনা আদায় করা ছাড়াও প্রজারা জমিদারের বাড়িতে তার ব্যক্তিগত কাজে পরিবারের প্রত্যেককে পালাক্রমে বেগার শ্রম দিতে হতো। এই বেগার শ্রম তাঁতীদেরকেও দিতে হতো। মোগল আমলে গ্রামবাসীরা ব্যক্তিগত ভাবে কোন নবাব আমীর বা শাহকে সরাসরি এবং মুদ্রার বিনিময়ে কর দিত না। যেটা দিত তাহলো ফসলের ভাগ এবং গ্রামের সমাজ সমষ্টিগতভাবে তা মেটাত। মোগল আমলেও কৃষকদের ওপর অত্যাচার ছিল। মোগল আমলের শেষ পর্বে অত্যাচার চরমে উঠেছিল। দুর্বল মোগল বাদশাহকে প্রদেশের নবাব কিংবা ইংরাজ রেসিডেন্ট বা গভর্ণর কেউই মান্য করতো না। আমীর ওমরাহ, নবাব জমিদার, ইংরাজ রেসিডেন্টদের গোমস্তা দারোগাদের স্বেচ্ছাচারিতা চরমে উঠেছিল। লক্ষ্য ছিল কেবল অর্থ আদায় এবং ভোগ বিলাসে ডুবে থাকা। গ্রামাঞ্চলের সেচব্যবস্থা, পানীয়জলের ব্যবস্থা, পথ নির্মাণ এসবে কোন লক্ষ্য ছিলনা। বাংলার নদ-নদী শুষ্ক হতে হতে চরাভূমিতে পরিণত হয়েছিল মোগল আমলের শেষ পর্যায়ে। ইংরাজরা শাসনক্ষমতা দখল করে চরাভূমিগুলিকে মরুভূমি করে ছাড়ে। অধিকাংশ নদীর গতি রুদ্ধ হয়ে যায় আভ্যন্তরীন নদী বাণিজ্যপথ গুলোও ধ্বংস হয়ে যায়। ইংরাজ শাসকরা প্রথমতঃ শস্যের পরিবর্তে মুদ্রার মাধ্যমে খাজনা ও কর আদায় করতে থাকে, দ্বিতীয়তঃ জমির মালিকানা কৃষকদের পরিবর্তে ধনীর হাতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দিয়ে জমিদারী প্রথার সৃষ্টি করে। মুদ্রা প্রবর্তনের ফলে ইংরাজদের মুনাফার নগদ অর্থ ইংলণ্ডে পাচার করার সুবিধা

হয়ে যায়। ক্ষমতাদখল করে ইংরাজ বণিককুল 'নবাব' নামক এক দুর্বল ব্যক্তিকে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে বেশ কিছুকাল অধিষ্ঠিত করে রাখে। যাতে প্রজাদের ধোঁকা দেওয়া যায় যে, তারা নয় আসল শাসক তাদেরই 'নবাব'। কিন্তু রাজস্ব আদায় এবং তা সরাসরি লুঠের মালের মত ইংলণ্ডে প্রেরণের ক্ষমতা, সৈন্যবাহিনী রাখা, দুর্গ নির্মাণকরা, বিনাশুল্কে বাংলায় বাণিজ্য করার অধিকার ভোগ করে কোম্পানীর নিজস্ব কর্মচারীদেরও তদনুরূপ সুযোগ দান এমন ধরনের অধিকার সিরাজ-উদ-দ্দৌলার পরাজয় ও হত্যাকাণ্ডের পর কয়েকদশক বিনাবাধায় ইংরাজরা ভোগ করে। ইংরাজরা প্রথমে পশ্চিম ভারতে সমুদ্র পথে প্রবেশ করলেও তারা উপনিবেশ গড়ে তুলতে প্রথম স্থান হিসাবে বেছে নেয় সমৃদ্ধশালী রাজ্যদ্বয় বাংলা এবং বিহাব। সেখানেই এজন্য কোম্পানী তার সদরদপ্তর, সামরিক বাহিনী, আদালত সবকিছু স্থাপন করে। অনেক পরে রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতা, কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। মোগল আমলেব শেষদিকে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমগ্র দেশ জাতি ও গোষ্ঠী সংঘর্ষে ও অনৈক্যে ডুবে যায়। বিপুল ক্ষমতাভোগী জায়গীরদার, সুবাদার, আয়মাদার, আমীর ইত্যাদিরা মাথা তুলে দাঁড়ায় যারা দীর্ঘকাল বাদশাহের রক্ত চক্ষুকে ভয করতো। উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কার্ল মার্কস তাঁর 'ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ' সম্পর্কের অধ্যায়ে লেখেন—"মোগল সম্রাটের সামন্ত প্রতিনিধিরাই মোগল সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ ক্ষমতা চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেলে। সেই প্রতিনিধিদের ক্ষমতা চূর্ণ হয় মারাঠাদের হাতে আর মারাঠাশক্তি চূর্ণ হয় আফগানদের দ্বারা এইভাবে যখন সকলের বিরুদ্ধে লড়াই করছে তখন ব্রিটিশ শক্তি দ্রুত রঞ্চমঞ্চে প্রবেশ করে সকলকেই পরাভূত করতে সক্ষম হয়। ভারতবর্ষে এমন একটা দেশ, যাহা কেবল হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যেই বিভক্ত নয়, এদেশটা বিভক্ত গোষ্ঠীতে, জাতিতে জাতিতে। এখানে এমন একটা সমাজ আছে যার কাঠামোটা যে ভারসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সেই ভাবসাম্যের সৃষ্টি ঐ সমাজের সকল সভ্যের একটা অবসাদগ্রস্ত বৈরাগ্য ও চরিত্রগত স্বতন্ত্রতা থেকে।" ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থার এইরূপ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষনের জন্য চিন্তাবিদ কাল মার্কস নিজ সিদ্ধান্ত টানছেন নিম্নরূপে ঃ—"কোন বৈদেশিক শক্তির পর রাজ্যলোলুপতার শিকারে পরিণত হওয়া সেই দেশ ও সেই সমাজের অদৃষ্টের লিখন ছাড়া অন্য কিছু হওয়া অসম্ভব।" মোগল যুগের অবসানের পর এবং বাংলায় পলাশী যুদ্ধে দেশীয় নৃপতির পরাজয়ের ঘটনার পর প্রায় একদশক বাংলায় এবং সারা ভারতবর্ষে প্রকৃত পক্ষে কোন সরকারই ছিল না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে যার এক প্রকার অর্থ দাঁড়িয়েছিল সার্বভৌম ক্ষমতা দখলের যুগের সূত্রপাত।

১৭৫৭ সাল থেকে ১৭৬৭ সাল মীরজাফর আর ইংরাজ কোম্পানীর যৌথ শাসনে লুঠের নেশা চেপে বসেছিল। এরপরও অষ্টাদশ শতাব্দীকালের শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারও পাকা পোক্ত ভাবে ক্ষমতা পরিচালনা করার অধিকার পায় নি। আর এই সময়কাল জুড়ে চললো নৈরাজ্য ইংরাজ বণিকদের বাংলা বিহার জুড়ে তাণ্ডব। বহু রায়ত ও তন্তুবায় প্রমুখ কারিগর ভিটামাটি ছেড়ে বনেজঙ্গলে প্রাণের দায়ে আশ্রয় গ্রহণ করলো, কেউ হলো ফকির, কেউ হলো সন্ন্যাসী, বাকীরা মৃত্যুবরণ করলো।

পলাশী যুদ্ধের পর ইংলণ্ডের নিজস্ব ধনভাণ্ডারে পরিণত হলো বাংলা-বিহার এর সম্পদ। ব্রিটিশ মূলধনী শ্রেণীর পক্ষে, উঠতি শিল্পপতিদের পক্ষে ভারতবর্ষ হলো কাঁচামালের অফুরন্ত ভাণ্ডার। বাংলার অতি আদরের জগদ্বিখ্যাত কার্পাস তুলাজাত সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র আর কেলিকো বস্ত্র ইংলণ্ডে উৎপন্ন বস্ত্র অপেক্ষা শতগুণ উৎকৃষ্ট হওয়ায় ইংরাজরা বাংলার বস্ত্রশিল্পকে ধ্বংস, ছারখার করে ছাড়ল। ব্রিটিশ বস্ত্রের জন্য বাংলার বাজার উন্মুক্ত করে দিল। বাংলার হস্তচালিত তাঁতশিল্পের গৌরব অস্তমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রাম্য শিল্প ও সমাজের সংস্কৃতি ও তার অফুরন্ত জীবনী শক্তি হারিয়ে গেল।

এই ঘটনার পর্যালোচনা করেছিলেন কালমার্কস তাঁর বিখ্যাত 'British Rule in India' অধ্যায় রচনার সময়। মার্কসের রচনা থেকে এ সম্পর্কে নিম্নে কয়েক লাইন মাত্র উধৃতি দেওয়া হলো।

"যে হস্ত চালিত তাঁত ও চরকা এতদিন নিয়মিত ভাবে সুতা কাটুনি ও তাঁতী সৃষ্টি করতো সেই হস্ত চালিত তাঁত ও চরকাই ছিল প্রাচীন সমাজের ভিত্তি।

"অনধিকার প্রবেশকারী ব্রিটিশরা ভারতের তাঁত ও চরকা ভেঙ্গে চুরমার করে ইউরোপের বাজার থেকে ভারতীয় বস্ত্র বিতাড়িত করে ছাড়ে, এরপর হিন্দুস্থানকে পাকে পাকে জড়িয়ে ফেলে।"

এরপরই আছে কার্ল মার্কসের ভারতের সর্বনাশের চিত্র নিয়ে বিখ্যাত খেদোক্তি ঃ—
"যে দেশ তুলার জন্মস্থান বলে চিরপরিচিত, সেই দেশটাকেই তারা শেষ পর্যন্ত তুলাজাত দ্রব্য দিয়ে ঢেকে দিল।"

কার্ল মার্কস তাঁর মহান চিন্তার উদ্ভাবনীশক্তির সাহায্যে ভারতবর্ষের তৎকালীন পরিস্থিতির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষনের দ্বারা কিভাবে ব্রিটিশ জাতি ভারতের সনাতনী পুরাতন গ্রাম্যসমাজকে ভেঙ্গে দিল কিন্তু নতুন সমাজ ব্যবস্থার পত্তন না হওয়ায় যে বিরাট শূন্যস্থান সৃষ্টি হলো তার চিত্র তুলে ধরেছিলেন। ভারতের কৃষক কুলের ও তাঁতীদের মধ্যে তখন শ্বাসরোধকারী অবস্থা। মার্কস এদেশের অবস্থার প্রকৃত এবং নিখুঁত বিশ্লেষণ করেন নিম্নরূপ ঃ—

"বিভিন্ন সময়ের গৃহযুদ্ধ, বিভিন্ন আক্রমণ, সকল বিপ্লব, বিভিন্ন রাজ্যদখল, সকল দুর্ভিক্ষ এইগুলি হিন্দুস্তানের বুকের উপর যতই অদ্ভুত রকমের জটিল, যতই দ্রুত, যতই ধ্বংসকারীরূপে একটার পর একটা ঘটনা ঘটুক না কেন, এগুলো কোনসময়েই ভারতীয় সমাজের উপরিস্তর ভেদ করে একেবারে অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করতে পারেনি।"

এই প্রসঙ্গে মার্কস দায়ী করলেন ইংলণ্ডকে, যারা ভারতে অনধিকার প্রবেশ করে সে দেশের স্বাধীনতাটাকেই অপহরণ করলো, সমগ্র ধনসম্পদ লুঠ করে নিজ দেশে কিছু পাঠালো আর বাদবাকী নিজেদের পকেটে আত্মসাৎ করে নিল। ভারতবর্ষের সমাজে দেখা দিল বিরাট শূন্যতা, দুর্ভিক্ষ, হাহাকার, মৃতদেহের মিছিল। মার্কস ইংলণ্ডকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বলেনঃ—

"ইংলণ্ড ভারতীয় সমাজের মূল ভিত্তি এবং কাঠামোটা ভেঙ্গে ধুলিসাৎ করে দিল। সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে নতুনের সৃষ্টির কোন সম্ভাবনা দেখা দেয় নি। কোন নতুন সমাজ সৃষ্টি না হওয়ার কারণে ভারতীয়দের অসহনীয় দুঃখের জীবনে বিশেষ ধরনের একটা বিষণ্ণতার ভাব ফুটে ওঠে এবং বৃটেন দ্বারা শাসিত ভারতীয়রা তার সমস্ত প্রাচীন ঐতিহ্য ও ইতিহাস থেকে একেবাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।"

মার্কস অনুভব করেছিলেন পলাশীযুদ্ধের অবসানের দশবছর পব ইংরাজরা রাজস্ব আদায় এবং তা ভোগ করার অধিকার পেলো। কিন্তু বিনিময়ে কোন কর্তব্যেব কথা ছিল না। দেওয়ানি লাভের তিনবছরের মধ্যে দেখা দিল মড়ক, দুর্ভিক্ষ 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'। মন্বন্তরে প্রকৃতপক্ষে দেড়কোটির অধিক মানুষ মারা যায়। ইংরাজ কোম্পানী একটা 'দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ তহবিল' গ'ড়ে বাকী জীবিত লোকেদের ধোঁকা দেবার চেষ্টা করেছিল। ঐ তহবিলে ইংরাজ অনুচর, দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতক জগৎ শেঠ, রায় দুর্লভরাও চাঁদা দিয়েছিল। বাংলার রক্ত কলঙ্কিত ইতিহাসের পালা চুকে গেলে সঙ্ঘটিত হয়েছিল বাংলার বুকে বিখ্যাত 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' 'নীলবিদ্রোহ'. মেদিনীপুরের 'চোয়াড় বিদ্রোহ' ও কৃষক বিদ্রোহ, খণ্ড খণ্ড 'তন্তুবায়ীদের বিদ্রোহ,' 'রংপুর ও বীরভূমের বিদ্রোহ', 'পাইক বিদ্রোহ', এই ভাবেই অষ্টাদশ শতাব্দীর পরিসমাপ্তি ঘটে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনাকালে ভারত বিশেষতঃ পূর্ব ভারত রপ্তানীকাবক দেশ থেকে আমদানীকারক দেশে রূপান্তরিত হয় একথা মার্কস বিশ্লেষণ করে বলেন 'সমগ্র বিশ্বের বস্ত্রের কারখানা' সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে।

আর. পি. ডি. এবং বোল্ট ঃ—বিখ্যাত ইংরাজ কমিউনিস্ট নেতা ও লেখক রজনী পাম দত্ত তাঁর সুবিখ্যাত 'India, Today and Tomorrow' গ্রন্থে ঊনবিংশ শতাব্দীতে

কার্ল মার্কসকে অনুসরণ করে ভারতের শিল্প ধ্বংসজনিত তৎকালীন পরিস্থিতির নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন—"কেবল শিল্প প্রধান শহর ও গ্রামকেন্দ্রগুলোই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়নি সর্বোপরি প্রাচীন গ্রামীন অর্থনীতির ভিত্তিমূল, অর্থাৎ কৃষির সহিত কুটির শিল্পের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রচণ্ড আক্রমণে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। শহর ও পল্লী এলাকার লক্ষ লক্ষ সর্বস্বান্ত কারিগর ও হস্তশিল্পী, সুতাকাটুনি, তন্তুবায়ী, কুম্ভকার, চর্মকার, কর্মকার কেবল মাত্র কৃষির ওপর নির্ভর করা ছাড়া জীবন জীবিকার উপায় অবলম্বনের অন্যকোন পথের সন্ধান পায়নি। কৃষি ও সুচারু হস্ত শিল্পের দেশ ভারতবর্ষকে জোরজবরদস্তি যন্ত্রশিল্পের দ্বারা পণ্যোৎপাদনকারী বৃটিশ ধনতন্ত্রের এক কৃষি উপনিবেশে পরিণত করে। বৃটিশ শাসনের এই সময়কাল থেকে ব্রিটিশ শাসনের অনিবার্য প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে ভারতের কৃষির ওপর বিপুল কর্মচ্যুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির অত্যধিক চাপকে বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী 'জনসংখ্যার অত্যধিক চাপ' এই ভাবে প্রচাব কবতে থাকে।"

ব্রিটিশ লেখক আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের প্রখ্যাত নেতা কমরেড আর. পি. ডি এই মতের অনুসারী ছিলেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদই ভারতবর্ষের বুকে যথেচ্ছ লুণ্ঠন চালিয়েছিল এবং 'ব্রিটিশ ধনতন্ত্রের অধীন এক কৃষি উপনিবেশে পরিণত করেছিল'। যার ফলে লক্ষ লক্ষ কারিগর হস্তশিল্পী, সুতাকাটুনী, তন্তুবায়ী সর্বস্বান্ত হয়ে কর্মচ্যুত জীবনে কৃষির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল।

অপর একজন ব্রিটিশ ঐতিহাসিক উইলিয়ম বোল্ট ভারতে শিল্প ধ্বংস প্রসঙ্গে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছিলেন ঃ— "The Government of India never ceased granting previleges to Britishers. It was brought out in evidence before Parliamentary Committee of 1858 on the colonisation of India, how these previleges were given to them at the expense of the children of Indians soil"

(Ruins of Indian Industry' by Major B. D. Basu. p. 114)

বোল্ট নিজে একজন উপনিবেশবাদী দেশের সন্তান হয়েও নিরপেক্ষ লেখক হিসাবে নিশ্চয়ই সুপরিচিত ছিলেন। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছিলেন ব্রিটিশ বণিক শাসক শ্রেণীর বাংলার শিল্প ধ্বংসের নিপুণতার কথা। বোল্ট স্বাধীন ভাবে মতামত প্রকাশ করে লেখেন ঃ— "In the unrestrained exercise of every species of violence and injustice, are suffered to monopolise not only the manufacturers but the manufacturers of Bengal and thereby totally repel that for greater influx of wealth which used to sttream in

from the commerce of Asia and at the same time, while they are continually draining off from thence immense seems annually for China, Madras, Bombay and other places, the consequence can not prove other than beggary and ruin to those inestimable territories" (Ibid)

বাংলায় শিল্প বলতে তখন প্রধানত তাঁত শিল্পকেই বোঝাত, ব্রিটিশরাই যে সেই মহান শিল্পটি ধ্বংস করে দেয় উইলিয়াম বোল্ট সোচ্চারে সে ঘটনার কথা প্রকাশ করে দিতে সাহসের অভাববোধ করেন নি যা তৎকালীন ভারতীয় বা বাংলার লেখক, সাহিত্যিক, নাট্যকার, কবি বা সমাজ সংস্কারকরা ভুলেও কোথাও উল্লেখ করেননি।

কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে বিশিষ্ট রাজনৈতিক ভাষ্যকার সুপ্রকাশ রায় রচিত বিখ্যাত 'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম' (১ম সংস্করণ) গ্রন্থের পৃষ্ঠায় ভারতে ব্রিটিশ শাসনে কোম্পানী কর্তৃপক্ষ একদিকে কৃষকদের অপরদিকে গ্রামীণ কারিগর হস্ত শিল্পীদের সর্বস্বান্ত করার মহান দায়িত্ব কত সুচারুরূপে সম্পাদনের দক্ষতা অর্জন করেছিল তার 'বর্ণনা পাই নিম্নরূপ ঃ—

"বৃটিশ শাসন বঙ্গদেশ ও ভারতেব অন্যান্য অংশে বলপূর্বক যে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা প্রচলন করে তাহার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল এরূপ একটা বিশেষ অর্থনৈতিক শোষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, যাহাতে ভারতীয় কৃষক কেবল বৃটিশ শিল্পের কাঁচামালেব চাহিদা পূরণ করিবে এবং বৃটিশ কলকারখানায় যন্ত্রদ্বারা উৎপন্ন পণ্যসম্ভার ক্রয়করিবে।"

ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কৃষিক্ষেত্রে পুরানো সামন্ততান্ত্রিক প্রথাব অর্থাৎ মোগল যুগের উৎপন্ন ফসলের একাংশের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় বা গ্রাম সমাজের দ্বারা রাজস্ব প্রদান, জমির ওপর মালিকানা বাদশাহ বা নবাব ইত্যাদির অবসান ঘটিয়ে নতুন যে জমিদারী প্রথা বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কৃষকদের ওপর অত্যাচার চালানো বা প্রভূত রাজস্ব আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট সময়েব মধ্যে জমিদার কোম্পানী তহবিলে রাজস্বের ভাগ আদায় দিতে না পারলে 'জমিদারী ফৌত' বা বাজেয়াপ্ত হওয়ার আইন ইত্যাদি রচনা করে ভূমিব্যবস্থায় যে পরিবর্তন সাধনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল বা গ্রামাঞ্চলে শস্যের পরিবর্তে মুদ্রা অর্থনীতির যে প্রচলন করেছিল তার ফলে "বস্ত্র, রেশম, লবণ প্রভৃতি কৃষকদের শিল্পগুলিকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করা হয়। দেশীয় শিল্পগুলির ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ পণ্যদ্বারা সমস্ত দেশ প্লাবিত করা হইতে থাকে।" এর পর আর এই বিষয়ে বেশি ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয় না।

ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ঃ— দুর্ভিক্ষ সৃষ্টিকর্তাদের ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ অন্যত্র চলতে থাকে বাংলা, বিহার ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষের শাসন কার্য পরিচালনার ভার ব্রিটিশ জাতি গ্রহণের পর যতকাল এদেশে শাসকশ্রেণী রূপেক্ষমতাসীন ছিল। এককথায় ভারতে ব্রিটিশ যুগের অর্থই হলো দুর্ভিক্ষ মহামারীর যুগ।

১১৭৬ বঙ্গাব্দের 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' এর প্রসঙ্গ আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে, ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর ভারতে এবং ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারতে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ দেশটাকে গ্রাস করে এবং কয়েক লক্ষ ভারতীয়র মৃত্যু হয়। তারপরের শতাব্দী অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলাদেশ অব্যাহতি পেলেও বোম্বাই, রাজপুতনা, উ. প. সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব ও উত্তর ভারত দুর্ভিক্ষের আক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি। সব মিলিয়ে এক কোটিরও অধিক মানুষের প্রাণহানি ঘটে। এরপরে শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশে দুর্ভিক্ষের বারংবার পুনরাবির্ভাব ঘটে এবং পাঁচ লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু হয়। দ্বিতীয়ার্ধের একদশকের মধ্যে উড়িষ্যা, বিহার, বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে সবকিছু শুনশান হয়ে যায় এবং সাতলক্ষাধিক মানুষের জীবনহানি ঘটে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের দ্বিতীয় শতক অর্থাৎ ষাটের দশকের থেকে বিংশ শতাব্দীর সূচনা কাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি রাজ্যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয়। এ বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নরূপ ঃ—১৮৬৮ খ্রীঃ- ১৯০১ খ্রীঃ এর মধ্যে রাজপুতনায় মৃত্যু (১৮৬৮-৬৯ খ্রীঃ) ১২ লক্ষ ৫০ হাজার, উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশে ৬ লক্ষ, পাঞ্জাবে ৬ লক্ষ, মধ্যভারত ২ লক্ষ ৫০ হাজার এবং বোম্বাই। ১৮৭৩-৭৪ খ্রীঃ বাংলা, বিহার, অযোধ্যা ও উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ। ১৮৭৬-৭৭ খ্রীঃ বোম্বাই, মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ, মহীশূর, অযোধ্যা ও উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশে। মোট মৃত্যু সংখ্যা এক কোটি ৪ লক্ষ।

১৮৮০ খ্রীঃ দাক্ষিণাত্যে, বোম্বাই, মধ্য প্রদেশ, হায়দ্রাবাদ এবং উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ। ১৮৮৪ খ্রীঃ বাংলা, বিহার এবং মাদ্রাজ।

১৮৮৬-৮৭ খ্রীঃ মধ্যভারত।

১৮৮৮-৯০ খ্রীঃ বিহার, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, কুমায়ুন, গাড়োয়াল। মৃত্যু সংখ্যা ১৫ লক্ষ।

১৮৯১-৯২ খ্রীঃ মাদ্রাজ, বোম্বাই, দাক্ষিণাত্য ও বঙ্গদেশ। মৃত্যু ১৬ লক্ষ ২০ হাজার।

১৮৯৫-৯৭ খ্রীঃ বুন্দেল খণ্ড, উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ, অযোধ্যা, বাংলা ও মধ্যভারত মৃত্যু সংখ্যা ৫৬ লক্ষ ৫০ হাজার।

১৮৯৯-১৯০১ এই দুইসালের মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষ পুনরায় দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে এবং মোট বত্রিশ লক্ষাধিক মানুষের জীবনহানি ঘটে। প্রাপ্ত হিসাবে দেখা যায় যে ব্রিটিশ সরকারী সূত্র অনুযায়ী ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে মোট ২ কোটি ৮৮ লক্ষ ২৫ হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটে। আরেকটি হিসাব আছে। সেটি হলো ভারতে রেলপথ প্রবর্তনের পূর্বে ও পরে ১৮০২ খ্রীঃ থেকে ১৮৫৪ খ্রীঃ এর মধ্যে দুভিক্ষে মৃত্যু সংখ্যা ৫০ লক্ষ ছাড়িয়ে যায় এবং রেলপথ প্রবর্তনের কাল থেকে দুই দশকের মধ্যেই ষোলটি রাজ্য দুর্ভিক্ষ পীড়িত হয় এবং মোট মৃত্যু সংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষ ছাড়িয়ে যায়।

(উক্ত হিসাবের সূত্র ঃ এস. কে. চ্যাটার্জী প্রণীত 'দি ষ্টার্ভিং মিলিয়নস' এবং সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত 'দেশের কথা'। এ তথ্যও জানা গেছে সুপ্রকাশ রায় প্রণীত 'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গনতান্ত্রিক সংগ্রাম' গ্রন্থ থেকে)

বিংশ শতাব্দীতেও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বারে বারে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয়, অবিভক্ত বাংলায় 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' (বাংলা ১৩৫০ সাল, ইং ১৯৪২ খ্রীঃ থেকে ৪৬ খ্রীঃ) এবং পশ্চিমবাংলায় ১৯৫৯ খ্রীঃ, ১৯৬৬ খ্রীঃ এবং ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে প্রতিবারই কয়েক হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটেছিল। স্বাধীনতার পর পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেস রাজত্বে এই ভয়াবহ ঘটনা ঘটে বারবার।

ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে ভারতবর্ষে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হওয়ার মূলে অনেক কারণ ছিল। ইংরাজরা এদেশে এসেছিল বণিকের বেশে, পরিণত হয়েছিল বিশ্বের সবচেয়ে সেরা লুঠেরা জাতিতে। মানুষের প্রতি সামান্যতম মানবিকতাবোধও তাদের মধ্যে ছিল না। দুর্ভিক্ষে মারা যাচ্ছে রায়ত চাষী আর গ্রামীণ কারিগররা, তাদের রক্ষা করা তো দূরের কথা, মৃতপ্রায় মানুষদের কাছ থেকে কর ও খাজনা আদায়ের জোর জুলুমই বন্ধ করা হয় নি। উল্টে অত্যাচারের ষ্টীম রোলার চালানো হয়।

যারা মারা যাচ্ছে তাদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ব্রিটিশ সরকার জমিদারদের হাতে তুলে দিত। যারা খাজনা এবং নানাবিধ কর দিতে পারে না তাদের জমিজমা থেকে অস্থাবর স্থাবর সবকিছু কেড়ে নিয়ে জমিদার ও ইংরাজশাসকরা ভাগাভাগি করে নিত।

ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং 'সিপাহী মহাবিদ্রোহ' এর পরে রাণী ভিক্টোরিয়ার শাসন কালে অর্থাৎ সরাসরি ইংলণ্ডের খোদ রয়াল সরকারের অধীনে থাকাকালীন দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য কোন সামান্যতম ব্যবস্থা গ্রহণের কথা আদপেই চিন্তা করা হতো না। সরকারের রাজনৈতিক ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ না ঘটায় অসহায়ের মতো মানুষ মৃত্যু বরণ

করতো। রায়ত চাষী পরিণত হয় ভূমিহীন কৃষিশ্রমিকে, তাঁতী পরিণত হয় তাঁতবিহীন তাঁত শ্রমিকে। সপ্তদশ শতাব্দী জুড়ে মসলিন বাজার ভয়াল আক্রমণ প্রতিরোধে পরাস্ত ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় তন্তুবায়ী পরিবারগুলো। তন্তুবায়ী সমাজ উনবিংশ শতাব্দীতে মৃত্যুর মিছিলে সামিল হয়। তাঁত শিল্পও ধ্বংসের কবলে নিশ্চিহ্ন প্রায়। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর সাতের দশক পর্যন্ত বাংলা এবং পরবর্তীকালের পশ্চিমবাংলা রূপান্তরিত হয়েছিল সোনার বাংলা থেকে দুর্ভিক্ষের বাংলায়।

অত্যাচারী কোন সরকারই জনগণের অভাব অভিযোগ বা অন্নকষ্টের খবর রাখে না। অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দী এই দুই শতকেই বাংলার নদী, খাল সবচেয়ে দুর্দশায় পরিণত হয়। প্রশস্ত নদীবক্ষ পলির চড়া পড়ে ভরাট হয়ে যায়। নৌচলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাণিজ্য যাত্রা স্তব্ধ হয়। পথপরিবহন ব্যবস্থারও চরম অবনতি ঘটে। মোগল আমলে যে সমস্ত পরিবহনযোগ্য রাজপথগুলি ছিল তাও সংস্কার না করার ফলে দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষজনের কাছে স্বাভাবিক ভাবে খাদ্য পৌঁছে দেওয়াও সম্ভব হয় নি। ব্রিটিশ নতুন করে কোন বিশেষ রাজপথ নির্মাণে হাত দেয়নি। যেটুকু করেছিল তা তাদের ব্যবসার খাতিরে। যেমন হাওড়ায় হুগলী নদীর ওপর ব্রীজনির্মাণ বা বালীর 'ওয়েলিংটন ব্রীজ', ভাগীরথীর ওপর ব্যাণ্ডেল-নৈহাটি রেলওয়ে ব্রীজ (জুবিলী ব্রীজ) ইত্যাদি। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রধান অবদান হলো মসলিন শিল্পের ধ্বংসসাধন, তাঁতী ও রায়ত চাষীদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া এবং দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির কৃতিত্ব। দুর্ভিক্ষ চলাকালীন বাংলায় এবং ভারতের অন্যান্য রাজ্য থেকে উৎপন্ন খাদ্যশস্য এদেশের মানুষের কাছ হতে জোরপূর্বক কেড়ে নিয়ে জাহাজযোগে ইংলণ্ডে প্রেরণ করার প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে স্বাধীন দেশের কেন্দ্রীয় সরকারে যখন যারা এসেছে তারাও ব্রিটিশ নীতি অনুসরণ করে এদশের শস্য বিদেশে অবাধ রপ্তানী করার সুযোগ দিয়ে ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিপতি শ্রেণীর সেবা করে যাচ্ছে অর্থাৎ 'সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে'। তখনও সেচব্যবস্থার উন্নতিবিধানের কিছুই করা হয়নি। স্বাধীন দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিও অপরিবর্তিত। নদীগুলি মজে যাচ্ছিল সংস্কারের অভাবে। বিখ্যাত ফরাসী ঐতিহাসিক পিনো দুক্লো (Pineak Duclos)র উক্তি "প্রকৃতি খাদ্য দান করে আর মানুষ সৃষ্টি করে দুর্ভিক্ষ।' এই উক্তির যথার্থতা প্রমাণিত সত্যে পরিণত করেছেন নোবেল জয়ী প্রখ্যাত অর্থনীতিবদ অমর্ত্য সেন।

পঞ্চাশের মন্বন্তর' (১৩৫০ বঙ্গাব্দে) সম্পর্কে অধ্যাপক অমর্ত্য সেন ঃ

অধ্যাপক সেন অতি সম্প্রতি তাঁর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর কলকাতায় অনুষ্ঠিত সম্বর্ধনা সভায় যোগ দিতে এসেছিলেন। চাক্ষুস অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করে বলেন যে, যখন তার বয়স মাত্র নয় বছর ঢাকা শহরে গ্রামাঞ্চল থেকে হাজার হাজার মানুষ ক্ষুধা ও অনাহারের জ্বালায় প্রবেশ করে। গ্রামে মানুষ অনাহারে মারা যাচ্ছিল। এই সময় অর্থনীতিতে তেজীভাব আর যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি। জাপানীরা বার্মাসীমান্তে ব্রিটিশের কাঁধে নিঃশ্বাস ফেলছিল। যুদ্ধ মোকাবিলায় ব্রিটিশরা সেনাবাহিনীর জন্য দেদার খরচ করছিল। এই সময় রাজপথে সৈন্য চলাচলের জন্য প্রচুর উন্নতি ঘটে। কিছু অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঘটছিল আর হচ্ছিল মূলতঃ শহরের মানুষদের জন্য। আবার মুদ্রাস্ফীতির হারও প্রবল। মানুষ খাদ্য কিনতেই পারছে না হাতে পয়সা নেই। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা শূন্য।

মৎস্যজীবিদের চরম দুর্দশার কথার উল্লেখ করেন অধ্যাপক ডঃ সেন। সাধারণ মানুষের হাতে পয়স' না থাকায় মানুষ মাছ কিনছিল না (অথচ বাঙ্গালী থাকে মাছে ভাতে) আর এর ফলে মৎস্যজীবিরা গভীর সঙ্কটের মুখে পড়ে, কারণ মাছের দাম বিশ্রীভাবে পড়ে যায়। দুবেলা দুমুঠো পেটের ভাতের সংগ্রহ করতে অক্ষম দরিদ্র মানুষেরা মাছ খাওয়ার কথা চিন্তাই করতো না।

অধ্যাপক সেনের অভিমত এই যে, কোন দুর্ভিক্ষেই মোট জনসংখ্যার দশ শতাংশের বেশি মানুষ আক্রান্ত হয় না বা মারা যায় না। যদিও সংখ্যার বিচারে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা দাঁড়ায় বিরাট অঙ্কে। তিনি বলেছেন যে, এই পরিসংখ্যান আফ্রিকার দুর্ভিক্ষগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আক্রান্তের পরিমাণ ছিল তিন থেকে চার শতাংশ। যদি সেগুলিও ছিল খুবই বড় আকারের দুর্ভিক্ষ। লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গেলেও যদি প্রকৃত কল্যাণ অর্থনীতি সেইদেশের শাসকশ্রেণী অনুসরণ না করে তবে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ হয় না। সরকার উদ্যোগ নেয় না। সরকার দায়সারা ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। অধ্যাপক সেনের বক্তব্যের সারমর্ম এই যে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয় সরকারের গাফিলতী এবং উদাসীনতার কারণে, খাদ্যের অভাবে নয়। খাদ্য উৎপাদনে প্রাচুর্য থাকলেও মানুষের যদি ক্রয়ক্ষমতা না থাকে তবে খাদ্যের অভাবে মানুষ মারা যাবেই।

'পঞ্চাশের মন্বন্তর' এর পর ব্রিটিশ সরকার একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করে ছিল। ঐ 'Famine Enquiry Committee'র রিপোর্টেই উল্লেখিত হয়েছে যে ঐ সময়ে বাংলা প্রদেশে ৩৫ লক্ষাধিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, তৎকালীন বাংলার লোকসংখ্যা ছিল ৬ কোটী। তার মধ্যে ২ কোটী মানুষ দুর্ভিক্ষে সাঙ্ঘাতিক ভাবে আক্রান্ত হয়। বাংলা প্রদেশে তখন মহকুমার সংখ্যা ৯০। তার মধ্যে ২৯টি মহকুমা ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছিল। বাংলার তৎকালীন আয়তন ৮২, ৯৫৫ বঃ মাইল, এর মধ্যে ২৯, ৬৬৫ বর্গমাইল এলাকার সমস্ত মানুষই দুর্ভিক্ষ পীড়িত হয়।

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা প্রদেশের তৎকালীন নেতা এবং সুলেখক ভবানী সেন 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' সম্পর্কে 'রুরাল বেঙ্গল ইন্ রুইনস' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। সেই গ্রন্থটি জাতীয় গ্রন্থগার কক্ষে সযত্নে রক্ষিত আছে। উপরোক্ত সরকারী ভাষ্যটি ঐ গ্রন্থ থেকেই সংগৃহীত। জাতীয় গ্রন্থাগার কক্ষে বসে ভবানী সেন 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে দুর্ভিক্ষের ভয়াল চিত্র সম্পর্কে বলেছেন যে পঞ্চাশের মন্বন্তরে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে তন্তুবায়ীদের। বাংলায় তৎকালীন সময়ে দুই লক্ষ তন্তুবায়ী ছিল। তিনজনের সদস্য পরিবার পিছু হিসাব করলে প্রায় বারো লক্ষ তাঁতশিল্পী ছিল তন্তুবায় সমাজে। ঐ সময়ে ভারতবর্ষের বাংলায় বস্ত্রের মোট চাহিদার এক চতুর্থাংশ বাংলার তাঁতীরাই সরবরাহ করতো। মন্বন্তরের প্রকোপে সেই তাঁতশিল্পীরা যারা অন্ততঃ জীবিত ছিল তারা কর্মহীন হয়ে, অথবা তুলা ভয়ঙ্কর দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য হওয়ার কারণে তাঁত বিক্রী বা বন্ধক দেওয়ার কারণে কর্মহীন অবস্থায় ভবঘুরেদের মতো অথবা দিনমজুরে পরিণত হয়ে ভূমিদাসত্ব গ্রহণে বাধ্য হয়েছিল। অথচ এদেরই শৈল্পিক জ্ঞানগরিমায় প্রস্তুত হতো এককালের মসলিন এবং সিল্ক বস্ত্র যা ছিল শুধু ভাবত বিখ্যাত নয়, ছিল জগদ্বিখ্যাত।

কমিউনিষ্ট নেতা ভবানী সেন বগুড়া জেলার দস্তিকা নামক একটি গ্রামের উল্লেখ করেছেন যে গ্রামে দুইশত তাঁতীপরিবার বাস করতো। লুমের সংখ্যা সেখানে ১৭৩। এদের মধ্যে আবার ২৫ জনের ৪ বা ৫ বিঘা মাথাপিছু চাষযোগ্য জমিও ছিল। 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' পঞ্চাশ জনের মতো তাঁতীকে জীবিত রেখেছিল। শহরে যে সমস্ত লঙ্গরখানা চালু হয়েছিল সেখানে তারা কিছু খেয়ে বেঁচে থাকতো। ষাটজন মারা যায় এপিডেমিক রোগে। ২৫ জনের মোট ৫২ বিঘা জমি ছিল তারা সেসব বিক্রী করে দিয়ে ক্ষেতমজুরের জীবিকায় নেমে পড়ে। কিছু তাঁতী অবশ্য মন্বন্তরের মওকা বুঝে ইংরাজদের সঙ্গে মিত্রতা পাতিয়ে 'মহাজন' বনে যায়। আর এই সব নবোদ্ভিন্ন মহাজন শ্রেণীর কাছে দরিদ্র তাঁতীরা নিজেদের তাঁতগুলো বন্ধক রেখে মহাজনের অধীন পিসরেটে মজুরীর বিনিময়ে 'লুমলেশ উইভার্স' বা তাঁতবিহীন তাঁত শ্রমিকে পরিণত হয়। (জনযুদ্ধ পত্রিকা, ১৫-৩-৪৫)

ভবানী সেনের রচনায় গ্রামীন কারিগরদের কালোবাজার থেকে প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল কিনতে বাধ্য করার পিছনে যে সকল কারণ নিহিত ছিল তারও উল্লেখ আছে। তাঁতীদের প্রয়োজনের সুতা, কর্মকারদের লোহা, জেলে বা মৎস্যজীবিদের জাল, মৃৎশিল্পীদের মাটি, জুতা প্রস্তুতকারকদের চামড়াজাত দ্রব্য প্রভৃতি গ্রামীণ কারিগরদের কাঁচামাল সবই সংগ্রহ করতে হতো ব্ল্যাক মার্কেট থেকে। এর ফলে গরীব মানুষদের সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করার কাজটি পিছনে পড়ে থাকতো। যে সমস্ত দরিদ্রমানুষ তখনও জীবিত ছিল তারাও একে একে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হয়। তাদের অবস্থা তখন একেবারেই সর্বনাশা। উদ্ধৃত কথাটা ছিল এইরূপ ঃ—

"The village craftsman are in a helpless state, being reduced to paupers without a prop".

(The Faminie, 1943' by Bhabani Sen. P. 14)

ভবানী সেন লিখেছেন কিভাবে বিদেশী ইংরাজদেব রাজত্বে এদেশের বুকে সর্বনাশ হয়েছিল ঃ—

"Thanks to foreign rule, Bengal's economy and society were already being undermined and weakened year by year and these have not the strength to stand up to strain of war crisis.

War had not sullied Bengal's soil. The foreign invador could not set his foot on Bengal, yet the impact at the crisis has sent Bengal's societies and economy to tottering like a house of cards."

ভবানী সেনের মতে ১৯৪৩-৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা প্রদেশে মন্বন্তর ঘটানো হয়েছিল। এটা নিছক খাদ্য সংকট থেকে উদ্ভুত ছিল না। তিনবৎসর যাবৎ দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি চলছিল কিন্তু দেশ তখন পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ। বিদেশী ইংরাজরা গোটা দেশে লুঠপাঠ চালিয়ে আমলাতান্ত্রিক কাজকর্ম, আমলা ও শাসক বর্গের নিপাট দুর্নীতি দেশটাকে ইতিমধ্যেই শ্মশানে পরিণত করে ছেড়েছিল। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল। এমনিতেই সবকিছুরই আকাল, যুদ্ধে ইংরাজ পক্ষ যাতে জিততে পারে তার জন্য শাসক ইংরাজদের মরীয়া প্রয়াস। খাদ্য, রসদ সব কিছু সৈন্যবাহিনীর জন্য, জনগণের জন্য নয়। ইংরাজদের জন্মদেওয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রাপ্ত সেই জমিদার, রাজা মহারাজারাও ইংরাজদের পাশে দাঁড়িয়ে যায়। দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে জনগণকে বাঁচানোর জন্য তারা কপর্দকও ব্যয় করে নি। ইতিমধ্যে কৃষিকার্য ধ্বংস প্রাপ্ত। শিল্পব্যবস্থা জাহান্নামে, সামাজিক শৃঙ্খলা অস্তিত্বহীন,

সব কিছুই যুদ্ধ গ্রাস করেছিল। তারসঙ্গে দাপটে বিচরণ করেছে কালোবাজারীর দল ; ব্যবসায়ী মুনাফাখোর, লোভীর দল।

ভবানী সেনের এ সম্পর্কে নিজের বিশ্লেষণ নিম্নরূপ ঃ—

"The Bengal Famine of 1943 was not mere food scarcity of a year, with the country in bondge, the regime of the bureacracy coupled with the influene of the Permanent Zamindari Settlement had so crippled Bengal's agriculture, industry and even society life, that the war crisis led to famine........

....Out of Bengal's 6 crore population, the famine severely hit the lives of 2 crores........."

'পঞ্চাশের মন্বন্তর' এর তিনবৎসর ছিল ভারতবর্ষের বুকে ঐতিহাসিক অরাজকতা আর বিশৃঙ্খলার যুগ। শাসকশ্রেণী বিদেশী জাতিভুক্ত, তাদের মায়া মমতা নিজদেশ ইংলণ্ডের প্রতি, এদেশের মানুষদের জন্য নয়। এদেশের সোনা, এদেশের মুদ্রা, এদেশের খাদ্য শস্য, এদেশে প্রস্তুত তাঁতবস্ত্র, এদেশের যাবতীয় সম্পদ তখন যুদ্ধের বিশাল কামান, আর গোলা কিনতে আর ইংরাজ গোরা-সৈন্যদের বিলাসব্যসনের ব্যয় নির্বাহের জন্য চালান দেওয়া হতো। অর্থনৈতিক দুর্দশায় জর্জরিত মানুষের সংসার ধ্বংস হয়ে যায়। সামাজিক নিরাপত্তা ও মর্যাদা লুঠ হয়েছে, নিরন্ন মানুষ মৃত্যুর মিছিলে শামিল হয়েছে। তথাপি এই কালে অভুক্ত দরিদ্রতম মানুষগুলো কিন্তু বিদ্রোহ করেনি। না খেতে পেয়ে মরেছে তবু লুঠপাঠ করেনি। জমিদার, মহাজন মজুতদার কালোবাজারীদের সরকার কর্তৃক অনুগৃহীত এবং ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট বা বোর্ডের সদস্য হওয়ার সুবাদে সামাজিকভাবে সম্মানিত এবং তাদের সম্পদ সুরক্ষিত থাকতো বৃদ্ধি পেতো।

মন্বন্তরের যুগে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের বাড়ি ইংরাজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এসে খানাপিনা করছে এসব দৃশ্য চাক্ষুস অবলোকন করে গরীব মানুষ প্রেসিডেন্ট যিনি কালোবাজারীদের পাণ্ডা তাকে দূর থেকে কুর্নীশ জানাতো। তখন কোন প্রত্যক্ষ নির্বাচন হতো না। ১৯৩৭ সালে ধনীমিলমালিক, জমিদাররা পরোক্ষ ভোটে প্রেসিডেন্ট ও বোর্ড সদস্য সমাজের কর্তারূপে এবং আইনসভার সদস্যরা 'আইনরচয়িতা' বা 'আইন' রক্ষক হিসাবে প্রচুর সম্মান অর্জন করতো। দুর্ভিক্ষের মওকা হাতের মুঠোয় পেয়ে এইসব রক্ষকেরাই পরে ভক্ষকের খোলস পরে বুক ফুলিয়ে 'সাধু'সেজে লঙ্গর খানায় একহাতা 'খিচুরী' পাওয়ার আশায় উদ্বিগ্ন ভাঙা টিনের থালা হাতে দণ্ডায়মান আবাল বৃদ্ধবনিতার সামনে 'ত্রাণকর্তা' রূপে নিজেদের জাহির করতো।

'পঞ্চাশের মন্বন্তর' এর চিত্র কিরূপ করুণ ছিল যাঁরা তা প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁদের কেউ কেউ অনেকেই এখনও জীবিত আছেন। সেই কালের চিত্র যেন তাঁদের তাড়া করে বেড়ায়। ধনী মধ্যশ্রেণীর স্বচ্ছল পরিবারের গৃহের সম্মুখে তোবড়ানো ভাঙ্গা থালাবাটি হাতে উলঙ্গ-অর্ধ উলঙ্গ মানুষগুলো একমুঠো ভাত নিদেনপক্ষে এক বাটী ভাতের ফ্যান পাওয়ার আশায় দীর্ঘক্ষণ নীরবে অপেক্ষমান এই ছবির কথা অধ্যাপক অমর্ত্য সেনও ঘুরিয়ে বলেছেন। অধ্যাপক সেন দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে যে সমস্ত উপায় অবলম্বনের কথার উল্লেখ করেছেন দুর্ভিক্ষের যুগে সেগুলির একটারও অস্তিত্ব ছিল না। শাসন ছিল, শাসক ছিল, শাসিতরা ছিল, ছিল না কেবল মানুষের মধ্যে আত্মমর্যাদা আর স্বাধীনতাবোধ। ক্ষুধার তাড়নায় রায়ত কৃষক. মজুর, তন্তুবায়ী, বা গ্রামীণ কারিগরের স্বীকৃতি পাওয়া মানুষগুলো কোথাও কোথাও শেষ পর্যন্ত ডাকাতি কবতে নেমে পড়েছিল নিরন্ন পরিবারের সদস্যদের বাঁচানোর তাগিদে। শেষপর্যন্ত তাদের স্থান হতো হয় জেলখানায়, নয়তো ফাঁসিকূপে।

অধ্যাপক সেন আমাদের দেশের কৃতী সন্তান। তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রতি দিল্লীর শাহেনশারা মর্যাদা না দিলেও পঃ বাংলার তথা জাতীয় নেতা মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু দিয়েছেন, বামফ্রন্ট সরকার দিয়েছে, কলকাতা পৌরসভা তাঁকে সম্মানিত করেছে। অধ্যাপক সেন বলছেন প্রত্যেক মানুষের পাঁচপ্রকার স্বাধীনতার কথা। প্রত্যেক মানুষ যেন স্বাধীন ভাবে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করতে পারে। তিনি নিজেকে মুক্তবাজার অর্থনীতি বা নিয়ন্ত্রিত বাজার অর্থনীতি বা সমাজতান্ত্রিক বা জনগণতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতি কোনটাকেই দুর্ভিক্ষ-অনাহার প্রতিরোধে একমাত্র হাতিয়ার রূপে মনে করেন না। তিনি বলেছেন যে, এর জন্য প্রত্যেক মানুষের পাঁচ ধরনের স্বাধীনতার সুযোগ থাকা জরুরী। যেমন,

1. Enabling freedom বা প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়ার অধিকার

2. Economic freedom বা জনকল্যাণ অর্থনীতির প্রয়োগ। প্রত্যেক মানুষের প্রয়োজন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা।

3. Transparency freedom বা সরকারের কাজকর্মের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি দেওয়ার প্রতি মানুষের অধিকার। সরকারের যাবতীয় কাজকর্মের স্বচ্ছতা। সরকার যা করছে তা জানার অধিকার।

4. Protective freedom বা বেকার হয়ে পড়া মানুষদের রক্ষা করার দায়িত্ব সরকারের। মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগে জনগণের আর্থিক অবস্থান কিছুটাও উন্নতি ঘটানোর জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ। কেবল প্রাকৃতিক কারণ বা দুর্যোগের জন্যই নয়, সরকারের নীতির জন্যও মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ে।

5. Political freedom বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা। মানুষ তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে। ভোটাধিকার হবে সার্বজনীন। জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার সর্বদাই জনগণের কল্যাণকর অর্থনৈতিক নীতিগ্রহণ করবে এবং সেই গৃহীত নীতি প্রকৃত অর্থেই সরকার কার্যকরী করবে। কোন স্বৈরাচারী সরকার দেশে ক্ষমতাসীন থাকলে মানুষের দুর্গতি রোধ করা অসাধ্য হয়ে দাঁড়াবে।

❑ বিদ্রোহী বিশ্বনাথ বাগ্দীর বর্ণনা ❑

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইংরাজদের ভারত শাসন শোষণ ব্যবস্থা যখন একেবারে পাকা পোক্ত তখন অনাচার, স্বৈরাচার, কালোবাজারী আর অনাহার-দুর্ভিক্ষের হাত থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করতে ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন নদীয়া জেলার বিদ্রোহী কৃষক বিশ্বনাথ বাগ্দী। ইংরাজরা নীলচাষী ও তন্তুবায়ীদের ওপর যুগপৎ আক্রমণের ধারা অব্যাহত রাখায় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে গ্রামবাংলায় কান্নার রোল উঠেছিল, ইংরাজ কুঠিয়ালরা কুঠি বা ফ্যাক্টরী থেকে এই আক্রমণ পরিচালনা করতো। তাদের সহায়তা কবতো স্থানীয় মুৎসুদ্দী বুর্জোয়া জমিদাররা, মহাজন, আয়মাদার, গোমস্তা, দারোগা, সিপাই, পিয়নদের দলবল। শান্তিপুর তখন তাঁতশিল্পের ঘাঁটি। এখানকার উৎকৃষ্ট বয়নের বস্ত্রের আন্তর্জাতিক মানের খ্যাতি তখন তুঙ্গে। শান্তিপুর ফ্যাক্টরীর কথা আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করেছি। শান্তিপুরে তন্তুবায়ীরা ইংরাজ কুঠিয়ালদের অত্যাচারেব ফলে প্রায় ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছিল। ইংরাজরা জোরপূর্বক তাঁতীদের উৎপন্ন মহামূল্য বস্ত্র সম্ভার (সিল্ক, সুতি, এবং মসলিন) কেড়ে নিত। উপযুক্ত মূল্য কোনদিনই তাঁতীদের ভাগ্যে জুটতো না। এর সঙ্গে জুটতো দৈহিক অত্যাচার, নির্জন কারাবাস, প্রকাশ্য লাঞ্ছনা, অপমান এমন কি অত্যাচারের ফলে মৃত্যু। শেষ পর্যন্ত শান্তিপুরের তাঁতীরা প্রতিদিনই ঘণ্টা বাজিয়ে ইংরাজ কুঠিয়ালের সম্মুখে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ জানাতো।

নীলকুঠির সাহেবরা অনুরূপভাবে নীল চাষীদের ওপর অমানুষিক দৈহিক অত্যাচার চালাতো। যে চাষী নীলচাষ করতে অপারগ হতো, অস্বীকার করতো, তাকে 'কয়েদ' করা হতো, যে জমিদার নীলকর সাহেবকে নীলচাষের জন্য জমিদারী ইজারা দিতে অনিচ্ছুক হতো তার জমিদারী 'ফৌৎ' বা বাজেয়াপ্ত হয়ে যেতো, বিচার করার কেউ ছিল না। আইনের চোখে দেশীয় জমিদার নীলকুঠির সাহেবের সমকক্ষ ছিলেন না। দেশীয় জমিদারেরই কারাবাসের আদেশ হয়েছে। নীলকর সাহেবদের নীল কুঠিগুলি ছিল এক একটি 'ফ্যাক্টরী'। এই ফ্যাক্টরীতেই ধরে আনা হতো 'অপরাধী' চাষীদেরকে। যেমন আনা হতো তন্তুবায়ীদের। একেবারে অনুরূপ পরিস্থিতি। যে নিষ্ঠুর পদ্ধতিতে তন্তুবায়ীদের

ওপর নির্যাতন চালানোই হতো এক শত বৎসর পূর্ব্বে সেই একই পদ্ধতিতে নীল চাষীদের ওপর দৈহিক নির্যাতন চলতো। প্রতিবাদ করার কেউ সেখানে উপস্থিত থাকতো না। সাহসেই কুলাতো না। বহুল প্রচারিত একটি উক্তি তখন খুব চালু ছিল যেটা হলো— "এরূপ এক বাক্স নীলও ইংলণ্ডে পৌঁছতো না যাহা মানুষের রক্তে রঞ্জিত হয় নি।"

শান্তিপুরের তন্তুবায়ী এবং নীলচাষীরা সমবেত ভাবে বিশ্বনাথ বাগ্দীকে নেতা হিসাবে বেছে নেয়। বিশ্বনাথ ছিল অত্যন্ত সাহসী এবং সুদর্শন যুবক তার দলে সহস্রাধিক যুবক যোগ দিয়েছিল তারা সকলেই ছিল সশস্ত্র। বিশ্বনাথ বাগ্দী (বর্গক্ষত্রিয়) তার সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ ক্রমে স্থির করে শান্তিপুরে নীলচাষী আর তাঁতীদের ওপর ইংরাজ কুঠিয়ালের নৃশংস অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়া হবে। সদলে বিশ্বনাথ ইংরাজকুঠিগুলি আক্রমণ করে। ভয়ে কুঠি বা 'আড়ং' এর মালিক পলায়নের বীরত্ব প্রদর্শন করে। বিশ্বনাথ আর তার সুসজ্জিত বাহিনী 'আড়ং' এর দালাল দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মচারীদের বিশেষতঃ যারা প্রাইভেট ট্রেডের সঙ্গে যুক্ত ছিল তাদেব ধরে এনে কঠোর শাস্তি দেয়।

বিশ্বনাথ নীলকর সাহেবদেব কাছে ছিল 'আতঙ্ক'। বিশ্বনাথের আগমনের আগাম সংবাদ পেয়ে শান্তিপুরের নীলকুঠির কুঠিয়াল স্যামুয়েল ফেডি কুঠি ত্যাগ করে পলায়ন করতে যেযে বিশ্বনাথেব হাতে পড়ে যায়। শেষে প্রাণ ভিক্ষা করে এবং তাঁতী নীলচাষীদের ওপর আব অত্যাচাব করা হবে না এমন প্রতিশ্রুতি দিলে ফেডি মুক্তি লাভ করে।

এই নীলকর ফেডি এবং নদীয়ার জেলাশাসক ইলিয়টের সৈন্যবাহিনী গুপ্তচরের কাছ হতে বিশ্বনাথের গোপন আস্তানার সংবাদ পেয়ে বিশ্বনাথ ও তার দলকে ঘিরে ফেলে এবং গ্রেপ্তার করে। বন্দী বিশ্বনাথ কুঠিয়াল ফেডির সম্মুখে বীরের ন্যায় উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান হয়ে জলদগম্ভীর কণ্ঠে উক্তি করে "ফেডি, তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া এক জঘন্য অপরাধ করিয়াছ। যাহা করিয়াছি তাহা অগণিত অত্যাচারিত মানুষের পরম কল্যানের জন্যই কবিয়াছি। তাহার প্রতিদানে যদি কোন শাস্তি আমার প্রাপ্য হয় তবে আমি তাহা সহাস্যে গ্রহণ করিব।"

বিদ্রোহী বিশ্বনাথ বাগ্দীকে 'বিশে ডাকাত' এই নামেই ইংরাজ কুঠিয়ালরা ডাকতো। সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশবাদী ইংরাজরাই তাকে 'ডাকাত', 'খুনি' ইত্যাদি নামে অভিহিত করতো। বিচারের একটা সামান্যতম প্রহসন করে বিশ্বনাথকে গ্রামে প্রকাশ্যে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। একটা মোটা অশ্বত্থ বৃক্ষ শাখায় একটা খাঁচা ঝুলতো দীর্ঘদিন। আর ঐ খাঁচার মধ্যে থাকতো 'বিশে ডাকাত' এর দেহটা। পচে কঙ্কাল বের হয়ে পড়লে বিশ্বনাথের পাগলিনী শোকাকুলা জননী ইংরাজ কুঠিয়ালের কাছে কৈফিয়ৎ চায় একক

বিদ্রোহ, নির্দিষ্ট লক্ষ্যহীন বিদ্রোহ হলেও মানুষের প্রতি, মাটির প্রতি মমতায় নদীয়ার প্রত্যন্ত গ্রামের নির্জন পল্লীতে, কুঁড়ে ঘরে চারণ কবির গানে বিশ্বনাথের নাম দীর্ঘদিন শোনা যেতো।

বাংলা দেশে ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে তাঁতশিল্পীরা বাঁচার তাগিদে যে লাগাতার আন্দোলন চালিয়েছিল তার সূত্রপাত হয় অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই। নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে নীলচাষী আর বিদ্রোহী তাঁতীদের সংগ্রাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। ইংলণ্ডে ঊনবিংশ শতাব্দীতে যন্ত্রশিল্পে বস্ত্র উৎপাদনের যে হিড়িক লেগে যায়, সেই বস্ত্রসম্ভারের জন্য অতি প্রয়োজনীয় রঞ্জকই ছিল নীল।জাহাজ যোগে নীল যেতে থাকে ইংলণ্ডে। অপর কোন দেশে এই পণ্যের প্রবেশাধিকারই ছিল না। নীল বা ইণ্ডিগোর জন্য ইংলণ্ডে বস্ত্র উৎপাদকরা পাগল হয়ে পড়েছিল। প্রকাশ যে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ১৭টি কুঠিতে ১৪১৬ মন নীল উৎপন্ন হয়েছিল।

ইংলণ্ডের ক্রম প্রসারমান বস্ত্রশিল্পের জন্য প্রয়োজন ছিল বিদেশে প্রচুর বাজার। ঊনবিংশ শতক ইংলণ্ডের মূলধনী পুঁজিপতিশ্রেণী পৃথিবীময় অবাধ বাণিজ্য নীতি ঘোষণার জন্য ইংলণ্ডের সরকারকে চাপ দিতে থাকে। কিন্তু ইউরোপের অন্যান্য স্বাধীন উপনিবেশবাদী দেশগুলো আবার ইংলণ্ডের বিশ্বায়নের নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। নিজ নিজ দেশের সরকারের কাছে ব্রিটিশ পণ্যের ওপর উচ্চহারে শুল্ক বসানোর দাবী করলো। কিন্তু ভারতবর্ষের মতো পরাধীন উপনিবেশে সে সব কিছুই ঘটলো না। ভারত অবনতমস্তকে ইংলণ্ডের রাজাকে নিজেদের রাজা বলতে বাধ্য হয়েছে। ইংলণ্ডের উন্নত যন্ত্রে উৎপন্ন বস্ত্রের জোয়ারে বাংলা, বিহার এবং মাদ্রাজের বাজার ভেসে যায়। বাংলার তাঁত ও চরকা বন্ধ হয়ে গেল। এই রূপ পরিস্থিতি সম্যক উপলব্ধি করে কাল মার্কস যে মন্তব্য করেছিলেন তা উদ্ধৃত করা হলো।

"১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ ছিল রপ্তানীকারক দেশ আর এখন ভারতবর্ষ আমদানীকারক দেশে পরিণত হয়েছে।......... যে ভারতবর্ষ স্মরণাতীত কাল থেকে 'সমগ্র বিশ্বের বস্ত্রের কারখানা' রূপে খ্যাতির শীর্ষে ছিল, সেই ভারতবর্ষ এখন ইংলণ্ডে উৎপন্ন সুতা ও তুলাজাত দ্রব্যের দ্বারা প্লাবিত হলো। এর অনিবার্য পরিণতি হলো বিখ্যাত ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের ধ্বংস"।

বাংলার তাঁতীদের সর্বনাশ ঘটলো সাম্রাজ্য লুণ্ঠন, অবাধ বাণিজ্য নীতি বা ফ্রি ট্রেড এর ধাক্কায়" ব্যবসায়ের নামে ইংরেজ বনিকগনের ব্যাপক লুণ্ঠনের ফলে তাঁতী প্রভৃতি

কারিগরগণ কর্মহারা হয়ে অধিক সংখ্যায় ডাকাতদলকে পুষ্ট করেছিল এবং অপরদিকে অত্যধিক খাজনা ও নানাবিধ করের চাপ, জমি-জমা, গৃহ প্রভৃতি হারিয়ে রায়তরা, কৃষকরা বনেজঙ্গলে পলায়ন করে প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় হিসাবে ডাকাতি করাই শ্রেয় মনে করেছিল। (সু. রায় লিখিত ভারতে কৃষক বিদ্রোহ, ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম)।

বিশ্বনাথ এবং অন্যান্য অনেক কৃষকবীরকে ইংরাজশাসকরা 'ডাকাত' রূপে যেভাবে অভিহিত করতো বিখ্যাত ইংরাজ ঐতিহাসিক জেমস মিল ঠিক তার বিপরীত মত পোষণ করে গেছেন, সিলেক্ট কমিটির নিকট সাক্ষ্যে তিনি সুস্পষ্টভাবে নিম্নোক্ত অভিমত প্রকাশ করেছিলেন—

"এই অনিষ্ট প্রধানত জমিদারী প্রথারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ডাকাতি বা দলবদ্ধ লুণ্ঠন। আমি বিশ্বাস করতে বাধ্য যে, যখন থেকে রায়তগণ জমিদারী ব্যবস্থার চাপে পিষ্ট হতে বাধ্য হচ্ছিল, যখন থেকে তাদের অধিকারগুলি সব হরণ করে যেভাবে তাদেরকে ক্রোধে উন্মত্ত করে তোলা হতো তার ফলেই ডাকাতি এমন ভয়ঙ্করভাবে বৃদ্ধি পয়েছিল।" এককথায় মিলের উত্তর ছিল "নূতন জমিদারী ব্যবস্থাই বাংলাদেশে ডাকাতির মূলকারণ। বাংলাদেশের সর্বত্রই ডাকাতেরা কৃষিজীবি অর্থাৎ কৃষক।"

ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে সঙ্ঘাত এবং বুর্জোয়াদের সংগঠনের ভূমিকা ঃ

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে বোম্বাই, নাগপুর বস্ত্রমিল গুলির মিলমালিকদের মধ্যে সঙ্ঘাত অনিবার্য পরিণতি লাভ করে। ল্যাঙ্কাশায়ার মিলমালিকগণ ভারতের মিলমালিকদের বিরুদ্ধে প্রভাব ঘটিয়ে First Factory Act চালু করায় আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত ইংলণ্ডের তুলা ব্যবসায়ীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষকদের ওপর নির্ভর করতো। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হলে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে ভারতীয় তুলা উৎপাদক কৃষকদের ওপর। আবার ভারতীয় বস্ত্রব্যবসায়ীদের ইংলণ্ডে প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়ায় মিলগুলি সংকটের সম্মুখীন হয়। এই সময় ১৮৮২ সালে ইংলণ্ডের বস্ত্র উৎপাদক শ্রেণী নিঃশুল্কে ভারতে অবাধ বাণিজ্য ও ব্যবসা করার সুযোগ পাওয়ায় ভারতের নবোদ্ভিন্ন মুলধনী বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্য সঙ্ঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে এই সংঘাত চরমে ওঠে যখন ইংলণ্ডের সরকার এবং বুর্জোয়া শ্রেণী ভারতীয় বস্ত্রমিল গুলোকে একেবারে তুলে দেবার জন্য আইন পাশ করে। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়াকে পার্লামেন্ট আইন (Royal Titles Act of 1876) পাশ করে 'ভারত সম্রাজ্ঞী' উপাধি দেওয়া হয়। আর ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয় ভারতীয় বুর্জোয়া পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস'। ইংলণ্ডের রাণীর শুভেচ্ছা নিয়ে বোম্বাইয়ে এই সংগঠনের প্রথম অধিবেশন বসে।

সেই অধিবেশন থেকে দেশের আপামর শ্রমিক-কৃষক-দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের স্বার্থরক্ষার পরিবর্তে ধনী-জমিদার-পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য একের পর এক প্রস্তাব পাশ হতে থাকে। ভারতের নবজাত বস্ত্রমিলকে রক্ষার জন্যই বোম্বাইয়ে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসেছিল। সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়েই ছিল দেশের মধ্যে দুর্ভিক্ষ। কিন্তু ভারতীয় বুর্জোয়া পুঁজিপতি শ্রেণীর সঙ্গে ইংলণ্ডের পুঁজিপতিশ্রেণীর দ্বন্দে বাংলা তথা ভারতের তাঁতশিল্পী এবং কৃষকদের কোন যোগ ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা দেশের সাধারণ মানুষের গড় বার্ষিক আয় ছিল ১৫ টাকা ৩ আনা মাত্র। ম্যালেরিয়া ও কলেরায় অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারায়। খাদ্যাভাব ও যকৃতের রোগে শিশু মৃত্যু বেড়েই চলে। কেন্দ্রীয় সরকার এইদিকে আদৌ দৃষ্টি দেয় না। উপরন্তু বড়লাট লর্ড লিটন 'Royal Titles Act' এর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন—'ইংলণ্ডেশ্বরী যে ভারতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অভিজাত শ্রেণীর আশা আকাঙ্খার একমাত্র অভিভাবিকা তাহাই এই আইন দ্বারা সূচিত হইতেছে। "(R.P.D. "India Today"-p. 287) ইংলণ্ডের ইংলণ্ডেশ্বরী ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই 'ভারতেশ্বরী' হয়ে গেলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হলো দেশীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর শ্রেণী স্বার্থ রক্ষার্থে 'ভারতের জাতীয় কংগ্রেস', ১৮৮০ খ্রীঃ দেশব্যাপী ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষে সরকারী হিসাবে মারা যায় ৩৯ লক্ষ ২৮ হাজার ৬শত ৩১ জন এবং শতাব্দীর শেষ বছর ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর হিসাবে ছিল ৮৩ লক্ষ ৩৪ হাজার ১ শত ৫৫ জন। 'ভারতের জাতীয় কংগ্রেস' এই মহামৃত্যু নিয়ে তাদের অধিবেশন বা কমিটির সভায় বা কোন বিবৃতিতে টুঁ শব্দটি করেনি, পাছে ইংরাজরা চটে যায়। নদীর স্রোতে অগণিত মানুষের লাশ ভেসে যায়, মানুষের লাশ নিয়ে প্রকাশ্য দিনের বেলায় খোদ কলকাতা শহরে শৃগাল কুকুরে টানাটানি করেছে। তথাপি জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রথম বৃহৎ রাজনৈতিক দলটি ছিল অদ্ভুতভাবে নীরব। কোন প্রতিক্রিয়া দেখায়নি, এই মৃত্যুর মিছিলে কৃষকদের পরই গ্রাম বাংলার প্রধান কারিগর তন্তুবায়ীরাই ছিল সংখ্যায় বেশি। একমাত্র কমিউনিষ্টদের ভূমিকা ছিল ইতিবাচক।

কিন্তু এই সময়েই বাংলা প্রদেশের লেঃ গভর্ণর চার্লস ইলিয়ট এবং ফয়জাবাদের কমিশনার হ্যারিংটনের বর্ণনায় ভারতবর্ষের জনগণের শোচনীয় দুর্গতির কথা প্রকাশ্যেই স্বীকার করেছিলেন চার্লস ইলিয়ট তাঁর রিপোর্টে ঃ—

"আমি মুহূর্তে মাত্র ইতঃস্তত না করিয়া বলিতে পারি যে, বৃটিশ ভারতের কৃষিজীবি প্রজার অর্ধাংশ সারাবৎসরে মধ্যে একদিনও পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, ক্ষুধার সম্পূর্ণ নিবৃত্তিতে যে কিরূপ সুখ, তাহা ইহারা কখনও জানিতে পারে না।" ('কৃষিজীবি' মধ্যেই তন্তুবায়ী ও অন্যান্য কারিগরদের ধরা হয়)

আবার হ্যারিংটন তাঁর রিপোর্টে বলেন (এপ্রিল, ১৮৮৮ খ্রীঃ)—"কৃষক দিগের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমার নিজের এরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, ভাবতের অধিকাংশ লোকই বৎসরের অধিকাংশ সময় প্রত্যহ পর্যাপ্ত আহারের অভাবে কষ্ট পাইতেছে।"

গ্রেট ব্রিটেনের নাগরিক প্রখ্যাত আন্তর্জাতিকতাবাদী কমিউনিষ্ট নেতা রজনী পাম দত্ত তাঁর 'India Today' গ্রন্থে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জন্মলাভ সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন "—প্রকৃত পক্ষে বড় লাটের সাহায্যে সংগোপনে রচিত পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে এবং ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ উদ্যোগ ও পরিচালনায় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হইয়াছিল। ক্রমবর্ধমান বিক্ষুব্ধ গণশক্তি এবং বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ক্রোধ হইতে ইংরাজশাসনকে রক্ষা করিবার জন্য অস্ত্ররূপে ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আয়োজন করা হইয়াছিল।...."বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে উদ্দেশ্য ছিল আসন্ন বিপ্লব (প্রকৃত পক্ষে কৃষক বিদ্রোহলেখক) কে পরাজিত করা অথবা আরম্ভের পূর্ব্বেই উহাকে ব্যর্থ করা।" সাধারণতঃ সিভিলিয়ান এবং রাণীর প্রতিনিধি স্যর অ্যালাম অক্টোভিয়ান হিউমকেই 'জাতীয় কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠার মর্য্যাদা দেওয়া হয়।

১৭

উনবিংশ শতকে নীলচাষীদের সংগ্রাম প্রগতিশীলদের ভূমিকা এবং প্রতিক্রিয়া ঃ— বাংলা প্রদেশের তাঁতশ্রমিক এবং নীলচাষী, রায়তরা সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে, বিদেশী শক্তির কাছে যেভাবে নির্যাতিত, লাঞ্ছিত এবং অপমানিত হয়েছে, মৃত্যুপথের যাত্রী হয়েছে, ফাঁসিকাষ্ঠে জীবন বিসর্জন দিয়েছে, ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে শত শত বা হাজারে, হাজারে নয় কয়েক লক্ষ শ্রমজীবি মানুষ মৃত্যুর মিছিলে সামিল হয়েছিল, প্রাণরক্ষার দায়ে বনেজঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল এরূপ পরিস্থিতিতে বাংলার নবজাগরণ বা রেঁনেসাসের জনকগণ প্রগতিশীল কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার, সমাজ সংস্কারক বুদ্ধিজীবি, কবি, কবিয়ালরা কিরূপ অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন তারও আলোচনা হওয়া এই প্রসঙ্গে প্রয়োজন।

এক কথায় বলা যায় 'হিন্দুপ্যাট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নাট্যকার দীনবন্ধুমিত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ রেভারেণ্ড জেমস লঙ, গিরীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শিশির কুমার ঘোষ প্রমুখ অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়, যাঁরা অত্যাচারী নীলকরদের বিরুদ্ধে কিছু করেছিলেন। এদের মধ্যে

সর্বাগ্রেগণ্য ছিলেন সাংবাদিক সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু এর মধ্যেই তিনি গণবিদ্রোহের সমর্থকদের স্বীকৃতি পেয়ে গেছলেন।

নীল বিদ্রোহের প্রতি হরিশ্চন্দ্রের দৃঢ় সমর্থন এবং 'হিন্দুপেট্রিয়ট' পত্রিকার পৃষ্ঠায় দিনের পর দিন নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিবরণ, কৃষকদের ওপর অত্যাচার, লুণ্ঠন প্রভৃতি প্রকাশ করার ফলে তিনি কঠিন রাজরোষের শিকার হন। ইংরাজ নীলকররা তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে মানহানির মামলা করে কিন্তু তিনি আপোষে মিটমাটের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর অকাল মৃত্যুর পরও ইংরাজরা মানহানি মামলা প্রত্যাহার করেনি। ফলে পুলিশ আদালতের নির্দেশ মতো তাঁর অসহায়া পত্নীর বাসগৃহখানি বাজেয়াপ্ত করার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং তখন এ মহিলা নীলকরকে তৎকালীন সময়ে এক হাজার টাকা ঋণ সংগ্রহ করে ক্ষতিপূরণ দিয়ে তবে অব্যাহতি পান। কিন্তু ঐ মহীয়সী মহিলার পাশে সেই দুর্যোগের দিনে কোন প্রগতিশীল সমাজ সংস্কারক বুদ্ধিজীবি দাঁড়ান নি বরং অত্যাচারী নীলকর হিলসের পাশে অনেকে সমবেত হয়েছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী যথার্থই বলেছেন—"হিলসের পশ্চাতে নীলকরগণ সমবেত হয়েছিলেন, হরিশের বিধবার পশ্চাতে কেহই ছিলেন না।"

তৎকালে প্রগতিশীল লেখক কালী প্রসন্ন সিংহ হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যয়ের অকাল প্রয়াণে শোক প্রকাশ করে মন্তব্য করেছিলেন—"ভারতভূমি তাঁহার অকাল প্রয়াণে যত অপার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, ত্রিংশৎ সালের ভয়ানক জলপ্লাবনে, বিগত বিদ্রোহে ও বর্তমান দুর্ভিক্ষে তত ক্ষতি স্বীকার করে নাই। তিনি ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়া ইহার যত উন্নতি সাধন করিয়াছেন, সতীদাহ নিবারনে রাজা রামমোহন রায়, বিধবাবিবাহ প্রচলনে বিদ্যাসাগর তত উপকার সাধন কবিতে পারেন নাই।"

(সূত্রঃ—ভারতের মুক্তি সন্ধানে, যোগেশ চন্দ্র বাগল। পৃঃ ৮১-৮১)

নীলচাষীরা ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিদ্রোহ দেখানো শুরু করে যদিও ধূমায়িত হতে থাকে একবৎসর পূর্ব থেকেই। ষাটলক্ষ নীলচাষী এই বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করে। এই বিদ্রোহের একবৎসর পূর্বে প্রকাশিত হয় সরকারের 'ইণ্ডিগো কমিশন' এর রিপোর্ট। ঐ রিপোর্টে কার্যতঃ নীলচাষীদের অভিযোগ স্বীকার করে নেওয়া হয়। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত পত্রিকা 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' ছাড়াও ঐসময় 'সংবাদ প্রভাকর,' 'সোমপ্রকাশ' এইরূপ আরও কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হতো। কিন্তু পত্রিকাগুলি গা বাঁচানোর নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করতো, অন্ততঃ নীলচাষীদের 'বিদ্রোহ' চলাকালীন ঘটনাবলী প্রকাশের ক্ষেত্রে।

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর ছিলেন শহুরে বুদ্ধিজীবি মধ্য শ্রেণীর মানুষ। তিনি হবিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার পৃষ্ঠায় যশোহরের একটি নীলকুঠি ম্যানেজার আর্চিবল্ড হিলস কর্তৃক নারীহরনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত সংবাদকে তাঁর বিখ্যাত নীলদর্শন' নাটকে ক্ষেত্রমনির চরিত্রে রূপদান করেন। এই নাটক প্রকাশের পর মঞ্চে অভিনীত হতে থাকলে বাংলার নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনতা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। বিদ্রোহী নীলচাষীরা দলে দলে কলকাতায় হরিশ্চন্দ্রের কাছে উপস্থিত হয়ে পরামর্শ গ্রহণ করে। তিনি পত্রিকা সম্পাদকরূপে যা বেতন পেতেন তার সবটাই বিদ্রোহীদের হাতে তুলে দিতেন অথবা বিদ্রোহ পরিচালনায় ব্যয় করতেন আবার 'নীলদর্পণ' নাটক যেভাবে রে জেমস লঙ নিজে মুদ্রণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন সেইরূপ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে এক হাজার টাকা জরিমানা ও এক মাসে কারাদণ্ডের আদেশ শোনানো হয়। জরিমানার টাকাটা তৎক্ষণাৎ রে লঙ বন্ধু কালিপ্রসন্ন সিংহ কোর্টে জমা দিয়েছিলেন। রেভারেণ্ড লঙ নিজে নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী কবিতায় রূপ দিতে ছাপাতেন এবং সেই সব কবিতা নীলচাষীরা আবৃত্তি করতো। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর লেখনীর তৎপরতায় এবং ইংরাজী সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের জোরে 'নীলদর্পণ' নাটকটির ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ কবেন ছদ্মনামে। এর ফলে তাঁকে সুপ্রীম কোর্টের চাকুরীটি খোয়াতে হয়। বাংলায় তৎকালীন সেক্রেটারী সিটন কার (Sigton Carr) গোপনে সরকারী ছাপাখানায় 'নীলদর্পণ' এর ইংরাজী অনুবাদটা মুদ্রনেব যাবতীয় ব্যবস্থা করে দেন। আর এই তথ্য প্রকাশিত হলে তাঁকেও সরাসরি বরখাস্ত হতে হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'দীন জীবন' প্রবন্ধে এ সম্পর্কে লিখেছিলেন—''তখন পর্যন্ত এই সৌভাগ্য বাংলার আর কোন গ্রন্থের ঘটে নাই। গ্রন্থের সৌভাগ্য যতই হক, কিন্তু যে যে ব্যক্তি ইহাতে লিপ্ত ছিলেন, তাঁহারা আপন আপন সকলেই কিছু কিছু বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ইহা প্রকাশ করিয়া লঙ সাহেব কারাকুদ্ধ হইয়াছিলেন, সিটন কার অপদস্থ হইয়াছিলেন। ইহার ইংরজী অনুবাদ করিয়া মাইকেল গোপনে তিরস্কৃত ও অপমানিত হইয়াছিলেন। গ্রন্থকর্তা নিজে কারারুদ্ধ বা কর্মচ্যুত হন নাই বটে কিন্তু ততোধিক বিপদগ্রস্থ হইয়াছিলেন।''

বঙ্কিমচন্দ্র এই সময়ে একজন মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে নিজে একজন নীলকরকে গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করে ছেড়েছিলেন। নীলচাষী হিতৈষী, নীলবিদ্রোহের প্রত্যক্ষ সহায়তাদানকারী হরিশ্চন্দ্র 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার বিদগ্ধ মুখোপাধ্যায়ের মাত্র ৩৯ বছর বয়সে অকাল

মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রীর বাসগৃহের হুকুম দখল নিতে ইংরাজ সরকার অগ্রসর হলে বঙ্কিমচন্দ্র হরিশ্চন্দ্রের বিপন্ন বিধবাকে কোন সহায়তাদান যে করেন নি তাও নিশ্চিত।

নীলচাষীদের বিদ্রোহকাল ছিল ১৮৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দে দুই বৎসর। নীলচাষী বা রায়তদের সংগ্রামের বিরোধিতা ছিল সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় এবং প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরদেরও। নীলচাষের সঙ্গে ইংলণ্ডের ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থ জড়িত ছিল। বাংলার মতো তাঁতশিল্পের ধ্বংস সাধনের প্রক্রিয়া ইংরাজদের পরিকল্পনা মতো সম্পূর্ণ। গ্রামে গ্রামে হস্তচালিত তাঁত ততোদিনে প্রায় অদৃশ্য। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাউড়িয়া কটন মিলস্। ক্রমে সারা দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পরপব আরও কটনমিল। বোম্বাইতে আঠারটি এবং ভাগিরথীর দুই পাড়ে মিলগুলি চালু হতে শুরু করেছে। গ্রামের তাঁতহীন ভূমিহীন কৃষকের সন্তানরা ছোটে শহরেব কটনমিলে চাকরীর সন্ধানে। ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়েছে জামদানী ও ঢাকাই মসলিন, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, শান্তিপুর, বাঁকুড়ার সিল্ক বস্ত্রের উৎপাদন, মসলিন গুরুত্ব হারিয়ে ফেললো। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে একের পর এক কৃষক বিদ্রোহে সামিল হয়েছিল পুরাতন তাঁতশিল্পী ও তাঁতহীন তাঁতশ্রমিকরা। তন্তুবায়ীরা পৃথকভাবে আন্দোলন করার কোন ক্ষমতাই আর পোষণ করে না। তাই তাঁতীরা যোগ দিয়েছিল সন্ন্যাসী বিদ্রোহ থেকে নীলবিদ্রোহে, সিরাজগঞ্জের ও পাবনার কৃষক বিদ্রোহে, চব্বিশ পরগণায় তিতুমীরের পরিচালিত 'ওয়াহাবি বিদ্রোহ' ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এবং পরবর্ত্তী দশকগুলিতে, ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনা কালেই স্বতন্ত্রভাবে লড়াই করার মানসিকতা তন্তুবায়ীরা হারিয়ে ফেলে।

দুর্ভিক্ষ ও অনাহার প্রতিরোধের সংগ্রামের সময় একজন নাগরিকের যে সকল স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার থাকা একান্ত আবশ্যক তা ছিলনা। যতদিন বাংলা এবং ভারতের শাসন ক্ষমতায় ছিল ইংরাজ সেই ১৭৬৫ খ্রীঃ বাংলায় দেওয়ানি লাভের বছর থেকে ১৯৪৭ খ্রীঃ (অথবা ১৭৫৭ খ্রীঃ-১৯৪৭ খ্রীঃ পর্যন্ত মোট ১৯০ বছর) পর্যন্ত এদেশীয় মানুষের এ দেশের মাটীর এদেশের জলের, এদেশের শস্যের প্রতি কোন অধিকার ছিল না। ১৮৫৪ খ্রীঃ থেকে ১৯০১ খ্রীঃ পর্যন্ত এই সাতচল্লিশ বছরে বৃটিশ সরকার ঘোষিত ভারতবর্ষে নিরক্ষর আর জমি হারা কর্মচ্যুত বুভুক্ষু মানুষের দল দুর্ভিক্ষ জনিত মৃত্যু সংখ্যা ছিল প্রায় তিন কোটি (২ কোটি ৮৮ লক্ষ ২৫ হাজার)। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতবর্ষে বাণিজ্যে উন্নতির নামে রেলপথ স্থাপিত হতে আরম্ভ হলে বিংশশতাব্দীর সূচনাকাল পর্যন্ত দুর্ভিক্ষ জনিত মানুষের মৃত্যুর হার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। সমাজ বিধ্বংসী এই দুর্ভিক্ষ ভারতবর্ষের কেন পৃথিবীর যে কোন দেশের কাছেই যে কোন দেশের ইতিহাসে চরম অভিশাপ। যারা এই মহামারী আর দুর্ভিক্ষে মারা

গিয়েছিল তারা কেউই ধনী মধ্য শ্রেণীর লোকজন ছিল না। তারা ক্ষুদ্র ও গরীব চাষী কৃষক এবং রায়ত। এদের মধ্যেই তাঁতী, কামার, কুমোর, জেলে, নাপিত, ধোবা প্রভৃতি গ্রামীণ কারিগররা যারা সংখ্যায় বেশি ছিল। বাংলার প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্তের মতে ইংরাজ বণিকদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে বাংলা দেশে কমপক্ষে এক লক্ষ তাঁতি তাদের পিতৃপুরুষের জীবিকা বয়নশিল্প থেকে কর্মচ্যুত হয়ে জীবিকা নির্বাহের আশায় একাংশ কৃষিকার্য্যে যোগ দেয়, কিন্তু পরবর্তীকালে সেখানেও নীলচাষ করতে আগাম দাদন নেওয়ার জন্য তাঁতিদের ক্ষেত্রে অনুসৃত জুলুম পদ্ধতি বাধ্যতামূলক হওয়ায় বাঁচার আশা ক্ষীণ হয়ে আসে। অপর অংশ মজুরী দাসত্ব করার জন্য বেরিয়ে পড়ে। কার্যতঃ তারা রূপান্তরিত হয় 'বণ্ডেড লেবার' শ্রেণীতে। আরেক অংশ ভবঘুরে জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে 'লুম্পোন প্রলেতারিয়েত' শ্রেণীরূপে আত্ম প্রকাশ করে। নূতন একদল তাঁতি থেকে কৃষকে রূপান্তরিত হওয়ার ফলে জমির ওপর ক্রমাগত চাপ ও ভীড় বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ভারতীয় বস্ত্রশিল্প ধ্বংসের পর এদেশের মাটিতে এমন কোন শিল্প ইংরাজরা প্রতিষ্ঠা করেনি বা প্রতিষ্ঠা করতে দেয় নি যার দ্বারা বস্ত্রশিল্প ধ্বংসজনিত শূন্যতা পূরণ হতে পারে। অর্থাৎ ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব ঘটলেও ভারতে কৃষিপ্রধান দেশরূপেই গণ্য হতে থাকে। শিল্পহীন ভারতবর্ষের কৃষিপ্রধান অর্থনীতিও দুর্ভিক্ষের চাপে এক শতাব্দীর মধ্যেই ধ্বংস হয়ে চুরমার হয়ে গেল। এর পর প্রায়-অবলুপ্ত ফ্যাক্টরী শ্রমিক, ভূমিহীন কৃষক এসব মিলিয়ে এক বিশাল সংখ্যা কর্মহীন বিত্তহীন অগণিত অসংগঠিত দিনমজুর অবশেষে ভারতবর্ষের বুকে নতুন অসংগঠিত ক্ষেত্রের প্রলেতারিয়েত শ্রেণীরূপে উদ্ভুত হ'লো বিশেষতঃ ধ্বংস প্রাপ্ত বস্ত্রশিল্প থেকে কর্মচ্যুত শ্রমিকেরা বাংলার মাটীতে সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদকে আঘাত করার ক্ষমতাধর এক আধুনিক অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক শ্রেণী বা প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর জন্ম দিল। কয়েকটি বস্ত্রমিল বাংলায় এই সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দিনমজুর শ্রেণীর এক বিশাল অংশ নতুন সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরূপে মিলগুলিতে প্রবেশ করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় থেকে সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীব্যাপী গ্রামবাংলার তন্তুজীবি কারিগর থেকে বিভিন্ন প্রকার ক্ষুদ্র রায়ত ও কৃষকরা যখন ইংরাজ কোম্পানী ও ব্রিটিশ রাজ সরকার এবং তাদের ভারতীয় মুৎসুদ্ধী (দালাল) বুর্জোয়া শ্রেণী, যত রাজা জমিদার তাদের ও গোমস্তা, পাইকার, মহাজন, তালুকদার, জমাদার, পত্তনীদার, আয়মাদার,

দারোগা, পিয়ন, প্রভৃতিদের অত্যাচারে বনেজঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছিল, যারা ভিটা মাটি ত্যাগ করতে অনিচ্ছুক ছিল তাদেরকে ব্রিটিশ আর তাদের দালালরা বুটের তলায় পিষে মারতো, যখন পলাশীযুদ্ধের ঘটনাবলীর পরে দীর্ঘ দেড়শতবৎসর এমন সময় যায় নি যে বাংলার বুকে কোন না কোন প্রকার বিদ্রোহ সঙ্ঘটিত হয়নি। যখন লাখে লাখে মানুষ দুর্ভিক্ষ, আর অনাহারে কুকুর, শৃগাল, বিড়াল, ইঁদুরের ন্যায় পথে নদীর জলে লাশ হয়ে পড়ে থাকতো, এমনিই ভেসে যেতো, তখনও বাংলার ধনী ও মধ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সমাজসংস্কারকগণ যে নীরব ছিলেন বরং যে কোন বিক্ষোভ বা বিদ্রোহকে নিন্দা করার আলটপকা ভাষা প্রয়োগ করতেন তার পিছনে যে সব কারণ তার অন্যতম ছিল তাহলে শ্রেণীস্বার্থ এবং সেই সমাজ সংস্কারক বা বুদ্ধিজীবি সমাজ যে শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করতেন প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ তার ওপর নির্ভরশীল ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীব সূচনায় এঁদের মুখপাত্র ছিলেন 'রাজা' বামমোহন রায় এবং 'প্রিন্স' দ্বারকানাথ ঠাকুর। ব্রিটিশ সরকারের অনুগৃহীত চাকুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, সাহিত্যিক চূড়ামণি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামমোহনের 'সংবাদ কৌমুদী' এবং পরবর্তী যুগের বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' শ্রেণীসংগ্রামের ঘোরতর বিরেধিতায় অবতীর্ণ হয়। এমনকি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ যা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম 'সিপাহীবিদ্রোহ' এর প্রতি রামমোহন এবং তাঁর গোষ্ঠী পরবর্তী অর্ধে বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁর গোষ্ঠী চরম শত্রু মনোভাবাপন্ন ছিল। তৎকালীন সমাজের এই সকল দণ্ডমুণ্ডের কর্তারা তাঁতীদের বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহের সহিত যোগদান বা নিদেন পক্ষে নিজ নিজ পত্রিকার পৃষ্ঠায় প্রকৃত তথ্য প্রকাশ এসব না করে তাঁদের সমগ্র জনবল ও ধনবল ব্রিটিশকে সন্তুষ্ট করার পক্ষে কি যুক্তি থাকতে পারে? বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় রামমোহন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মাত্রাতিরিক্ত ব্রিটিশ খ্যাতির পক্ষে প্রশস্তি বাক্য পাঠ করায়। বঙ্গীয় রেঁনেসাসের মুখপাত্রগণ তখন প্রগতিশীল শিবিরে হলেও দুইভাগে বিভক্ত ছিল। হরিশ্চন্দ্র মুখোপধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, অক্ষয় দত্ত, এঁরা কৃষক ও মজুরদের দুর্দশার প্রতি কেবল সহানুভূতিশীলই ছিলেন না, মসিযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তবে বিরোধীদের কেবল আস্থা ছিল ইংরাজ শাসক সৃষ্ট 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' জমিদারী প্রথার ওপর, তেমনই অপর অংশের ছিল ইংরাজী ভামা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, আদব কায়দার প্রতি অন্ধ আনুগত্য। যে কারণে সিপাহী যুদ্ধের প্রতি উভয় অংশেরই বিরোধিতা ছিল স্পষ্ট। 'নীলবিদ্রোহ' এর প্রতি স্পষ্ট বিরোধিতা ছিল বঙ্কিমের আর রামমোহন ছিলেন খ্যাতনামা জমিদার এবং নীলকর।

যে রেঁনেসাস আন্দোলনের জন্য আমরা গর্ববোধ করতে কুণ্ঠিত হই না যা বাংলার পশ্চাদপদ কুসংস্কারাচ্ছন্ন সামাজিক প্রথাগুলোকে পিটিয়ে চুরমার করে ছেড়েছিল, যা উচ্চশিক্ষার অলোকবর্তিকা তরুণদের মধ্যে উদ্ভাসিত করে ছিল, তথাকথিত 'হিন্দুয়ানী' গোঁড়ামীকে সমাজের অন্তঃস্থল থেকে সমূলে উৎপাটিত করেছিল, অন্ধকার থেকে আলোর পথে গোটা বঙ্গীয় সমাজকে হাঁটতে শিক্ষা দিয়েছিল সেই শিক্ষার আলোকবর্তিকা সুস্থ সাংস্কৃতিক চিন্তার ধারক বাহক 'বঙ্গীয় রেনেসাঁস আন্দোলন'এর গ্রামবাংলায় তন্তজীবি ও অন্যান্য কারিগর, কৃষক-দিনমজুরদের ওপর প্রভাব ছিল নেতিবাচক। ১৯৫১ সনের সরকারী সেনসাস রিপোর্টে ভারতের তৎকালীন সেন্সাস কমিশনার প্রয়াত অশোক মিত্র তাঁর রিপোর্টে নিম্নোক্ত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন ''ভারতের বুদ্ধিজীবিরা যে 'নবযুগের অভ্যুদয়'কে রেনেসাঁস রূপে চিত্রিত করে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন গ্রামের ওপর তার প্রভাব ছিল দুঃখজনক।

''লক্ষ লক্ষ কৃষকদের লুণ্ঠিত সম্পদে ধনবান এই ভূস্বামী শ্রেণী শহরে সাংস্কৃতিক নবজাগরণের অভ্যুদয় ঘটিয়েছিল। এদের মুখপাত্র রাজা রামমোহন রায়। যে শ্রেণীর লোকেরা এই ঘটনায় লাভ হয়েছিল তাঁরাই আদর করে নাম দিয়েছিলেন 'রেঁনেসাস'।

এই জাগরণ দেখা দিয়েছিল প্রধানতঃ শহরে এবং বেণ্টিঙ্ক যাঁদের 'প্যারাসাইট' (পরজীবি) ব'লে ব্যঙ্গ ক'রেছিলেন সেই ভূস্বামী শ্রেণীর মধ্যেই এই আন্দোলন ছিল সীমাবদ্ধ। এই রেনেসাঁস আন্দোলনের কোন প্রভাব গ্রামবাংলার ওপব পড়েনি।...বর্তমানকালে এখন হয়তো কেউ কেউ প্রয়াত অশোক মিত্রের মন্তব্যের সঙ্গে ঐক্যমত পোষণ করবেন না কিন্তু তাঁর সুচিন্তিত মতামত উপেক্ষার বস্তুও নয়।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের 'মহাবিদ্রোহ' এর সময় ইংরাজ বেনিয়াদের সর্বোতোভাবে সাহায্য করেছিল বাংলার মধ্যশ্রেণী ও জমিদার শ্রেণীব অন্তর্ভুক্ত অসংখ্য সামন্ত প্রভু ও বুদ্ধিজীবির দল। তাঁরা ইংরাজদের সমর্থন করতেন অনেকটা ব্যক্তিগতস্বার্থে এবং বাকীটা শ্রেণীস্বার্থে। অন্যান্য প্রদেশে ছিল এর ভিন্ন চিত্র। বর্ধমানের মহারাজা তো সমস্ত শক্তি দিয়ে বিদ্রোহ দমনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন রাজভক্ত প্রজার মতো তিনি বিদ্রোহদমনে হাতি, গাড়ী, ঘোড়া, লোক লস্কর, অর্থ দিয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে সাহায্য করেছিলেন।

কবি ঈশ্বর গুপ্ত যিনি গর্বভরে বলতেন 'বিদেশের ঠাকুরের চাইতে দেশেব কুকুরও ভাল' তিনি সিপাহী বিদ্রোহ পরিচালনা করা বা নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য নানা সাহেব, তাঁতিয়া তোপী, ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ এঁদের প্রতি কুৎসিত কটাক্ষ করতে পিছপা হন নি। অবশ্য কালিপ্রসন্ন সিংহ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ঐ বিদ্রোহীদের প্রতি সমর্থন ছিল অকুণ্ঠ।

বাংলার কৃষকরা সিপাহী বিদ্রোহের সঙ্গে অন্যান্য রাজ্যের কৃষকদের ন্যায় জড়িত হয়নি। তারা ব্যস্ত ছিল নীলকর সাহেবদের জোর জুলুমের নিত্য অত্যাচার ঠেকাতে। তবে বাংলার কৃষকরা রসদ বা যানবাহন দিয়ে বিদ্রোহ দমনে সহায়তা করতে অস্বীকার করেছিল। কৃষকরা যাতে বাধ্য হয় 'সিপাহী বিদ্রোহ' দমনে ব্রিটিশদের সর্বতোভাবে সাহায্য করতে তদুদ্দেশ্যে ইংরাজ কোম্পানীকে ঐ সময় আইন পাশ করতে হয়েছিল ১৮৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দে নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে বাংলার কৃষকরা যখন বিদ্রোহে সামিল তখন তাদের নেতাদের তাঁতীয়া তোপী, রাণী লক্ষ্মীবাঈ প্রভৃতি নাম দিয়েছিল। বাংলায় যে সিপাহীরা ছিল তারা অধিকাংশই অযোধ্যারাজ্যের কৃষক এবং তাঁতী পরিবারের সন্তান। উত্তরভারতে এই বিদ্রোহে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়।

বিশ্বাসঘাতকতার জন্য যেমন পলাশীর প্রান্তরে ইংরাজরা বিজয়ী এবং সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় হয়েছিল সিপাহী বিদ্রোহেও তদ্রূপ ঘটনা ঘটেছিল যেমন তাঁতীয়া তোপী, নানা সাহেব, বৃদ্ধ মোগলসম্রাট বাহাদুর শাহ. এবং তাঁর স্ত্রী, পুত্ররা, বাংলার নবাব ফেরাদুন খাঁ প্রভৃতি যারা বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁরা তলে তলে ব্রিটিশের পক্ষে কাজ করতেন। ইংরাজ বিরোধিতা নিয়ে বিভিন্ন শক্তির মধ্যে চরম অনৈক্য দেখা দেয়। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত নানা সাহেব বিচারের শেষে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার লিখিত আর্জির উদ্দেশ্যে কিয়দংশ পাঠ করলেই নানা সাহেব সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হবে।

'ইহা অত্যন্ত অদ্ভুত ও বিস্ময়কর যে, যাহারা প্রকৃত হত্যাকারী তাহাদিগকে তাঁরা মার্জনা করছেন, কিন্তু সে (নানা সাহেব-লেখক) নিতান্ত অসহায় অবস্থার চাপে বিদ্রোহে যোগদানে বাধ্য হলেও তাকে মার্জনা করা হলো না।''

ঝাঁসীর রাণীও বিদ্রোহের প্রথম দিকে ইংরাজ কোম্পানীর সৈন্যদের রসদের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন এবং যুদ্ধে আহত ব্রিটিশ সৈনিকদের চিকিৎসার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন তাতেও যখন দেখলেন তাঁর রাজ্য ব্রিটিশ শক্তি গ্রাস করছে এবং তাদের পছন্দমতো ব্যক্তিকে ঝাঁসীর রাজসিংহাসনে বসাতে চাইছে তখন তিনি বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেন। এটাই প্রকৃত ঘটনা।

(The Political Proceedings No. 63-70, 7.5 1857 এবং No 280. Dec. 30, 1859)

বৃদ্ধ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ্ বন্দী অবস্থায় থাকাকালীন এক জঘন্য বিবৃতি দিয়েছিলেন। বিবৃতিতে তিনি বিদ্রোহ পরিচালনা করার জন্য দিল্লীতে যে 'রাষ্ট্রীয়সভা'

গঠিত হয়েছিল যার নেতৃত্বে ছিলেন স্বয়ং শেষ মোগল সম্রাট, সেই 'রাষ্ট্রীয়সভার' বিরুদ্ধে নিজের বক্তব্য পেশ করেছিলেন। 'রাষ্ট্রীয় সভা' রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনা, রাজস্ব আদায় থেকে যুক্ত পরিচালনা সমস্ত ব্যাপারেই উক্ত সভায় বসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো। সেই সব সিদ্ধান্তে মোগল সম্রাট এবং তাঁর পরিবারের সদস্যগণ গোপনে যোগাযোগ রাখছে। তাই 'সভা' তাঁকে নজরবন্দী করেছিল। বাহাদুর শাহের বিবৃতিটির সামান্য অংশ নিম্নরূপ ঃ—

"বিদ্রোহী সিপাহীগণ একটি রাষ্ট্রীয় সভা গঠন করেছিল। সেই সভায় সমস্ত বিষয় আলোচিত এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো। আমি কখনও সেই সমস্ত সভায় যোগদান করি নি। আমাকেও বন্দী করে রাখা হয়েছে। তারা যে সমস্ত দলিল দস্তাবেজ আনতো তাতেই আমাকে জোর করে স্বাক্ষর ('দস্তক') করাতো। বাধ্য হয়ে আমি স্বাক্ষর করতাম। আমার জীবনই বিপন্ন হতো যদি স্বাক্ষর না করতাম। আমার কর্মচারীগণ এবং বেগম জিনৎ আমাকে ইংরাজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রীকারীরূপে গালি দিত, চরম সন্দেহ পোষণ করতো। আমার কর্মচারীদের হত্যা এবং আমার বেগমকে কর্মচারীদের প্রতিভূরূপে আটক রাখা হয়েছিল।"

এতদ্‌সত্ত্বেও সিপাহী বিদ্রোহই ছিল ভারতের প্রথম সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রাম। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সভায় লর্ড আর্ল গ্রাণভিল অত্যন্ত উদ্দীপনার সঙ্গে ভাষণ দান কালে ঘোষণা করেন শিক্ষিত ভারতীয়গণ সিপাহী বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেন নাই, এবং তারা এই বিদ্রোহের বিরোধিতাই করেছিল। সংকটের সময় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তারা ব্রিটিশের প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা বজায় রেখেছিল।

পরম শ্রদ্ধাভাজন বিদ্যাসাগর মহাশয়ও 'সিপাহী বিদ্রোহ' বা 'নীল বিদ্রোহ' কোনওটাকেই সমর্থন করেন নি, বিরোধিতাই করেছিলেন। তিনি ঐ সময় ব্যস্ত ছিলেন বাংলা প্রদেশে গ্রামে গ্রামে শিক্ষাবিস্তার, নিরক্ষরতা দূরীকরণের মতো মহতী কার্যে আত্মনিয়োগে। বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামে কিভাবে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যায় সেই ভাবনাতেই তিনি সর্বদা চিন্তিত ছিলেন। সেই সঙ্গে ছিল তাঁর 'বিধবা বিদ্রোহ' প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদসংক্রান্ত প্রস্তাব' সহ নানান প্রবন্ধ রচনা এবং 'বিধবা বিবাহ দান' কার্যে নিজেকে সমর্পন। তাঁর একনিষ্ঠতা এবং দেশ প্রেম এখনও প্রশ্নাতীত।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকা ঃ—তবে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরোধিতা ছিল তুলনামূলকভাবে স্পষ্ট। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে 'সাঁওতাল বিদ্রোহ', ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে 'সিপাহী বিদ্রোহী' এবং ১৮৫৯-

৬০ খ্রীষ্টাব্দে 'নীলবিদ্রোহ' এই তিন বিদ্রোহের তিনি চরম বিরোধিতা করলেও অষ্টাদশ শতকের সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এই সমর্থনের পিছনে ছিল হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব। যদিও বাংলার জগদ্বিখ্যাত মসলিন ও সিল্কবস্ত্র উৎপাদনকারী তন্তুবায়ীদের ওপর যে নির্মম অত্যাচার ব্রিটিশ পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ীরা পলাশী যুদ্ধের পর থেকে দীর্ঘ দেড়শত বৎসর চালিয়েছে তা নিয়ে কোন প্রতিক্রিয়া দেখান নি। কেবল 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের প্রথম অংশে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' ব্যাখ্যা দান কালে বাংলার দুর্দশার চিত্র অন্যান্যদের সঙ্গে বাংলার তাঁতীদের কথাও উল্লেখ করেছেন। আর আছে রাজস্বআদায় কর্তা নায়েব দেওয়ান রেজা খাঁয়ের রাজস্ব আদায়ের অপরিণত উদ্যোগের নিন্দা।

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন কর্ণওয়ালিশ প্রবর্তিত 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রথার একনিষ্ঠ সমর্থক কৃষক আন্দোলনের প্রবল বিরোধী। কৃষক সংগ্রাম ছিল মূলতঃ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং সামন্ততন্ত্র বিরোধী। নীলচাষীরা যখন নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রাম করছে যখন বঙ্কিমসুহৃৎ দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটক বাংলা দেশজুড়ে হুলু স্থুলু কাণ্ড শুরু করে দিয়েছিল, নাটকের অভিনয়ে নীলকর দস্যুদের বীভৎস উৎপীড়ন দর্শনে বিচলিত বিদ্যাসাগর নিজ চটি ছুঁড়েছিলেন অত্যাচারী সাহেবের অভিনয়কারীর উদেশ্যে তখন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার পৃষ্ঠায় 'নীলদর্পন' নাটকের নিম্নোক্ত সমালোচনা বার করলেন—"নীলদর্পণকার প্রভৃতি যাঁহারা সামাজিক কু-প্রথার সংশোধনার্থ নাটক প্রণয়ন করেন আমাদিগের বিবেচনায় তাঁহারা নাটকের অবমাননা করেন। নাটকের উদ্দেশ্য গুরুতর—যে সকল নাটক এই রূপ উদ্দেশ্য সৌন্দর্য সৃষ্টি, সমাজসংস্কার নহে। মুখ্য উদ্দেশ্য পরিত্যক্ত হইয়া সমাজ সংস্কার নাটক প্রণীত হইলে নাটকের নাটকীয়ত্ব থাকে না।" বঙ্কিমচন্দ্র 'আর্টস্ ফর আর্টসসেক' অর্থাৎ 'শিল্পের জন্যই শিল্প' সৃষ্টি হওয়া উচিত এই মত পোষণ করতেন। কাব্যে, সাহিত্যে, নাটকে মানুষের জীবন যন্ত্রণা সুখ দুঃখের কোন কাহিনী থাকার তিনি ঘোরতর বিরোধী। এই মত 'প্রতিক্রিয়াশীল মত' ছাড়া অন্য কিছু নয়। অভিনয় শিল্পের মধ্যে থাকে শ্রেণীশোষনের কথা, শ্রেণী যুদ্ধ নিয়ে রচিত হয় কাহিনী। বঙ্কিমের মতে তাতে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় না বা কাব্যসুষমা থাকে না বা নাটকের নাটকীয়তা থাকে না। এই অভিমত তৎকালীন ভূ-স্বামী শ্রেণীকেই তাদের শোষণ ব্যবস্থা অটুট রাখতেই উৎসাহিত করেছিল। কারণ তারা জানতো বাংলায় তন্তুবায়ীরা দুইশতকব্যাপী বাঁচার জন্য নিজেদের শিল্পকে রক্ষার জন্য যে সংগ্রাম চালিয়েছিল তা নিয়ে উল্লেখযোগ্য গুণবিশেষ কোন বিবরণ বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ পর্যন্ত

প্রকাশিত হয় নি, যে 'নীল বিদ্রোহ' নিয়ে দীনবন্ধু মিত্র তাঁর বিখ্যাত 'নীলবিদ্রোহ' নাটকটি করে বুর্জোয়া জমিদারদের শিবিরে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছিলেন সেই নাটকটিও ইংরেজের বিরুদ্ধে 'রাজদ্রোহ' এই অভিযোগে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা প্রদেশের সর্বত্র তার অভিনয় প্রদর্শন সরকার থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ঊনবিংশশতাব্দীর প্রথমার্ধের কথা। রাজা রামমোহন এবং প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর উভয়েই ইংলণ্ডের পার্লামেন্টে এক স্মারকলিপি পেশ করে ভারতবর্ষে ইংরাজদের উপনিবেশ স্থাপন এবং এদেশে তাদের অবাধ বা মুক্ত বাণিজ্য নীতির প্রতি দৃঢ় সমর্থন জানান। যে 'ফ্রি ট্রেড' এর জন্য বাংলা পরম গৌরব মসলিন বস্ত্রের বাণিজ্য ধূলিসাৎ আর ইংলণ্ডে প্রস্তুত বস্ত্রসম্ভারের অবশ্য প্রয়োজনীয় রঞ্জক 'ইণ্ডিগো'র জন্য অন্য চাষ পরিত্যাগ করে জোর পূর্বক নীলের চাষ করতে বাধ্য করার নীতি গ্রহণ করা হয় সেই নীতির ধারক বাহক নীলকর সাহেবদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে রামমোহন নিম্নোক্ত স্মারকলিপি নিজের উদ্যোগে ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের কাছে পেশ করেছিলেন। দরিদ্র তন্তুবায়ী বা বিপদগ্রস্ত নীল চাষীর দুর্দশা বা তৎকালীন সমাজের সর্বাপেক্ষা জরুরী চিন্তাভাবনার যে প্রয়োজন ছিল তা বাদ দিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল মাতব্বরদের তুলনায় প্রগতিশীল রামমোহনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমাদের বেদনাহত করে। রামমোহন লিখছেন—"নীলকর সাহেবদের সম্বন্ধে আমি আমার মত সবিনয়ে উল্লেখ করিতেছি। বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার বিভিন্ন জেলা আমি পরিদর্শন করেছি। আমি দেখেছি নীল চাষের জমির নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান অন্যান্য অঞ্চলের জীবন াত্রার মানের তুলনায় উন্নততর।.........নীলকরদের এর ফলে হয়ত সামান্য কিছু ক্ষতি সাধিত হইতে পারে। কিন্তু সরকারী এবং বেসরকারী যত ইউরোপীয় এখানে আছেন তাদের যে কোন অংশের তুলনায় নীলকর সাহেবগণ এদেশীয় সাধারণ মানুষের অকল্যাণের তুলনায় কল্যাণই বেশি করেছেন।

❑ দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রদত্ত স্মারক লিপির বয়ান ❑

"আমি দেখেছি, নীলের চাষ এদেশের জনসাধারনের পক্ষে সবিশেষ ফলপ্রসু হয়েছে। জমিদারদের সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষকদের ও বৈষয়িক উন্নতি সাধন সম্ভব হয়েছে। যে অঞ্চলে নীলের চাষ নেই সেই অঞ্চলের তুলনায় নীল চাষের এলাকাভুক্ত মানুষ অধিকতর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করছে।.."

দ্বারকানাথ এরপর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের কথা ঘোষণা করে লেখেন...'আমি কেবল জন শ্রুতির ওপর নির্ভর করে এসব বলছি না, প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই

আমি এসব বলছি। "দ্বারকানাথ নিজেকে একজন সফল নীলকর হিসাবে যে ভূমিকা নিজ মাতৃভূমিতে পালন করেছিলেন তাও উল্লেখ করেন যাতে নিজের উক্তির পিছনে সত্যতা সন্দেহে ইংরাজদের মনে কোন বিন্দুমাত্র সন্দেহ না থাকে। "পূর্বে এই জমি থেকে সরকারী খাজনা দেবার মতো যথেষ্ট আয় হতো না। কিন্তু এখন ঐ জমি থেকেই আমি যথেষ্ট মুনাফা অর্জন করছি।"

বস্তুতঃ দ্বারকানাথ ও রামমোহনের এহেন যৌথ প্রয়াস ইংরাজরা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করলোই শুধু নয় তারা ভারতবর্ষে জমি জিরেত কিনে রীতিমতো বাগান চাষ শুরু করে দিল। রামমোহন এবং দ্বারকানাথ ইংলণ্ডের পার্লামেন্টে নীলকরদের সমর্থনে প্রস্তুত স্মারকলিপির খসড়া সাধারণ অনুমোদনের জন্য কলকাতা টাউন হলে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এক সভা আহ্বান করেছিলেন।

কলকাতা টাউনহলে রামমোহন দ্বারকানাথ আহুত নীলকরদের সভায় উক্ত স্মারকলিপি অনুমোদনের জন্য আহ্বায়কদ্বয় পেশ করেন। খসড়া স্মারকলিপির বয়ান অনুমোদন পেলে বড়লাট লর্ড বেণ্টিঙ্কের নিকট প্রেরিত হয়। বেণ্টিঙ্ক হাতে যা পেলেন তা সোনার খাঁচায় ভারতীয় শিল্পকে পুরে স্বচ্ছন্দে ইংলণ্ডে টেম্‌স নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া যায়। লর্ড বেন্টিঙ্ক ছিলেন ব্রিটিশ পুঁজিপতি শ্রেণীর মুখপাত্র। তাঁর পক্ষে রামমোহন দ্বারকানাথ প্রস্তুত ঐ স্মারকলিপি গ্রহণ করে আহ্লাদে আটখানা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। বেণ্টিঙ্ক হৃষ্টচিত্তে পুলকিত মনে ঐ স্মারকলিপি ইংলণ্ডে পার্লামেণ্ট ও রাজদরবারে পৌঁছে দিলেন।

ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট তো হাতে চাঁদ পেয়ে গেল। রাজদরবার জানতো রামমোহন দ্বারকানাথের উদ্যোগের কথা। তারা প্রস্তুত হয়েই ছিল। স্মারকলিপি পার্লামেণ্টে অনুমোদিত হলো। সালটা ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। পার্লামেণ্ট এবার আইন পাশ করলো এই মর্মে, যে কোন ইংরাজ ভারতের মাটীতে জমি কিনতে পারবে। ইংরাজ বণিকরা বিভিন্ন ব্রিটিশ উপনিবেশে ক্রীতদাস সংগ্রহ করে ব্যবসা বাণিজ্য চালাতো, কারখানা বাগিচা চালাতো। পার্লামেণ্টে যে আইন পাশ হয়েছিল তার মুখবন্ধে লিখিত হলো আইনরচনার উদ্দেশ্য "অসভ্য বর্ব্বর ভারতীয়গণকে সভ্য করবার জন্য, ভারতের বৈষয়িক উন্নতি বিধানের জন্য"।

ভারতবর্ষের কৃষক যারা এতকাল ধান্য, শাক-শব্জী, তুলা, পাট, ইক্ষু প্রভৃতি উৎপাদন করতো এই আইন চালু হবার ফলে তারা দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়লো। পশ্চিম

ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে অসংখ্য ইংরাজবণিক ক্রীতদাসমালিক হয়ে ব্যবসা বাণিজ্য করতো। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট তাদের মূল ভারতীয় ভূখণ্ডে চলে আসার সুযোগ করে দেওয়ায় তারা এদেশের বুকে কলকাঠি নিয়ে বসলো। তাঁতবস্ত্র ব্যবসায়ী, নীল ব্যবসায়ী ছাড়াও লবণ, তুলা, মশলা, চিনি, প্রভৃতির ব্যবসায়ীরূপে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। বাংলা ও বিহারকেই তারা কাঁচামালের স্বর্গরাজ্য বলে জেনে এসেছে। তার মধ্যে আবার বাংলার বিখ্যাত মসলিন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ও চাহিদাপূর্ণ। কাজেই তারা বাংলা প্রদেশের কৃষক ও কারিগরগণের ঘাড়ের ওপর জগদ্দল পাথরের ন্যায় চেপে বসলো। যে রামমোহন ভারতে সর্বাপেক্ষা কুৎসিততম কুসংস্কার, মানবতা বিরোধী। 'সতীদাহ প্রথা' নিবারণ কল্পে জেদের বশে প্রায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করার উপক্রম ক'রেছিলেন এবং মানব হিতৈষী সমাজসংস্কারক এক মহান পুরুষ হিসাবে অগনিত মানুষের কাছে সম্মানিত হন তাঁর এহেন কার্যকলাপ নিজ শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়।

রামমোহন দ্বারকানাথের অনুরূপ বঙ্কিমচন্দ্রও ইংবাজদের তুষ্ট করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধে, উপন্যাসে কত কথা লিখেছিলেন তার ইয়ত্তা নেই। যে 'আনন্দমঠ' উপন্যাসকে জাতীয়তাবাদীরা পরম পবিত্র গ্রন্থ জ্ঞানে পাঠ করে বা উদ্ধৃতি দেয়, উপন্যাসের মধ্যে আছে 'বন্দেমাতরম' রণধ্বনি, সেই উপন্যাসের অসংখ্যা পৃষ্ঠায় বঙ্কিমের ইংরাজ স্তুতিবাক্য ধরা পড়ে। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটির প্রেক্ষাপট ১১৭৬ বঙ্গাব্দের কুখ্যাত 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' এবং বিখ্যাত 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' ঘটনা অবলম্বনে। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে বাংলার জমিদারদেব প্রবাসী ইংরাজ বেনিয়াদের জয়গান। 'সন্ন্যাসীবিদ্রোহ' যে কারণে ঘটেছিল এবং এই বিদ্রোহের প্রেক্ষাপট এবং অংশ গ্রহণ বিজয়ীদের পরিচয়, বিদ্রোহের লক্ষ্য সব কিছুই বঙ্কিম 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে ভুল তথ্য দিয়েছেন। 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' প্রকৃতপক্ষে নিঃস্ব, বুভুক্ষু, কৃষক ও কর্মহারা কারিগরগণের বাংলার জমিদার ও ইংরাজ কুঠিয়ালদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র শ্রেণী সংগ্রামেব ইতিহাস।

কিন্তু বঙ্কিম এই বিখ্যাত উপন্যাসটিকে হিন্দুত্ববাদীদের কোলে ঝোলটানার কাজটি সযত্নে সম্পাদনা করেছেন। মুসলমান যবনরাই যেন দেশের শত্রু এবং মুসলমান শাসনের কবল থেকে দেশকে উদ্ধার করে ইংরাজদের হস্তে শাসনভার অর্পণ করলেই যেন বাংলার কৃষকদের মুক্তিলাভ ঘটবে এমন কথা বিদ্রোহের তথাকথিত নায়ক সত্যানন্দের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে—"সত্যানন্দ, কাতর হইও না। তুমি বুদ্ধির ভ্রমে দসুবৃত্তির দ্বারা ধনসংগ্রহ করিয়া রণজয় করিয়াছ। পাপের কখনও পবিত্র ফল হয় না। অতএব তোমরা দেশ উদ্ধার করিতে পারিবে না। আর ফল যাহা হইবে ভালই হইবে, ইংরেজ না হইলে

সনাতন ধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই'' অর্থাৎ ইংরাজ এদেশের শাসনভার গ্রহণ না করলে সনাতন হিন্দু ধর্মের জয়ডঙ্কা বাজবে না। ইংরাজদের সববিষয়ে যে কতজ্ঞান! বঙ্কিম সেই প্রসঙ্গে বলছেন—''ইংরাজ বহির্বিষয়ক অতি সুপণ্ডিত লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব।'' এই উল্লেখের পর বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গীর সম্পর্কে বেশি কিছু বলার প্রয়োজন হয় না। 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' কে তিনি 'সন্তান বিদ্রোহ' রূপে চিহ্নিত করেছিলেন এবং 'সন্তানদল' নামক একটি সাম্প্রদায়িক দলের কর্মসূচীর কথা বারংবার উল্লেখ করেছেন। ঐ দলের কর্মসূচী ইংরাজদের এদেশের বুকে স্বাগত জানানো। সেই কর্মসূচীটির ব্যাখ্যা দিয়ে বঙ্কিম বলছেন—

''ইংরাজরা বণিক এক্ষণে অর্থ সংগ্রহেই মন দিয়াছে। রাজ্য শাসনভার লইতে চাহে না। এই সন্তান বিদ্রোহের কারণে তাহারা রাজ্য শাসনভার লইতে বাধ্য হইবে,.......ইংরেজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে বলিয়াই সন্তান বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে।'' বঙ্কিম ইংরাজ বেনিয়াদের এদেশের রাজ্য শাসনভার গ্রহণের জন্য সনির্বন্ধ আবেদন জানাচ্ছেন ইংরাজ ভক্তির চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। তাই দেখি তিনি লিখছেন—

''শত্রু কে? শত্রু আর নাই। ইংবেজ মিত্র রাজা।'' পরবর্তী পৃষ্ঠায় তিনি ইংরাজদের জয়গান গাইছেন—''ইংরেজ বাংলা দেশকে অরাজকতার হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছে।'' ''ভারতবর্ষ পরাধীন কেন'' এক প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক বঙ্কিম ইংরাজ শাসনকর্তাদের সার্টিফিকেট দিচ্ছেন নিম্নরূপ ''ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী। যাহা আমরা জানিতাম না তাহা জানাইতেছে। যাহা কখনও দেখি নাই, শুনি তাই। বুঝি নাই তাহা দেখাইতেছে, শুনাইতেছে বুঝাইতেছে।....'' ''অনেকে রাগ করিয়া বলিবেন তবে কি স্বাধীনতা পরাধীনতার তুল্য? ...আমরা আমাদের প্রয়োজন নাই।'' এরপর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তৎকালীন বঙ্গ সমাজে কাদের প্রতিনিধি ছিলেন তা নির্ণয় করা অসম্ভব? উনবিংশ শতাব্দীর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, সামন্ততন্ত্র বিরেধী যে মরণপণ সংগ্রাম নীলচাষীরা শুরু করেছিল, তার সমর্থনে যাঁরা খোলাখুলি বিবৃতি বা প্রবন্ধ লিখেছিলেন তাঁদের মধ্যে দীনবন্ধু মিত্র, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছাড়াও অমৃতবাজার পত্রিকার শিশির কুমার ঘোষ এবং আরও এক দুইটি পত্রিকা 'ক্যালকাটা রিভিয়ু এবং 'সমাচার দর্পণ' অন্যতম।

'ক্যালক্যাটা রিভিয়ু'—'ক্যালক্যাটা রেভিয়ু' ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের একটি সংখ্যায় নীলকর সাহেবদের এদেশে লগ্নী করতে আসার উদ্দেশ্য সম্পর্কে রামমোহন দ্বারকনাথের বক্তব্যের ঠিক বিপরীত বক্তব্য প্রকাশ করে—''নীলকর সাহেব এক ভাগ্যান্বেষী বেপরোয়া দুর্বত্ত মাত্র। তাহারও প্রথম কাজ এমন একটা স্থান খুঁজিয়া বাহির করা যেখানে সে নিজেকে

প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। তাদের উপায় হইল পঞ্চাশ হইতে একশত বিঘা কিংবা আরও বৃহদায়তনের একটা জমি ক্রয় করা এবং সেই সঙ্গে কতকগুলি গামলা বস্ত্র প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া একটা 'ফ্যাক্টরি' স্থাপন করা।...কোম্পানীর পূর্বসনদ অনুসারে কোন নীলকর ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিত না। প্রকৃতপক্ষে 'ফ্যাক্টরীর জমি, এমনকি তাহার ফ্যাক্টরীটিও বেনামীতে থাকিত।"

এই প্রতিবেদন প্রকাশ করা 'ক্যালকাটা রিভিয়ুর মতো ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকার তৎকালীন যুগে যথেষ্ট সাহসের বলতে হয়। নীলকররা এবং তাঁতবস্ত্র উৎপাদক কুঠিয়ালরা বা 'আড়ং' এর মালিকরা গ্রামে গ্রামে যে ফ্যাক্টরী' বা 'কারখানা' নির্মাণ করেছিল সে গুলো কোন উদ্দেশ্যে বেনিয়ারা স্বনামে না করে বেনামে পরিচালনা করতো তার কারণ জানা যায় না। যে কারণই হ'ক সেটা অনুমান করে নিতে হবে। আসলে নীলকর মালিকরা ছিল প্রকৃত অর্থে 'বেপরোয়া দুর্বৃত্ত'। দুর্বৃত্তায়নে নীলকর সাহেবরা সে বাঙ্গালী বা ইংরাজরা যেই হক না কেন সে যুগে প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল। উদাহরণ হিসাবে আক্রান্ত মসলিন শিল্পীদের কথাই উল্লেখ্য। ক্ষেত্রে ভরা একইরূপ কেবল প্রকারভেদ। তখন ছিল তাঁতী পরে যুপকাষ্ঠে নীলচাষী। বাকী সবই একই প্রকার। 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হলো কৃষকদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করার জন্য নীলকরদের কৌশলের বিবরণ।

সমাচার দর্পণ পত্রিকায় মুদ্রিত ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মে'র সংখ্যায় বলা হ'লো ঃ—
"নীলের দাদন যে লয, মরণ পর্যন্ত তাহার খালাস নাই।" "মফঃস্বলে কোন কোন নীলকর প্রজার উপর দৌরাত্ম্য করেন তাহার বিশেষ কারণ এই। যে প্রজা নীলের দাদন না লয় তাহাদিগের প্রতি আইলে সে গরু ধরিয়া কুঠিতে আনিয়া বাঁধে। তাহারা নিজেদের চেষ্টাতে জমির নিকট থাকে, কিন্তু যখন গরু নীলের নিকট আইসে যদ্যপি নীলের কোন ক্ষতি না করে তথাপি তখনই সে গরু ধরিয়া কুঠিতে চালান করে, সে গরু এমনত কয়েদ রাখে যে তৃণ ও জল দেখিতে পায় না। ইহাতে প্রজালোক নিতান্ত কাতর হইয়া কুঠিতে যায়। প্রথম তাহাদিগকে দেখিয়া কেহ কথা কহে না, পরে গরু অনাহারে যত শুষ্ক হয় ততই প্রজার দুঃখ হয়। ইহাতে সে প্রজা রোদনাদি করিয়া সরকার লোককে কিছু ঘুষ দিয়া ও নীলের দাদন লইয়া গরু খালাস করিয়া গৃহে আইসে এবং নীলের দাদন যে প্রজা লয় তাহার মরণ পর্যন্ত খালাস নাই যেহেতুক হিসাব রক্ষা হয় না, প্রতি সনেই বাকীদার কহিয়া ধরিয়া কয়েদে রাখে। তাহাতে প্রজারা ভীত হইয়া হাল

বকেয়া বাকী লিখিয়া দিয়া দাদন লইয়া যায়। এরূপ যাবৎ গোবৎসাদি থাকে তৎভিটায় থাকে। তাহার অন্যথা হইলে স্থান ত্যাগ করে যেহেতু দাদন থাকিতে অন্য শস্য আবাদ করিতে পারে না।'' নীলকুঠিগুলির সাহেবরা কত ধূর্ত ছিল তা 'সমাচার দর্পণ' তৎকালে সাহসের সঙ্গে প্রকাশ করে দেয়, 'বঙ্গদর্শন' যা পারে নি। বাংলার বুকে ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চলেছিল 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' উত্তরবঙ্গ দাপিয়ে। ক্ষিন্ন, শীর্ণ, জমি ও ভিটা থেকে উৎখাৎ কৃষক, তন্তুজীবি, অন্যান্য গ্রামীণ কারিগররা অস্ত্র তুলে ধরেছিল বিদেশী উপনিবেশ সৃষ্টিকারী ইংরাজ বেণিয়া আর তাদের মুৎসুদ্দী দালাল জমিদার মহাজন বিদেশী মহারাজাদের শোষনের বিরুদ্ধে। শোষণ ব্যবস্থার ভিতটাই কাঁপিয়ে তুলেছিল সশস্ত্র সৈনিক-সন্ন্যাসীরা। 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত ভারতের বুকে ব্রিটিশবিরোধী প্রথম সংগ্রাম, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সংগ্রামেরই একটা অংশ। ইউরোপে সঙ্ঘটিত বিভিন্ন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে যেমন বুর্জোয়া শ্রেণী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি মধ্যশ্রেণী নেতৃত্বকারী ভূমিকা নিয়েছিল, 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' পরিচালনা করতে এদেশে ঐ শ্রেণী সেই ভূমিকা নেয় নি। তাছাড়া কৃষক ও ভূমিহীন কৃষক, তাঁতহীন তন্তুবায়ীদেরও তাদেরই অনুরূপ অন্যান্য কারিগরদের এই অভ্যুত্থানকে কেন যে' সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' নামাঙ্কিত করা হয়েছিল জানা নেই। 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' পরিচালনা করেছিলেন মজনু শাহ, মুশা, চেরাগ আলি, ভবানীপাঠক এবং দেবী চৌধুরানী। কেবল নামকরণের সুযোগে হিন্দু জাতীয়তাবাদের রেঁনেসাসের প্রচারকরূপে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র এই বিদ্রোহকে বারংবার মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের বিদ্রোহরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে এর পরিসমাপ্তি ঘটে এমন এক সময়ে যখন 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' এর অবদানে ভারতের বুকে জন্ম গ্রহণ করেছে 'প্যারাসাইট' জমিদারশ্রেণী ও তাদের অধঃস্তন অনুচর শ্রেণী ব্রিটিশ রাজশক্তির উদগ্র কামনা আর ধর্ষনের ফলে জন্মলাভ করেছে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' নামক এক জারজ সন্তানের। ব্রিটিশের জারজ সন্তান 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' দ্বারা জন্ম লব্ধ সামন্ত শ্রেণীর বিরুদ্ধে সেই সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এই দুই শত্রুর উৎকট শ্রেণীশাসন ও শোষনের বিরুদ্ধে। হিন্দু মুসলমান ধর্ম্ম নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের দৃষ্টান্ত 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ'। বলিষ্ঠ সংগ্রামের প্রত্যয় দৃপ্তরূপের বহিঃপ্রকাশ। খণ্ড-বিখণ্ড বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহ পরিচালনায় যে সফলতা আসতে পারে না তৎকালীন নেতৃত্বের পক্ষে উপলব্ধি সম্ভব ছিল না। এটাও অতি বাস্তব যে, অষ্টাদশ শতাব্দী জুড়ে বাংলার বুদ্ধিজীবিদের এক মহতী অংশ পুরাতন সংস্কারের অবসান, নতুন চিন্তার বহিঃপ্রকাশ,

ইংরাজী শিক্ষার ব্যাপক প্রচলনের ফলে উন্নাসিকতা, তৎকালীন বা মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে উত্থান, সুস্থচিন্তার উন্মেষ, মূল্যবোধের চেতনা বৃদ্ধি, মধ্য শ্রেণীর যাবতীয় শ্রেণীসুলভ আত্মম্ভরিতা, কৃষক সংগ্রামগুলি থেকে সহস্র যোজনদূরে গা বাঁচিয়ে অবস্থান, ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে নিজেদের নিরপেক্ষ রাখার সযত্ন প্রয়াস চলছিল, সেই যুগে সামন্ত শ্রেণীর বিরুদ্ধে উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে কৃষক সংগ্রাম পরিচালনা করা কি দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল তা বর্তমানকালে চিন্তাই করা যায় না।

শিশিরকুমার ঘোষের বিবরণ ঃ—বাংলায় তখন ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্য ও জমিদার শ্রেণীর দ্বারা বুদ্ধিজীবিদের সংগঠিত 'রেনেসাঁস' আন্দোলন কৃষক বিদ্রোহ বা তন্তুবায়ীদের সংগ্রামের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করেনি। হরিশ্চন্দ্র, দীনবন্ধু, শিশিরকুমার, মাইকেল প্রমুখ-কিছু প্রগতিশীল ব্যক্তিত্ব ছাড়া কৃষক সংগ্রামগুলিকে অন্য বুদ্ধিজীবিরা সমর্থন করেন নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর ঘটনাবলী 'অমৃতবাজার পত্রিকার' ২২শে মে, ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের সংখ্যায় শিশিরকুমার ঘোষ কর্তৃক বিদ্রোহ উচ্চ প্রশংসিত হয়। তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, নীলবিদ্রোহ থেকে তিনি অনেক শিক্ষালাভ করেছেন। তাঁর মন্তব্যের কিয়দংশ নিম্নরূপ ঃ—

"এই নীলবিদ্রোহই সর্বপ্রথম দেশের মানুষকে রাজনৈতিক আন্দোলন ও সঙ্ঘবদ্ধ হইবার প্রয়োজনীয়তা শিখাইয়াছিল। বস্তুত বঙ্গদেশে বৃটিশ রাজত্বকালে নীলবিদ্রোহই প্রথম বিদ্রোহ। শিশিরকুমারের ন্যায় এত স্পষ্ট ভাবে 'নীলবিদ্রোহ'কে সমর্থন করে প্রকাশ্য বিবৃতি দেওয়া হরিশ্চন্দ্র ব্যতীত অপর কোন পত্রিকার পৃষ্ঠায় প্রকাশ হয়নি। শিশির কুমার ঘোষ নীলবিদ্রোহের সংবাদ প্রেরণ করে জানালেন পাবনা জেলায় বিভিন্ন গ্রামে নীলকর সাহেবদের সঙ্গে নীলচাষীদের শ্রেণী সংঘর্ষের বিবরণ। শিশিরকুমার লিখছেন ঃ—

"নীলকর কেনির লোকেরা একজন চাষীকে অপহরণ করিয়াছে—এই সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র সাতাশখানি গ্রামের কৃষক কেনির কুঠির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে। বিজলিয়া কুঠির ওকান সাহেব কতিপয় গ্রামের মণ্ডলদের গ্রেপ্তার করিয়া তাহাদিগকে নীলচাষের চুক্তিতে স্বাক্ষর দিতে বাধ্য করে। তাহারা গ্রামে ফিরিয়া সকলে চাষীকে একত্র করে এবং কুঠির আমীন ও তাগিদদারগণকে প্রহার করিতে করিতে গ্রাম হইতে বাহির করিয়া দেয়। অবশেষে গ্রামের কৃষকগণ তাহাদের নিজস্ব অধিকার বজায় রাখিবার জন্য চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। বিশে জুন তারিখে মল্লিকপুরে মীরগঞ্জের কুঠির জন ম্যাকার্থারের দলের সঙ্গে গ্রামের কৃষকদের একটা বড় সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে।"

শিশিরকুমার আরও জানাচ্ছেন যে, ২০ জুলাই মল্লিকপুরের কৃষক পাঁচু শেখকে নীলকরের ২৫ জন লাঠিয়াল গ্রেপ্তার করিতে আসে তাদের সহিত ২৫ জন কৃষকের এক সংঘর্ষ হয়। উভয় পক্ষেই বহুলোক আহত হয় এবং লাঠির আঘাতে পাঁচু শেখকে হত্যা করা হয়।

৮ই আগষ্ট, ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ তারিখে শিশিরকুমার ঘোষ সম্পাদিত 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য়। যশোহরের নীলচাষীদের সংগ্রামের বিবরণ নিম্নরূপে ঃ—

"যশোহরের রায়তগণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।....সংগ্রামের প্রধান কেন্দ্র ছালকোপা, বিজলিয়া, রামনগর প্রভৃতি স্থানের কুঠিগুলি সহস্র কৃষক নীলকুঠির আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বলপূর্বক ফসল লইয়া যাইবার জন্য নীলকরণগণ রিভলবার, গুলিবারুদ ও লাঠিয়াল সংগ্রহ করিতেছে। গ্রামের কৃষকগণও লাঠি ও বল্লম সংগ্রহ করিতেছে। তাহাদের প্রতিজ্ঞা এই যে, মূল্য না দিয়া তাহারা ফসল লইয়া যাইতে দিবে না।"

শিশির কুমার ঘোষ প্রেরিত সংবাদ এবং নীলচাষীদের সমর্থনে লিখিত প্রবন্ধের অনুরূপ প্রবন্ধ বা সংবাদ তৎকালে বেশি হতো না। এ ব্যাপারে ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেট'ও ছিল নীরব। তদানীন্তনকালে শিক্ষাজগতে ভূদেববাবুর যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। তিনি ছিলেন শিক্ষাবিভাগের প্রধান পরিদর্শক। তাঁকেও ইংরাজগভর্ণমেন্ট C. I. E. (Companion to Indian Empire) উপাধিতে ভূষিত করেছিল। একই উপাধিতে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকেও ভূষিত করা হয়েছিল। কিন্তু সেই উপাধি গ্রহণ করতে বিদ্যাসাগর রাজদরবারে উপস্থিত হননি। বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় খোলাখুলি বিদ্যাসাগর নীলবিদ্রোহের বিরোধিতা করেননি, তবে সিপাহী বিদ্রোহীদের তিনি বিরোধী ছিলেন। সিপাহীদের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা তিনি সমর্থন করেননি। কিন্তু বিদ্যাসাগরের শিক্ষাবিস্তারের আপ্রাণ প্রয়াস, দুর্বল নারীজাতির অধিকার রক্ষার সংগ্রামে অদম্য উদ্যোগ, ধর্মীয় কুসংস্কার মুক্ত মনন শীলতার জন্য 'সিপাহী বিদ্রোহ' সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের তীব্র বিরোধিতার মনোভাব গৌণ হয়ে পড়ে। তাঁর মুখ্য ভূমিকা ছিল নিরক্ষরতার অভিশাপমুক্ত এক উজ্জলজাতি গড়ে তোলা এবং নারী সমাজ সম্মানিত এমন সমাজ গড়ে তোলা। এজন্যই তিনি যুগে যুগে বরেণ্য হয়ে থাকবেন।

বঙ্গীয় রেনেসাঁসের অন্যতম কাণ্ডারীগণ যেমন বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ আরও কয়েকজন মাইকেল সুহৃদ হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের

বাড়াবাড়ীর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন। এঁরা পাশ্চাত্য কৌলিন্য প্রথার অনুসারী ছিলেন। নানাভাবে এদের বিরুদ্ধে সমাজের পচাগলা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচারেও সামিল হয়েছিলেন। দুঃখেব বিষয় এঁরাও সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণী শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহযোদ্ধা হতে পারেন নি। তবে তৎকালীন সময়ে যে সামাজিক অবস্থা বিবাজমান ছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে বা তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাঁরা যে রেনেসাঁসের পথে আগুয়ান হয়েছিলেন তা ছিল প্রগতিশীলতার পরিচায়ক এসব বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। এঁরা মূর্তিপূজারও প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন।

❑ স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকা এবং রেঁনেসাস আন্দোলনের প্রভাব ❑

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হিন্দু কলেজের 'ইয়ং বেঙ্গল অ্যাসোসিযেশন' এব সদস্য হেনরী লুই ভিভিযান ডিরোজিও যিনি জন্মসূত্রে পর্তুগীজ পবিবারের হলেও জন্ম কলকাতায় পৌত্তলিকতার বিরূদ্ধে বাংলার সাহিত্য ও শিক্ষাজগতে আমূল পবিবর্তনেব স্বাক্ষর রেখেছিলেন। তাঁর আদর্শের জোয়ারে যখন ভাঁটার টান দেখা দিতে শুরু করে তখন হিন্দু জাতীয়তাবাদের সক্রিয় প্রচারকরূপে স্বামী বিবেকানন্দ দেশে বিদেশে ঝড় তুললেন। তিনি পৌত্তলিকতার পূজারী রামকৃষ্ণ পরমহংসকে 'গুরু' রূপে সম্মানিত করলেন, শিষ্যত্বগ্রহণ করলেন। স্বামী বিবেকানন্দ মেথর, মুচি, চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ প্রত্যেককে এবং সকলকে "ভারতবাসী আমার ভাই" বলে সম্বোধন করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। মেথর, মুচি, চণ্ডাল, প্রভৃতি কতকগুলি অশ্লীল সম্বোধন সূচক শব্দের ব্যবহার, যে সকল শব্দ অর্থহীন সে সকল ব্যবহাব করেছিলেন। জাত পাতের বিরুদ্ধে বিবেকানন্দ সোচ্চার ছিলেন কিন্তু উচ্চবর্ণের জমিদাররা কৃষকের ওপব অত্যচার, শ্রেণী শোষণ যে বন্ধ করে না, হিন্দু ধর্মের জমিদাররা হিন্দু ধর্মাবলম্বী কৃষক মজুরকে শোষণের হাত থেকে রেহাই দেয় না, কারণ তখন তাদেব একটাই পরিচয় হিন্দু বলে নয়, একজন জমিদার এবং অপরজন কৃষক। শোষক শ্রেণী যে দুর্বলতর শ্রেণীর ওপর অত্যাচার, নিপীড়ন বন্ধ করে না, ধর্মের খোলস চাপিয়ে হিন্দুধর্মের নামাবলী যেমন কৃষকের গাত্রে, তেমনি জমিদারদের গাত্রে, কিন্তু পরস্পর পরস্পরের শ্রেণী শত্রুতার জন্য সহাবস্থান

চলতে পারে না, এই সহজ সত্যটি বিবেকানন্দর পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব ছিল না। বাংলার বিপ্লবী জাতীয়তাবাদীগণ স্বামী বিবেকানন্দর শিক্ষা ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এদের মধ্যে অনেকে ছিলেন হতাশাচ্ছন্ন মধ্য শ্রেণীর যুবক অথবা ধনী জমিদার পরিবারের সন্তান। যাদের সঙ্গে কৃষক সমাজের সুখ দুঃখের কোন সম্পর্ক ছিল না। বিবেকানন্দ তাঁর শিষ্য শিষ্যাদের নিকট 'ঋষি' বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ অনুসরণে বা তাঁর গ্রন্থ নিচয় পাঠ্যাভ্যাসের আহ্বান জানিয়েছিলেন। বিবেকানন্দ প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অনুসৃত 'হিন্দুজাতীয়তাবাদ' এর ঘোরতর সমর্থক ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের যেরূপ কৃষক সংগ্রামগুলির প্রত্যক্ষ বিরোধিতা ছিল বিবেকানন্দ খোলাখুলি সেরূপ ঘোষণা করেননি ঠিকই, কিন্তু চলতি এবং অতীতে কৃষক সংগ্রামগুলির প্রতি কখনও সামান্যতম সমর্থনও জানাননি। তিনি মাদ্রাজে যে বক্তৃতা দেন তার বিষয়বস্তুছিল—"My Plan of Campaign' অর্থাৎ আমার প্রচার পরিকল্পনা। সেই বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি সেই সমাজতন্ত্রের প্রচার করেন যার দ্বারা ভারতবর্ষে না কি আধ্যাত্মিক ভাবধারা বন্যার জলের ন্যায় ছুটবে, ভারতে সৃষ্টি হবে 'ধর্মীয় নব জাগরণ'। স্বামীজি ঘোষণা করলেন' 'I am a Socialist' কিন্তু কোন্ ধরনের সোস্যালিজম্? যে 'সোস্যালিজম্' ইংরাজ পুষ্ট জমিদারদের শ্রেণী শোষণ নির্মূল করার কাজটি প্রকৃতপক্ষে এড়িয়ে চলবে? 'মুচি', 'মেথর,' 'চণ্ডাল', এই রূপ কতকগুলো শ্রেণী বিবর্জিত শব্দ পেশাগত অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। উচ্চবর্ণীয়রা 'চণ্ডাল' কে 'চাঁড়াল' বলে থাকে। 'চোয়াড়' শব্দটির দ্বারা নীচ জাতিকে চিহ্নিত করা হয়। এদের 'নীচ ও দুর্বৃত্ত' শ্রেণীর মানুষ বলেই উচ্চ ও মধ্যবর্ণীয়রা প্রচার করে। বিবেকানন্দ এদের সকলকেই হিন্দু ধর্মের পতাকাতলায় আনার বাণী প্রচার করেন তবেই নাকি পশ্চিমের বিরুদ্ধে লড়াই করা আর জয়ী হওয়া সম্ভব হবে। বিবেকানন্দ বলেছেন হিন্দুধর্ম প্রসারের কথা—"যদিও প্রয়োগের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যকে হার মানায়, কিন্তু ধর্মসাধনের ও ধর্মবিশ্বাসে হিন্দুত্ব যেন তোমার অস্থিমজ্জায় মিশে থাকে।" আধুনিককালে এই ১৯৯৯ সালের জানুয়ারী মাসে হিন্দুত্ববাদীরা স্বামী বিবেকানন্দর উপরোক্ত আহ্বানকে কার্যকরী রূপ দিতে সাধ্যমতো প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ওরা মুসলিমদের, খ্রীষ্টানদের উপাসনাস্থলগুলি ধ্বংস করছে। মুসলিম গায়ক, অভিনেতা, খ্রীষ্টানদের নিজ দেশে তাদের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ধর্মীয় স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার ক্ষুন্ন হচ্ছে। অহিন্দুদের বাড়িঘর, পুস্তকে অগ্নিসংযোগে করা হচ্ছে, এবং পিতা-পুত্রদের একত্রে বেঁধে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ কঙ্কালসার করে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে।

এরা চীৎকার করে বলছে খ্রীষ্টান, মুসলিম ধর্ম সব পাশ্চাত্যের, এদের ধর্মীয় আচার আচরণের অধিকার এদেশে থাকতে পারে না। পাঁচশত বছরের প্রাচীন বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে মাটীতে মিশিয়ে দেওয়া হলো, কয়েকহাজার সংখ্যালঘু মুসলিম প্রাণ হারালো, খ্রীষ্টানরা গীর্জার মধ্যে পুড়ে মরছে। যারা একাজ করছে তারা নিজেদের রামের উপাসক, রামের ভক্ত হনুমানের দল 'বজরং দল' ইত্যাদি প্রচার করে গর্ববোধ করে। ইসলাম যুগের সংস্কৃতি, স্থাপত্য, পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীদের নানান আবিষ্কার এসবকে গৌণ মনে করে। এরা প্রচার করছে স্বামী বিবেকানন্দর উক্ত বাণী হিন্দু ধর্মেব রেনেঁসাস পুনরুজ্জীবনের বাণী— "এই জন্যই আমি একদল কর্মী চাই, যাঁহাবা ব্রহ্মচারী হইয়া দেশের লোককে শিক্ষাদান করিয়া এই দেশকে পুনঃসঞ্জীবিত করিতে পারিবেন।"

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম ও ভূমিকা ঃ ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের যুগে পৌত্তলিকতা বিরোধী, কুসংস্কার বিরোধী পাশ্চাত্য ভাবধাবায় দীক্ষিত আব এক দল প্রগতিশীল ব্যক্তিত্বের কাজকর্মের ধারায় জন্ম ব্রাহ্ম সমাজ। ব্রাহ্মসমাজের কর্তাব্যক্তিরা হিন্দু ও খ্রীষ্টান ধর্মের থেকে পৃথক সত্তা বা অস্তিত্ব বজায় রাখার সংগ্রামে ব্যাপৃত ছিলেন। এঁরা গ্রামের কৃষক বা মজুর শ্রেণীর ওপর প্রচলিত শোষণ ব্যবস্থা নিয়ে টুঁ শব্দটি করতেন না। ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে বাংলায় দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া মৃত্যুর অশনিসঙ্কেত তড়িদগতিতে চলে যায় গঙ্গা পদ্মা ছাপিয়ে ব্রহ্মপুত্রের পাদদেশে। বাংলার বুদ্ধিজীবিদের সামান্য কয়েকজনের নাম বাদ দিলে অধিকাংশই শ্রেণী হিসাবে মজুর শ্রেণীকে বাঁচিয়ে রাখার সংগ্রামে কোন ইতিবাচক ভূমিকাই গ্রহণ করেনি। প্রায় একশত নব্বুই বছর কাল বাংলার কৃষক, বাংলার তন্তুজীবি, গ্রামীণ কারিগররা একের পর এক দুর্ভিক্ষের ধাক্কায় প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। সিল্কবস্ত্র, মসলিনবস্ত্র, সুতিবস্ত্র উৎপাদনের বিশাল গৌরবময় আকাশচুম্বি খ্যাতি কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। জাতীয় আন্দোলনের নেতারা চরকায় সুতা কাটতে আরম্ভ করলেন। তন্তুজীবিদের জীবনপণ লড়াইয়ের কথা ধামাচাপা পড়ে গেল।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলো ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই অধিবেশন থেকে। জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন উদ্বোধন করা থেকে তার যাবতীয় ব্যবস্থাপনা, অধিবেশন সূচী, কর্ম্মধারা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির করা থেকে তার যাবতীয় খুঁটিনাটিতে ইংরাজ সম্রাজ্ঞীর প্রতিনিধি অক্টোভিয়ান হিউমেব হস্তক্ষেপের কথা সুবিদিত। হিউমই তো উদ্বোধন করেছিলেন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের "যাঁর রাজত্বের সূর্য অস্ত যায় না যাঁর জুতার ফিতা খোলারও যোগ্য ভারতীয়রা নয়"— প্রথম কংগ্রেস অধিবেশন থেকে ইংলণ্ডেব

মহারাণীকে এমন সব বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছিল। সোজা কথায় ব্রিটিশের দালালি করা ছাড়া ঐ সংগঠনের জন্ম লগ্নে অন্য কাজ করা হয়নি। এমন সব প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে স্বাধীনতার কোন দাবীরই উল্লেখ ছিল না। চরকায় সুতা কাটছেন গান্ধীজি এমন চিত্র পাঠ্যপুস্তক বা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সচিত্র কাহিনী পাঠকের দৃষ্টি অবলোকিত করে কিন্তু যে উপনিবেশবাদী সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রে, কার্পাস তুলা থেকে সুতিবস্ত্র প্রস্তুতের বিশাল কর্মকাণ্ড ধ্বংস প্রাপ্ত হলো, সেই সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির বাংলা তথা ভারতের শিল্প ধ্বংসের দুই শতাব্দী ব্যাপী অভিযানে ভারতবর্ষের সম্পদ লুঠ করে ইংলণ্ডের শ্রীবৃদ্ধি সাধন এইসব জ্বলন্ত প্রশ্নাবলী নিয়ে জাতীয় কংগ্রেস জন্ম লগ্ন থেকেই নীরব ছিল। বরং বহুক্ষেত্রে ব্রিটিশের গুণকীর্তনেই অধিবেশনের সময় ব্যয় হয়েছে। অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউমই ছিলেন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রাণ পুরুষ। হিউমের জীবনী লেখক স্যর উইলিয়ম ওয়েডবার্ণ তাঁকে (হিউমকে) অভিহিত করেছিলেন—"Father of Indian National Congress" এইনামে। অক্টোভিয়ান হিউম ইংলণ্ডে থাকাকালীনই ভারতে ক্রমবর্দ্ধমান ইংরাজ শাসন বিরোধী বিক্ষোভের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন, বিশষতঃ সিপাহী বিদ্রোহ পরবর্তীকালে ভারতে প্রতিবছরই দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হওয়ায় জনসাধারনের মধ্যে বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে থাকে। তার আঁচ পেয়েছিলেন সাম্রাজ্যবাদী হিউম। হিউম আতঙ্কিত বোধ করেছিলেন ভারতে ক্রমবর্দ্ধমান বিক্ষোভ থেকে গণবিপ্লব সৃষ্টির আশঙ্কায়। হিউম নিজে উল্লেখ করেছিলেন ভারতে দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে একটা মরীয়া মনোভাব সৃষ্টির কথা। জনসাধারণের অধিকাংশই শ্রমিক, কৃষক, এবং মধ্যনিম্নবিত্তশ্রেণীর মানুষ।

১৮৭৭-৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষে সমগ্র ভারতবাসীই বিপদাপন্ন হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর সমগ্র সাতের দশক জুড়েই দেশময় দুর্ভিক্ষের দাপটে যখন কয়েক লক্ষ ভারতবাসীর মৃত্যু অনিবার্য হয়ে গেছে তখন এদেশের 'রাণী' রূপে ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার উপাধিগ্রহণ উপলক্ষ্যে দিল্লীতে প্রভূত অর্থব্যয়ে দরবারের যে অধিবেশন হয়েছিল তার ফলে জনসাধারণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এদেশীয় কয়েকটি সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় ইংরাজদের অপকীর্তির কথা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় ব্রিটিশ সরকার এদেশে আইন জারী করে সংবাদপত্রের কণ্ঠ রোধ করে এবং গণবিদ্রোহের কিনারা থেকে ভারতকে 'উদ্ধার' করার অভিপ্রায়ে ইংলণ্ডের রাণীর প্রতিনিধিরূপে অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম ভারতবর্ষে প্রেরিত হন এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেস স্থাপন করার যাবতীয় ব্যবস্থা চূড়ান্ত করেন। হিউমের কাছে রিপোর্ট ছিল ভারতের অসংখ্য ছোট ছোট রাজনৈতিক

দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটা বৃহৎ-দল গঠন করবে। কারণ সাধারণ মানুষ ক্রমশই সরকার বিদ্রোহী হয়ে উঠছে। এদের অর্থাৎ বিদ্রোহীদের হস্তে মজুত আছে প্রচুর অস্ত্র। হিউমের নিজের কথায় আছে—"ইহা কেহ ভাবে নাই যে, ইহার ফলে প্রথমস্তরে আমাদের সরকারের বিরুদ্ধে একটা ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দিবে, অথবা বিদ্রোহ বলিতে যাহা বুঝায় সেই প্রকারের কিছু ঘটিবে। আশঙ্কা করা হইয়াছিল, আকস্মিকভাবে চারিদিকে ইতঃস্তত হিংসামূলক অপরাধ যেমন দোষী ব্যক্তিদের হত্যা, ব্যাঙ্ক ডাকাতি, বাজার লুঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবে। দেশের নীচুস্তরের অর্ধাহারী শ্রেণী সমূহ যে অবস্থায় রহিয়াছে তাহাতে ইহাই আশঙ্কা করা হইয়াছিল যে, প্রথম কয়েকটি অপরাধ এই প্রকারের শতশত অপরাধমূলক কার্য্যের সংকেত জানাইবে এবং সেই গুলিই একটা ব্যাপক অরাজক অবস্থার সৃষ্টি করিবে। তাহার ফলে কর্তৃপক্ষ ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীসমূহ নিষ্ক্রীয় হইয়া পড়িবে। ইহাতে আশঙ্কা করা হইয়াছিল যে, পাতার উপর অসংখ্য জলবিন্দুর মত দেশের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত ছোট ছোট দল সমূহ ঐক্যবদ্ধ হইয়া কতকগুলি বৃহৎদলে পরিণত হইবে ; দেশের সকল দুষ্ট লোক একত্র হইবে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুণ্ডাদলগুলি একত্র হইবার পর...সরকারের বিরুদ্ধে গভীর অসন্তোষের ফলে ক্ষিপ্ত হইয়া সকলে ঐ সকল দলে যোগদান করিবে : বিভিন্ন স্থলে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া খণ্ড খণ্ড জাতিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিবে এবং উহাকে একটা জাতীয় অভ্যুত্থানের আকারে পরিচালিত করিবে"। (ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, সুপ্রকাশ রায়, পৃঃ ৩৮৯)

হিউমের আশঙ্কা ছিল গণবিদ্রোহ শেষাবধি সশস্ত্র গণবিপ্লবে পরিণত হবে এবং এদেশ থেকে ইংরাজদের রাজ্যপাট চুকিয়ে মাথানীচু করে চলে যেতে হবে। হিউম ভারতের তৎকালীন বড়লাট বা ভাইসরয় লর্ড ডাফরিনের সঙ্গে পরামর্শের জন্য মিলিত হন। বিশিষ্ট ভারতীয় বংশোদ্ভুত ইংরাজ কমিউনিষ্ট নেতা রজনী পাম দত্ত লিখেছেন তাঁর 'আজিকার ভারত' গ্রন্থে কংগ্রেসের জন্মের সেই ইতিহাসের কথা—"ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্রস্থল সিমলায় (সিমলা তৎকালে ভারতের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী) বসিয়াই বড়লাট লর্ড ডাফরিন ও হিউম কর্তৃক ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিরোধ পরিকল্পনা রচিত হয়"। উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যাঁকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি রূপে প্রত্যেকেই জানে, সেই উমেশচন্দ্রই জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রকৃত ইতিহাসের নিম্নরূপ বর্ণনা দিয়েছিলেন ঃ—

"সম্ভবতঃ ইহা বহুলোকের নিকটই একটি নূতন সংবাদ যে, যেভাবে প্রথমে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং তাহার পর হইতে যে ভাবে তাহা পরিচালিত

হইতেছে তাহা ভারতের বড়লাট হিসাবে ডাফরিন ও আভা মার্কুইস্‌য়েরই কীর্তি।''

জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসে জনগণের সংগ্রামে বা খণ্ড খণ্ড শ্রেণী সংগ্রামের প্রতি অজস্রবার বিশ্বাসঘাতকতার যে কাহিনী আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চর্চা করতে যেয়ে অবগত হই তা এই কারণে যে জন্মলগ্ন থেকেই এই সংগঠনটির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা জড়িত আছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা দুটি তাঁবেদার তথাকথিত 'জাতীয় নেতা'র জন্ম দেয়, যারা 'অনিচ্ছুক' ইংরাজ সরকারের কাছে কিছু আর্থিক ও শাসনতান্ত্রিক সুবিধা আদায় করার সংগ্রামের নাম করে সাধারণ দেশবাসীকে ঠাণ্ডা করে রাখবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে এর দ্বারা পরোক্ষ সহযোগীতা করা হবে। দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিক-কৃষক ও অপরাপর গণতান্ত্রিক সংগ্রামগুলিকে পিছন থেকে বারংবার ছুরি মারার কাজটি সহজ হয়ে যাবে। তৃতীয়তঃ, দেশে রাজনৈতিক নেতৃত্ব গড়ে তোলার প্রয়াস হিসাবে শ্রমিক কৃষকের পরিবর্তে রাজা-মহারাজা, জমিদার-পুঁজিপতি-নায়েব-গোমস্তাদের বাছাই করে নেওয়া সহজ হবে। মহারাজ নন্দকুমারের ন্যায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ব্যক্তিত্ব কংগ্রেস সংগঠনে যাতে কিছুতেই প্রবেশ করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য দিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ জাতীয় কংগ্রেসের জন্মলগ্নেই তাকে হুঁশিয়ারী দিয়েছিল।

১৯

এই সময়েই ভারতবর্ষের গৌরব মসলিন এবং সিল্ক বস্ত্রের বাণিজ্যের প্রায় সমাপ্তি ঘটেছে—উদ্ভব হয়েছে নয়নমুগ্ধ বস্ত্রশিল্পের জন্য 'কটন মিল'। একের পর এক কাপড়ের কল বা কটনমিল প্রতিষ্ঠা হচ্ছে বোম্বাই প্রেসিডেন্সী এলাকাতেই। নতুন বুর্জোয়া পুঁজিপতি শ্রেণীরও প্রয়োজন অনুভূত হতে থাকে যে তাদের শ্রেণীস্বার্থ অক্ষুন্ন রাখতে সহযোগীতা করবে এরূপ একটি রাজনৈতিক সংগঠন। এইসব পুঁজিপতিরা দুহাতে জাতীয় কংগ্রেস গড়ে তুলতে ঢালাও অর্থ সাহায্য করে। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে পর্যন্ত অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম ছিলেন ব্রিটিশ ভারতের কৃষিমন্ত্রী। কাজেই জমিদার পুঁজিপতিরা তাঁর আহ্বানে কংগ্রেস তহবিলে নিজেদের শ্রেণী স্বার্থেই অর্থদান করে। এই সব ইতিহাস জানা থাকাতেই রজনী পাম দত্ত (আর. পি. ডি) লিখেছেন, "প্রকৃতপক্ষে বড়লাটের সাহায্যে সংগোপনে রচিত পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক ব্রিটিশ সরকারের সরাসরি উদ্যোগে ও পরিচালনায় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিল। ক্রমবর্ধমান বিক্ষুব্ধ গণশক্তি এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ক্রোধ থেকে ইংরাজশাসনকে রক্ষা করবার জন্য অস্ত্ররূপে ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে থেকে জাতীয় কংগ্রেসের

প্রতিষ্ঠার এই প্রয়াসের উদ্দেশ্য ছিল আসন্ন বিপ্লবকে পরাস্ত করা অথবা আরম্ভের পূর্ব্বেই তাকে নির্বাক করা।''

১৮৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' ১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দে 'সিপাহী বিদ্রোহ', ১৮৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দে 'নীলবিদ্রোহ', ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে সুন্দরবনের কৃষকবিদ্রোহ, তিতুমীর পরিচালিত ব্রিটিশ ভারতের বাংলা প্রদেশে দীর্ঘতম কৃষক বিদ্রোহ, ১৮৩১-১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত 'বারাসত বিদ্রোহ' বা 'ওয়াহাবী বিদ্রোহ', ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে 'সিরাজগঞ্জ বিদ্রোহ', ১৮৪৪-৯০ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরায় 'কুকি উপজাতি বিদ্রোহ', ১৮৭০-৭৫ খ্রীষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের নানান বিদ্রোহ এবং মহারাষ্ট্র, অযোধ্যা ও পাঞ্জাবের ব্যাপক কৃষক অভ্যুত্থান আর এইসব বিক্ষোভ, বিদ্রোহ, অভ্যুত্থানের পাশাপাশি প্রতিবছরই ব্যাপক দুর্ভিক্ষ ইংরাজ শাসনের ভিত্তিমূলকে ধরে প্রবল টান দিয়েছিল। সর্বশেষে হিউম সাহেব প্রতিষ্ঠিত 'জাতীয় কংগ্রেস' ব্রিটিশ রাজশক্তির রক্ষাকর্তারূপে আবির্ভূত হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর আটের দশকে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকও অতিবাহিত হয়েছিল নানান বিদ্রোহে। যদি 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' নামক একটা প্রকৃত পিতৃপরিচয়হীন দলের ভারতে জন্মলাভ না হতো বা বুদ্ধিজীবি প্রগতিশীলরা যাঁরা বাংলার বুকে শিক্ষার অগ্রগতি ও সমাজ থেকে কুসংস্কার দূরীকরণে যে নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের প্রয়াস চালিয়েছিলেন সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীব্যাপী যদি শ্রমিক ও কৃষক বিদ্রোহগুলিকে বিশেষতঃ সিপাহী বিদ্রোহ ও নীলবিদ্রোহকে পরাস্ত করতে ব্রিটিশের সঙ্গে তাঁরা সহযোগীতা না করতেন তবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঠিক ইতিহাস তৈরী হতো। পাঠ্য পুস্তকের পাতায় পাতায় কেবল জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাস রচিত হতো না। কংগ্রেস দল আকৈশোর কখনও ব্রিটিশদের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয় নি।

উপরে বর্ণিত বিদ্রোহগুলির মধ্যে 'নীল বিদ্রোহ' ও তিতুমীরের বিদ্রোহে তন্তুবায়ীরা সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিল।

'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ', 'সিপাহী বিদ্রোহ', 'নীলবিদ্রোহ' এর ফলাফল ঃ—ব্রিটিশ ভারতে তন্তুবায়ী ও কৃষক বা রায়তদের শোষণ এবং অত্যাচারের রূপ ছিল একই প্রকার। গোলামী এবং বেগার প্রথা তখন ব্যাপকভাবে চালু ছিল। ইংরাজদের বুটের আঘাত হজম করতে হতো। অশ্লীল গালিগালাজ, ঘর থেকে মহিলাদের কুঠি বা ফ্যাক্টরীতে টেনে নিয়ে এসে সাহেবরা লালসা চরিতার্থ করতো। 'দাদন' প্রথার জন্য তাঁতীদের সর্বনাশ হতো একথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অত্যাচারের ফলে অনেকেই প্রাণত্যাগ করতো।

জগদ্বিখ্যাত মসলিন এবং সূক্ষ্ম সুতীবস্ত্র-শিল্প যার সূচনা কাল সুদূর অতীতে হাজার

বৎসর বয়স হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়, সেই উন্নত মসলিন বস্ত্রশিল্প উনবিংশ শতাব্দীর তিনদশকের মধ্যেই ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল। দিল্লীর মোগল হারেম বা বাংলার নবাব হারেম কোনটারই যখন আর অস্তিত্ব নেই তখনও বাংলার সনাতনী শিল্পের গৌরবও ধরে রাখার কোন মানুষ আর জীবিত থাকে না। মোগল বাদশাহ আর অযোধ্যা বাংলার-নবাব পরিবারেরই যখন আর কোন অস্তিত্ব থাকলো না তখন তাদের ব্যবহার্য বস্ত্র প্রস্তুত করাও বন্ধ হয়ে গেল। সেইরূপ সৌখিন মহার্ঘ সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধানের মানুষের সংখ্যাও হ্রাস পেল, সংখ্যা ক্রমে ক্রমে শূন্যে মিলিয়ে গেল।

যে ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মসলিন বস্ত্রের পাহাড় একাধিক সামুদ্রিক জাহাজে চাপিয়ে চীন, পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া ও বিভিন্ন আরব দেশে ও ইউরোপের দেশে দেশে রপ্তানী করতো, ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লবের পরে এদেশ থেকে রপ্তানী বন্ধ হলো মসলিন ও সূক্ষ্ম সুতীবস্ত্রের, কিন্তু ইংলণ্ডের মিলে উৎপাদিত বস্ত্র বাংলা তথা ভারতবর্ষের বাজার দখল করে নিল। বাংলার অর্থনীতিতে তখনও কৃষির পরেই ছিল হস্তচালিত তাঁতবস্ত্রের স্থান। পাঁচজনের একটি পরিবারের স্বচ্ছন্দে গ্রাসাচ্ছাদন হতো তাঁতে সুতা কেটে এবং তৈয়ারী বস্ত্র বিক্রী করে যে উৎপাদিত বস্ত্রের বিদেশের বাজারেও সুনাম ছিল। উনিশশতকের প্রথমার্ধেই বাংলার মসলিন ও সুতিবস্ত্র উৎপাদন যন্ত্রচালিত বস্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় পরাস্ত হলো। ব্রিটিশ এদেশে পদার্পণ করার কিছু কাল পর থেকেই হস্তচালিত বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকরা শোষণ আর পাশবিক অত্যাচারের মুখোমুখি হয়ে বাঁচার লড়াইয়ের ময়দানে নামতে বাধ্য হয়েছিল। প্রায় দুইশত বছর চললো এই যুদ্ধ। মসলিন যুদ্ধের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সারা ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলার হিন্দু মুসলিম ধর্ম নির্বিশেষে তাঁত শ্রমিকদের সংগ্রাম চিরস্মরণীয় হয়ে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ঐক্যবদ্ধ বিদ্রোহ ঃ—বাংলার তন্তুবায়ীরা, গ্রামীণ কারিগররা ছিল কৃষকও। অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে ইংরাজ শাসককুল ও দেশীয় সামন্তপ্রভুদের শোষণ ও শাসকরা ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক উস্কানী দিলেও অত্যাচারিত শ্রেণী সম্প্রীতিরক্ষার ভূমিকাই গ্রহণ করেছিল। শেষাবধি ধর্ম নয় শ্রেণীর ভূমিকাই প্রধান বিবেচ্য হয়ে দাঁড়ায়। একদিকে ইংরাজ প্রভু ও তাদের মুৎসুদ্দী দালাল রাজা মহারাজা জমিদার নায়েব কুলের শ্রেণী শাসনের বিরুদ্ধে শাসিত রায়ত ও গ্রামীণ কারিগর শ্রেণী মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুই শতাব্দী ব্যাপী জীবন মরণ লড়াই চালিয়েছিল। বাংলা দেশের অত্যাচারীত তন্তুবায়ী ও রায়তদের অবস্থা ব্রিটিশযুগের শুরু থেকেই আমেরিকার ক্রীতদাসগণের থেকেও অধম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নিগ্রো রায়তদের চাষবাস করতে হতো প্রভুর জমিতে আর বাংলার

তাঁতী ও কৃষকগণ কাজ করতো নিজের তাঁতে বা জমিতে এবং 'দাদন' গ্রহণ করে তৈরী ফসল নিজ ব্যয়ে পৌঁছে দিয়ে আসতে হতো কুঠিয়ালদের 'আড়ং'য়ে। মুনাফা অর্জন করতো ইংরাজ কুঠিয়াল আর বশম্বদ জমিদার এবং কুঠির কর্মচারীগণ। নদীয়ার দুই প্রধান জমিদার যথাক্রমে শ্যামচন্দ্র পালচৌধুরী ও হাবিব উল হোসেন কর্তৃক রায়ত ও কারিগরদের বিদ্রোহ দমনে ইংরাজ কুঠিয়ালকে অর্থ ও লোকজন সরবরাহ করে সর্বতোভাবে সাহায্যদানের ঘটনা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। তিতুমীর পরিচালিত 'ওয়াহাবী বিদ্রোহ'তে দলে দলে হিন্দু মুসলমান নীলচাষী, তাঁতী ও গ্রামীণ কারিগররা যোগদান করে নীল কুঠিগুলি আক্রমণ করেছিল। খুলনা নীলকররা পরাস্ত হয়েছিল লাঠিয়াল রায়ত সর্দার সাদেক মোল্লা, গয়রাতুল্লা, গৌরজোলা (তাঁতী), খান মাসুদ জোলা (তাঁতী) ফকির মাসুদ, আফাজদ্দি প্রমুখদের কাছে। আরও দুইজন নীলবিদ্রোহী ছিলেন ইংরাজ নীলকর সাহেবদেরই দুই দেওয়ান শ্রেণী হিসাবে যাঁরা গরীব কৃষক যথা যশোহরের বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যখন ঐতিহাসিক সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সূত্রপাত হয় ঢাকা শহরের ইংরাজ কুঠির ওপর তখনও সেই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন ফকির সম্প্রদায়ের নেতা মজনু শাহ তদীয় ভ্রাতা মুশা শাহ। বিদ্রোহী সন্ন্যাসী ও মুসলমান ফকির উভয় সম্প্রদায়ের কাছে এই দুই ভ্রাতা স্বীকৃত নেতা ছিলেন। ঢাকার প্রথম তন্তুবায়ী কারিগরদের ধূমায়িত বিক্ষোভ অগ্নিতে ঘৃতাহুতি বর্ষণ করে। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সূত্রপাত হয় ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং প্রথম পর্বের সমাপ্তি ঘটে ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে যখন দেশজুড়ে চলেছে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, গণমৃত্যু। যে পটভূমিকায় ঢাকার হিন্দু ও মুসলমান হতদরিদ্র যাবা ভিটা জমিচ্যুত এবং কর্মচ্যুত হয়ে সন্ন্যাসী ফকিরে পবিণত হয়ে এক গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে এক জেলা থেকে জেলান্তরে সশস্ত্র অথবা নিরস্ত্র বিদ্রোহীর বেশে অরণ্যে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে তখনকার সেই পটভূমিকাটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

"সন্ন্যাসী বিদ্রোহের প্রথম আঘাত ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ঢাকার ইংরেজ কুঠির উপর। সেই সময় কলিকাতার পরেই ছিল ঢাকার কুঠির স্থান। ইংরেজ বণিকেরা ঢাকার কুঠিটাকে কেন্দ্র করিয়া ঢাকা শহর ও উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মসলিন বস্ত্র নির্মাণকারী কারিগরদের নিকট হইতে নামমাত্র মূল্যে মসলিন ও কেলিকো বস্ত্র সরবরাহ করিবার জন্য বলপূর্ব্বক কারিগরদিগকে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করিত। কোন কারণে সেই চুক্তি ভঙ্গ করিলে কারিগরদের উপর তাহারা অমানুষিক নির্যাতন চালাইত এবং তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া ব্যথিত করিত। কারিগরগণ বস্ত্র বয়নের পক্ষে অপরিহার্য বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কাটিয়াও সেই চুক্তি হইতে অব্যাহতি পাইত না। এই অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করিতে না পারিয়া বহু

কারিগর বনে জঙ্গলে পলায়ন করিয়াছিল (সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৬, পৃঃ ২৯)

মজনুশাহ ও মুশাশাহ ব্যতীত বিহার প্রদেশের আভান আলি এবং বাংলা প্রদেশে চেরাগ আলি এই দুই ফকির নায়ক আরও কিছুকাল ইংরাজ কোম্পানীর সৃষ্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্তজনিত জমিদারগণের অত্যাচার এবং চিরস্থায়ী দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে হিন্দু ও মুসলমানগণকে ঐক্যবদ্ধ রেখে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে পর্যন্ত বলিষ্ঠ লড়াই চালিয়েছিলেন। সোভান আলির সহকারীরূপে দুইজন ফকির নায়ক জহুরী শাহ ও মতিউল্লার নাম পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে আরও কয়েকজন ফকিরের নাম জানা যায় যাঁরা বিদ্রোহী নায়ক শোভন আলির সহকারী ছিলেন। এঁদের নাম নেয়াজু শাহ, বুদ্ধ শাহ, ইমামবাড়ী শাহ প্রভৃতি।

মজনু শাহের সঙ্গে সন্ন্যাসী নেতা ভবানী পাঠকের যোগাযোগ ছিল অত্যন্ত নিবিড়। পাঠক সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সূচনাকালে ময়মনসিংহে ও বগুড়া জেলার জঙ্গলে আত্মগোপন অবস্থায় একই সঙ্গে তাঁতী ও কৃষকদের বিদ্রোহ সংগঠিত করতেন। ভবানী পাঠকের সঙ্গে গভীর যোগাযোগ ছিল দেবীর, যিনি পূর্ববঙ্গের একজন ক্ষমতাচ্যুত ছোট জমিদার দেবী চৌধুরাণী। সম্ভবতঃ রংপুরের কোন এলাকার ছোট জমিদার ছিলেন তিনি। রংপুরের অপর এক বিদ্রোহী সন্ন্যাসী নায়কের নাম ছিল কৃপানাথ। জঙ্গলের যুদ্ধে কৃপানাথ ছিলেন অত্যন্ত পারদর্শী।

বিদ্রোহ এবং সাম্প্রদায়িক ঐক্যের সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট উদাহরণ রচিত হয় ১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা অধিক আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঐতিহাসিক 'সিপাহী বিদ্রোহ'কে কেন্দ্র করে। সিপাহীরা ছিল ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের, বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন শোষিত শ্রেণীর, হিন্দু মুসলমান ধর্মসম্প্রদায় নির্বিশেষে কৃষক, গ্রামীণ কারিগরগণের মধ্য থেকে গঠিত এক সৈন্যদল।

ইংরাজ ঐতিহাসিক জন কে (John Kaye) তাঁর প্রণীত 'History of the Sepoy War in India', vol II গ্রন্থে উল্লেখ করেছিলেন—"হিন্দু বা মুসলমানের মধ্যে এমন একজনও ছিল না যে আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নাই।"

ইংরাজ ঐতিহাসিক টমাস লো (Thomas Low) তাঁর 'সিপাহী বিদ্রোহ' সংক্রান্ত গ্রন্থে অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন এই মর্মে যে, সমস্ত রক্ষণশীল হিন্দু ও মুসলমানরা একত্রিত হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। লো আক্ষেপের কণ্ঠে বলছেন—"গোঁড়া ব্রাহ্মণ, ধর্মোন্মাদ মুসলমান,....গোহত্যাকারী ও গোপূজারী, শূকরঘৃণাকারী ও শূকরখাদক, 'লো-

ইলাহা-ইল্লল্লাহো মোহাম্মাদুর রসুল্লাহ' ঘোষণাকারী এবং ব্রহ্মের অজ্ঞেয়তাসম্বন্ধীয় মন্ত্রোচ্চারণকারী সকল মানুষ একত্রিত হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল।''

দুই শতাব্দীব্যাপী বাংলা ও সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজশাসককুলের ও দেশীয় সামন্তপ্রভুদের বিরুদ্ধে একের পর এক বিদ্রোহের আবর্ত ও ঘূর্ণী ঝড় বারে বারে আছড়ে পড়েছিল। তার মধ্যে সর্বাধিক উচ্চ মাপের গুণ ছিল সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদহীন ঐক্য। ছিল বিদ্রোহীদের ঐক্যবদ্ধ অভিযান। বিদ্রোহীদের মধ্যে দেশকাল জাতিগত ভেদাভেদও ছিল না। ছিল পরমত সহিষ্ণুতা।

তন্তুবায়ীগণের নীলচাষীতে রূপান্তর ঃ— ইংরাজী ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দশক, যখন বাংলায় 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'র কল্যানে জমিদার শ্রেণী পাকাপোক্ত হয়ে গ্রাম শাসনে বসেছে। তখনই বাংলার সুপ্রাচীন হস্তচালিত তাঁতশিল্প প্রায় ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে গেছে। কিছু অবশিষ্ট নিশ্চয়ই ছিল যারা মসলিন নয়, প্রথমে গুটি পোকার চাষ এবং কাটা সিল্ক তৈয়ারী কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। কাঁচা সিল্ক-এর বহির্বাণিজ্য ইংলণ্ডের বাজারে রপ্তানী প্রক্রিয়া শিল্পবিপ্লবের পর থেকেই প্রায় বন্ধ হতে হতে হতে শেষ হয়ে যায়। তন্তুবায়ীরা সূক্ষ্ম কার্পাসতুলাজাত মসলিনের পরিবর্তে আভ্যন্তরীন চাহিদা আছে এমন বস্ত্রাদি যেমন ধুতি, শাড়ি, চাদর, গামছা, লুঙ্গী, ইত্যাদি প্রস্তুতে আত্মনিয়োগ করলো। যেহেতু ঐ সব বস্ত্রাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় তালিকায় পড়ে তাই তাঁতীরা একেবারে কর্মহীন হয়ে পড়েছে এমন ঘটনা কিন্তু ঘটলো না। অর্থনীতির হাল বেহাল হলেও বেঁচে থাকার মতো কিছু উপার্জন তাদের হতেই থাকে।

ইতিহাসবিদ ডঃ রমেশ চন্দ্র দত্ত এবং আরও অন্যান্য ইতিহাসবিদগণ উল্লেখ করেছেন যে, বাংলার হাজার বছরের প্রাচীন জগদ্বিখ্যাত শিল্পটির মর্যাদা ধুলায় লুণ্ঠিত হলে বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামোটা ভেঙ্গে পড়ে। একই সময় জমিদার আর তাদের অধঃস্তন অনুগৃহীতদের দাপটে আর দুর্ভিক্ষের প্রকোপে বহু মানুষ দেশত্যাগ করে বনে জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। কৃষির পরই বাংলার অর্থনীতির হাল ধরতো যে তাঁতশিল্প, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে বাংলার অন্ততঃ ৬০,০০,০০০ জন তন্তুবায়ী কর্মহীন হয়ে কৃষিকার্য্যে প্রবেশ করে! কর্মহীনদের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য অংশ হলো মহিলা তাঁত শিল্পী। এদের সংখ্যাটা হবে প্রায় বিশ বাইশ লক্ষ (সূত্র ঃ— ডঃ দেবেন্দ্র বিজয় মিত্র প্রণীত 'কটন উইভার্স ইন বেঙ্গল' এবং ডঃ এইচ. আর. ঘোষাল)

বাংলার রপ্তানী দ্রব্য একমাত্র ছিল সুতীবস্ত্র ও মসলিন। সেই রপ্তানী বাণিজ্য কোন বাংলাদেশের অর্থনীতির মৌলিক কাঠামো বাংলার সেই অর্থনৈতিক কাঠামোটা চিরতরে

ভূলুণ্ঠিত। এই কাজে এমনিতেই পটু তাঁতীরা এই সময়ে আবার তাদের কাজ পাওয়া আরম্ভ হলো। এই দরিদ্র মহিলারা কার্পেট বুনতেও জানতো, শাল তৈরি করতে জানতো। এগুলো রপ্তানী হতো, কিছু বহির্বাণিজ্য হতো ফলে বিদেশ থেকে কিছু বৈদেশিক মুদ্রার আগমন ঘটতো। কিন্তু পৃথিবীর যে কোন দেশে ইংলণ্ড তাদের পণ্যসামগ্রী নিয়ে অবাধ বাণিজ্য করার অধিকার প্রয়োগ করার পর থেকে চিকনের কাজ বা এমব্রয়ডারীর কাজও শ্লথগতি হয়ে পড়ে। বিশেষতঃ সুতা কাটুনি বা স্পিনাররা একেবারে বেকার হয়ে পড়ে তাদের সংসার চালানো দায় হয়ে পড়ে। শিল্প শ্রমিকরা দলে দলে কৃষিকার্য্যে প্রবেশ করলে কৃষিতেও চাপ বৃদ্ধি পায়। একমাত্র নীলচাষীতে রূপান্তরিত হতে পারলে মনে হত বেশ কিছু বাড়তি উপার্জন হতে পারে। তাই কর্মচ্যুত হস্তচালিত তাঁত শিল্পীদের একটা বৃহদাংশ ইংরাজ কোম্পানীগুলির কাছ হতে 'দাদন' বা 'অগ্রিম' গ্রহণ করতে বাধ্য হয় এবং নীলচাষ করতে সম্মত হয়। তাঁতীরা এভাবেই নীল চাষীতে পরিণত হলো। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে এইবছরেই কলকাতা থেকে ইংলণ্ডে চল্লিশ হাজার মন নীল (indigo) রপ্তানী হয়েছিল। প্রবাদ বাক্য 'খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে, কাল হলো এঁড়ে গরু কিনে' জানি না কবে কখন কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রবাদ রচিত হয়েছিল। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ করে বাংলার তাঁত শিল্পীরা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিল। পিতৃপুরুষের 'জাত ব্যবসা' পরিত্যাগ করে (অথবা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়ে) নীলচাষী বনতে গিয়ে নীলবর্ণ চাষীতে রূপান্তরিত হলো। তাঁতী নীলের চাষে দক্ষতা প্রমাণ করতে সর্বস্ব পুঁজি বিনিয়োগ করলো, তখন যেহেতু বিদেশে নীল রপ্তানীর যুগ। ইংলণ্ড দেশের শিল্পবিপ্লবের ফসল মিলে উৎপন্নবস্ত্র শিল্প রঙে রঞ্জিত করতে নীল বা ইণ্ডিগোর ব্যবহার যে অপরিহার্য। কিন্তু নীল বা তুঁত চাষ তো ইংলণ্ডে হয় না। অতএব পরাধীন দেশের অসহায় মানুষগুলোর মাথার ঘাম আর চোখের জলে উৎপন্ন রঞ্জক দ্রব্য তো আছেই। এই হলো উন্নত পাশ্চাত্য সভ্যতা। হায়, এক দেশের দরিদ্র বুভুক্ষু পীড়িত মানুষগুলোকে বস্ত্রহীন অন্নহীন নিদ্রাহীন মুমূর্ষু করে ফেলে নিজ দেশের শ্রীবৃদ্ধি, নিজ দেশবাসীর আরও অন্ন, আরও বস্ত্র, আরও ভোগসুখ বিনিময় করে নেওয়ার কাজকে গৌরবজনক বলে মনে করতো। এই সভ্যতার শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি যে সব ইতিবাচক দিক তা হতভাগ্য তাঁতীরা নিজেদেরও জানা প্রয়োজন বলে মনে করতো না।

নীলকরদের অত্যাচারে প্রাক্তন তাঁতশিল্পী যে নব আবরণের নীলচাষী অবশেষে সে দাদনের চাপে ক্রীতদাসে পরিণত হলো, ঊনবিংশ শতাব্দীর মানুষগুলো নিক্ষিপ্ত হলো ইতিহাসের মধ্যযুগে। তাঁত শিল্পী তথা নীলচাষী তার হাল বেচতে বাধ্য হলো। শেষে

হেলে বেচলো। জমি বেচলো। অবস্থা এমন হলো এসব কেনবার লোক কোথায়? অবশেষে প্রাণের দায়ে স্ত্রী কন্যা পুত্র বিনামূল্যে অথবা স্বল্প মূল্যে বেচে বনেজঙ্গলে পালিয়ে গেল অথবা কাজের সন্ধানে নতুন কোন জীবিকায় নতুন কোন স্থানে আশ্রয় নিল। একেবারে সর্বহারাশ্রেণীর দলে ভীড়ে পড়লো, গঠিত হলো বাংলার বুকে এব বিশাল সর্বহারা শ্রেণী। ১৮৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার বুকে যখন নীলচাষীদের একের পর এক বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ কুঠিয়ালদের 'আড়ং' গুলোয় ছড়িয়ে পড়ে, ক্রমে অগ্নিকাণ্ডে রূপান্তরিত হয় তখন এই প্রাক্তন তাঁতশিল্পী বা তাঁত শ্রমিকরা দলে দলে বিদ্রোহে যোগ দিয়ে স্ফুলিঙ্গ থেকে দাবানলে পরিণত হয়।

চিন্তায় ভাবনায় পশ্চাদপদ প্রাক্তন তাঁতশিল্পীরা বিদ্রোহের আগুনে যখন ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন তারা মরীয়া। ভাবখানা এই যে, 'মবতে তো হবেই, তো লড়াই করে মরি'। সংসার যাত্রা নির্বাহের জন্য যৎসামান্য মজুরীর আশায় যাদের ভোগ বিলাস আর মুনাফা যোগানের জন্য শ্রমের বিশাল ভাণ্ডার উজাড় কবে দিয়েছিল, ভোগবিলাসীদের জন্য বিস্ময়কর শিল্পনৈপুণ্য ব্যবহৃত হলো, দেশবিদেশের বাজাবে ধনীর পোষাক পরিচ্ছদরূপে রপ্তানী হলো তাদের শ্রমশক্তি যখন একেবারে নিঃশেষ, তখনই তাদের প্রয়োজনও ফুরালো। 'একেই কি বলে সভ্যতা'? হতভাগ্য প্রাক্তন তাঁত শ্রমিক বা নীল চাষীদের ওপব ধারাবাহিক অত্যাচার আর প্রতিরোধ সংগ্রামের কাহিনী নিয়ে রচিত ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ জুড়ে 'নীলদর্পণ' নাটক সমগ্র বঙ্গভূমির একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে এক জেলা থেকে অন্য জেলায় মঞ্চস্থ হতে থাকলো। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় জুটি ইংরাজ শাসকদের চক্ষুশূলে পরিণত হলেন। তাঁতশ্রমিকদের হাসি আর কান্না ঘাম-রক্তের অপর নাম 'মসলিন'।

'মসলিন' শব্দের উৎপত্তি কোন্ যুগে বা কোন্ ভাষা থেকে এল কিভাবে তা গবেষকদের জন্যই ছেড়ে দেওয়া যাক। তবে তুর্ক-আফগান যুগেও মসলিন বস্ত্র বাংলার গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে চীনে বপ্তানী হতো। এবজন্য ভারত-চীন সিল্ক-রুট নির্দিষ্ট ছিল, যার অস্তিত্ব এখনও খুঁজে পাওয়া যায়। তবে সিল্কবস্ত্র এবং মসলিন মোগল আমলেই সুবর্ণ-যুগে উন্নীত হয়েছিল। সুবর্ণযুগের ইতিহাস গড়তেও তাঁতশ্রমিকরা অনেক কান্না-ঘাম-রক্ত ঝরিয়েছিল। তবে ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে চিরকালই তারা বঞ্চিত। সমাজের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস সৃষ্টিকর্তা যে শ্রমিকশ্রেণী যুগ-যুগান্ত ধরে তারাই অবহেলিত, পৃথিবীর যে কোন পুঁজিবাদী-সামন্তবাদী দেশ তাদের সংগ্রামের সংগঠকরা এভাবেই থেকে যায় অপরিচিতি, অজ্ঞাত।

অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দী অর্থাৎ আরও একশত বৎসর শেষ করলো তখনও তারা অর্থনৈতিক দিক থেকে আরও লাভবান হয়েছে, না অর্থনৈতিক অবনমন ঘটেছে, এইরূপ প্রশ্ন আমাদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। বর্তমানকালের ন্যায় সে যুগে তাঁতশ্রমিকরা কোন প্রভিডেন্ট ফাণ্ড চায়নি, কারণ সে প্রশ্নও ওঠে না সেরকম কোন আইনই ছিল না। তারা চেয়েছিল বাঁচার মতো প্রাপ্য মজুরী। দীর্ঘ পরিশ্রমের ফলে প্রস্তুত বস্ত্রের ন্যায্য মূল্য যদি কুঠিয়াল মহাজনের কাছে পাওয়া যায়। দেশীয় কুঠিয়াল মহাজনরা কখনও তাঁতশ্রমিকদের আবেদনে কর্ণপাত করেনি। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে প্রচুর শ্রমশক্তি আর শিল্প নৈপুণ্যের ফসল হিসাবে তাঁতশ্রমিকরা পেয়েছে কেবল সুতার দাম; মজুরী চাওয়া ছিল অপরাধের সামিল। আর ওই অপরাধের জন্য শাস্তি ছিল বিচুটি গাছের ডাল দিয়ে প্রস্তুত বেত্রাঘাত। দুর্ভিক্ষ প্রতিবছরই হতো এবং দরিদ্রশ্রেণীর লোকেরা দলে দলে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়তো এই কারণে যে সাধারণ মানুষ দিনের পর দিন নিরন্ন থাকতো, তাদের ক্রয়ক্ষমতা বলতে কিছুই ছিল না, রোগ মহামারী হলে ওষুধও মিলতো না, অধিকাংশই নিরক্ষর হওয়ার সুবিধা ভোগ করতো কুঠিয়াল, জমিদাররা।

দুইশতবর্ষব্যাপী অবিরাম শ্রেণী সংগ্রামে জড়িত হয়ে পড়ায় এবং ইংরাজ সরকারই শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হওয়ায় গ্রামীণ কারিগর এবং রায়ত বা কৃষকদের মধ্যে দেখা দেয় গভীর হতাশার ছাপ। পরাজিতরা হলো 'গোলাম' আর বিজয়ীরা হলো 'রাজাব জাত'। দেশের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন 'ভারতের জাতীয় কংগ্রেস' স্বাধীনতার প্রাক্কালে গ্রামীণ কারিগরদের স্বার্থরক্ষা কল্পে যে ইতিবাচক ভূমিকা নেবে ঘোষণা করেছিল ঐ সংগঠনের কাজকর্মে তা ধুলিসাৎ হয়ে গেছে। তাঁতীরা যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই রয়ে গেল।

❑ তন্তুবায়ীদের সপক্ষে ছিলেন মহারাজ নন্দকুমার ❑

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। বাংলার মসনদে তখন নাম-কাওস্তে নবাব মীরকাশিম, ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীই আসল শাসনকর্তা। ওয়ারেন হেস্টিংস ভাবতের গভর্নর জেনারেল। পূর্বসুরী ক্লাইভের আমলে বাংলার তন্তুবায়ীরা ইংরাজ কুঠিয়ালদের আক্রমণে জেরবার, রক্তাক্ত, বিধ্বস্ত। মহারাজ নন্দকুমার হুগলীর দেওয়ান থেকে ফৌজদারের দায়িত্বে। নন্দকুমার তন্তুবায়ীদের পক্ষে, দেশীয় ব্যবসায়ীদের পক্ষাবলম্বন করে ইংরাজদের রোষানলে পড়েছেন। 'মহারাজ' উপাধি পেয়েছিলেন, ব্যবহার করতে দেননি ওয়ারেন হেস্টিংস। বাদশাহের কাছ হতে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ নন্দকুমারের জন্য যাবতীয়

বহুমূল্য উপহার 'উপাধি'র সঙ্গে পাটনায় পৌছালে ওয়ারেন হেস্টিংস সে সমস্ত কিছু নিজের ভোগদখলের জন্য আটক করেন।

হেস্টিংসের এহেন আচরণের পিছনে কারণ ছিল নন্দকুমার পলাশীর যুদ্ধে ইংরাজ বাহিনীর সরাসরি বিরোধিতায় নেমেছিলেন। তাছাড়া হেস্টিংস নাটোরেব রাণী ভবানীর একটি পরগণা রাণীর কাছ হতে কেড়ে নিয়ে নিজের বশম্বদ এক জো হুজুরের হস্তে অর্পণ করলে সেই বেআইনী কার্যেরও নন্দকুমার তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। এছাড়া ১১৭৬ বঙ্গাব্দে (১৭৭০ খ্রীঃ) যে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হয় বাংলা ও বিহারে, যে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'-এর কবলে প্রায় দেড় কোটি মানুষের মৃত্যু ঘটে সেই সময় বাংলার দেওয়ান সুবেদার মহম্মদ রেজা খাঁ যেভাবে অমানবিক কায়দায় অত্যাচার চালিয়ে ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তহবিলের জন্য অতিরিক্ত বাজস্ব আদায় করতেন তারও তীব্র প্রতিবাদ করেন নন্দকুমার। মন্বন্তরের পরবর্তীকালে রেজা খাঁ পদচ্যুত হয় যেহেতু তাকে ব্যবহার করার উদ্দেশ্য ইংরাজ কোম্পানী সফল হয়েছিল। যখন রেজা খাঁর প্রয়োজনের সমাপ্তি ঘটলো তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হলো। কায়দা করে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির যাবতীয় দায় হেস্টিংস রেজা খঁয়ের স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়ে স্বয়ং সাধু সেজে বসলো। নন্দকুমার ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মার্চ তারিখে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

হেস্টিংসের হুকুমে তখন বাংলার তাঁতীদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কাটার অভিযান চলেছে। সেই তাঁতীদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কাটা হতো যারা ব্রিটিশ কোম্পানীর কাছ হতে 'অ্যাডভান্স' বা 'দাদন' গ্রহণ করেও মসলিন বা সিল্ক বস্ত্র তাদের সরবরাহ করার পরিবর্তে অন্য ইউরোপীয় কোম্পানীগুলোর বণিকদের কাছে বিক্রি করে দিত। দেশীয় বণিকদের কাছে অথবা 'প্রাইভেট টেডার্স' যারা ইংবাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্থায়ী কর্মচারী তাদের কাছেও উৎপন্ন বহুমূল্য বস্ত্রসম্ভার বিক্রীর জন্য প্রেরণ করতো। এটা অবাধ্য বেয়াদপ তাঁতীদের প্রাপ্য শাস্তি। একাজ শুরু হয়েছিল ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই মার্চ থেকে। অন্যদিকে বহু তাঁতী নিজেরা নিজেরাই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কেটে বাদ দিত যাতে ইংরাজদের কাছ হতে 'অ্যাডভান্স' বা 'দাদন' গ্রহণ করতে কুঠিয়াল বাধ্য করতে না পারে। অনেকেই বয়নকার্য থেকে চিরতরে বিদায় নেওয়ার জন্য এইরূপ আত্মহননের পথ বাধ্য হয়েই বেছে নিয়েছিল। নন্দকুমার প্রেরিত অভিযোগ অনুসারে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ইংলণ্ডের ভারত বন্ধু, বিখ্যাত বাগ্মী, এবং পার্লামেণ্টরীয়ান এডমণ্ড বার্ক ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে, ওয়ারেন হেস্টিংসের 'ইমপিচমেণ্ট' চলাকালীন যে বিখ্যাত বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার মধ্য দিয়েই বাংলার তাঁতশিল্পীদের ওপর কিরূপ অসভ্যতা, বর্ব্বরতা, প্রতিহিংসাগ্রহণ, কারাদণ্ড, মৃত্যু ঘটানোর

মত ঘটনাবলীর বিশদ চিত্র জানা যায়। অবাধ্য, বেআদপ, নিরক্ষর তাঁতীদের 'আড়ং' বা কুঠিতে জোর করে ধরে এনে উলঙ্গ অবস্থায় প্রচণ্ড শীতের মধ্যে জলে ডুবিয়ে রাখা হতো। এতে সে ব্যক্তি অজ্ঞান হয়ে দীর্ঘক্ষণ জলে পড়ে থাকতো। অবাধ্য তাঁতীকে বেত্রাঘাত করা হতো আছোলা বাঁশের বেতের সাহায্যে অথবা বিচুটি গাছের ডাল অথবা অন্যকোন লাঠির আঘাতে তাকে অর্ধমৃত করে রাস্তায় কোন গাছের ডালে পা দুটো বেঁধে মাথাটা নীচে দিকে ঝুলিয়ে রাখা হতো যতক্ষণ না তাঁতী জ্ঞান হারায় বা মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে। মহারাজ নন্দকুমার দরিদ্র তাঁতীশিল্পীদের সংগ্রামের পাশে এসে দাঁড়ান। তাঁতীরা নন্দকুমারকে অত্যন্ত বেশি রকম বিশ্বাস করতো তার কারণ নন্দকুমার তাঁতীদের সঙ্গে কখনও বন্ধুত্ব ছাড়া শত্রুতা করেন নি। তিনি ছিলেন বাংলার তন্তুবায়ীদের আপনজন রাজা-মহারাজা এরকম সুহৃদ তাঁতীরা কখনও লাভ করেনি।

ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেশীয় অনুচররা, কুঠিয়ালরা নন্দকুমারের বিরুদ্ধে অবাধ্য তাঁতিদের ক্ষ্যাপানোর অভিযোগ দায়ের করলে ইংরাজরা মুর্শিদাবাদ রাজদরবার থেকে নন্দকুমারের বহিষ্কার দাবী করে। একসময় নন্দকুমার ইংরাজ কোম্পানী কর্তৃক স্বগৃহে অন্তরীণ থাকেন। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে হেস্টিংস নন্দকুমারের বিরুদ্ধে পাল্টা জালিয়াতির মামলায় ফাঁসিয়ে দিয়ে কলকাতা মেয়র-কোর্টের প্রধান বিচারপতি ইলাইজা ইম্পেকে ব্যবহার করে তাঁকে দিয়েই ফাঁসির আদেশ বার করেছিলেন। বিচারের এক মহতী প্রহসনও চলেছিল কয়েকটা দিন। তার যে মুহূর্তে প্রাণদণ্ডের আদেশ হলো তা কার্যকরী করার জন্য বন্দী নন্দকুমারকে ভিক্টোরিয়া যে মোরিয়ালের অন্ধকার কারাগার থেকে বার করে আনা হয়। নন্দকুমার জেলে আবদ্ধ থাকাকালীন বন্দীর প্রাপ্যদাবী আদায়ের জন্য অনশন ধর্মঘটও করেছিলেন। জেলে দাবী আদায়ের জন্য অনশন ধর্মঘটের তিনিই প্রথম পথিকৃৎ। অতঃপর তাঁকে খিদিরপুরের তেমাথায় বিশেষভাবে নির্মিত ফাঁসীর মঞ্চে দাঁড় করিয়ে কিয়দক্ষণের মধ্যেই ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়।

কলকাতার তৎকালীন শেরিফ মেক্রেবী নন্দকুমারকে ফাঁসীর মঞ্চে তুলে দেন। তিনি পরবর্তীকালে স্মৃতিচারণকালে বলেছিলেন যে, মৃত্যুভয়ে নন্দকুমার ভীত হন নি। নন্দকুমারের মুখমণ্ডল ঐ সময় ছিল প্রশান্তিতে ভরা, সৌম্যদর্শন এক অকুতোসাহসী মহামানব।

নন্দকুমার ছিলেন সামন্তশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত প্রবল উপনিবেশবাদ বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন এক শাসক। বাংলার তৎকালীন ইতিহাসে অপর একজন নন্দকুমারের সন্ধান পাওয়া একেবারেই অসম্ভব ছিল। মাথা নীচু না করে

স্বদেশবাসীর, স্বদেশের দরিদ্রতম অংশ হতভাগ্য তাঁতশিল্পীদের পক্ষাবলম্বন দেখানোর মত সাহস বিরল ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে রাজপুরুষ নন্দকুমার ছিলেন একেবারেই নজীরবিহীন। (সূত্রঃ 'গণশক্তি' ৫ই আগষ্ট, ১৯৯৮, 'শহীদস্মরণ')।

❑ স্বাধীন ভারতে ❑

ব্রিটিশ রাজশক্তি ভারতের বুকে জগদ্দল পাথরের ন্যায় যতকাল চেপে বসেছিল ঠিক ততবছর ভারতবর্ষের কোথাও না কোথাও দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। সর্বশেষ বাংলা ও বিহার প্রদেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল ১৯৪৩ খ্রীঃ থেকে ১৯৪৬
যাকে ইতিপূর্বে 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' (বাংলা সন ১৩৫০ সাল থেকে ঐ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয়) বলা হয়েছে। এই দুর্ভিক্ষ কি কারণে বিস্তার ঘটেছিল তা ডঃ অমর্ত্য সেন যে ব্যাখ্যা দেন তাঁর নোবেলে পুরস্কার প্রাপ্তির পরই তা সংবাদ সংস্থা পি. টি. আই ১৬ই অক্টোবর, '৯৮ দেশব্যাপী প্রচার করে। খাদ্যাভাবই দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির একমাত্র কারণ নয়। সমাজের অফুরন্ত সম্পদের অসম বন্টন এবং মুষ্টিমেয়র হাতে সম্পদের কেন্দ্রীকরণ, সাধারণ মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, সুস্বাস্থ্য, চাষ যোগ্য জমির অভাব পঞ্চাশ সালের দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির জন্য রাষ্ট্রের অর্থনীতি পুঁজিবাদকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ঘটাতে সাহায্য করার যদি নীতি হয় তবে মৃত্যু হাজারে হাজারে নয়, লাখে লাখে, কোটিরও সীমা অতিক্রম করবে সেই রাষ্ট্রে। পুঁজিবাদ সামন্তবাদের হাত ধরে ভারতের বুকে শোষণ আর অত্যাচার চালানোর অবাধ স্বাধীনতা দেওযা হয়েছিল ব্রিটিশ রাজশক্তিকে। পুঁজিবাদ ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর গলার টুঁটি চেপে ধরে তাদের কাছ থেকে সমস্ত শ্রমশক্তি নিঙড়ে নিয়ে বিকশিত হয়েছিল।

স্বাধীন ভারতের বুকে যে সরকার কেন্দ্রের শাসন ক্ষমতায় এলো তা হলো সেই 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' দলের সরকার যে দল তার জন্মলগ্নের অধিবেশনে ইংলণ্ডেশ্বরী প্রশস্তি বাক্য উচ্চারণ করে বলেছিল- 'তাঁর জুতার ফিতা খোলার যোগ্যও আমরা নই'। পাকিস্থান মুসলিম লীগ আর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস আর তাদের মুরুব্বী ব্রিটিশ রাজশক্তির যৌথ ষড়যন্ত্রের ফসল দেশ বিভাগ। বাংলাও দ্বিধা বিভক্ত হলো। একই ভাষা, একই সংস্কৃতি, একই পোষাক, একই খাদ্যাভ্যাস তবু একে অপরের কাছে বিদেশীতে

পরিণত হলো। যে বিপুল সংখ্যায় তন্তুবায় কারিগর আশায় বুক বেঁধেছিল যে দেশ স্বাধীন হলে জাতীয় নেতাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি মতো তাঁতশিল্পের উন্নতি ঘটবে, গ্রামীণ কারিগররা আবার সুদিনের সন্ধান পাবে, অন্নাভাব, নিয়ত দুর্ভিক্ষের অবসান ঘটবে, তাদের উৎপন্ন বস্ত্রের ন্যায্যমূল্য পাবে, মহাজন শ্রেণীর দাপট শূন্যে মিলিয়ে যাবে, তাঁতী স্বনির্ভর হতে পারবে তাদের এইসব আশা দুরাশায় পরিণত হতে খুব বেশি বিলম্ব হয় নি।

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে জানুয়ারী ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা 'প্রজাতন্ত্র' রূপে ঘোষিত হলো। ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকাকে সেলাম জানিয়েছিল যে কোটি কোটি ভারতবাসী তাদের মধ্যে গ্রামীণ কারিগররাও ছিল। তাঁতীরা ভেবেছিল মাত্র তিনবছরের শিশুসরকার। একে আরও সময় দেওয়া উচিত। কিন্তু কি ঘটলো দেশবাসীর ভাগ্যে? জমিদারদের জমি বিনা ক্ষতি পূরণে বাজেয়াপ্ত এবং ভূমিহীন কৃষকদের হাতে বিনামূল্যে জমি বিতরণেব দাবীতে গ্রামীণ কারিগরগণ যথা তাঁতী, কামার, কুমার, ছুতার এদের স্বনির্ভর করে তোলার দাবীতে, উদ্বাস্ত স্রোত বন্ধ করা এবং পূর্ববঙ্গ থেকে আগত দেশবাসীদের যথাসাধ্য রিলিফ এবং পুনর্বাসনের দাবী একমাত্র রাজনৈতিক দল ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি উত্থাপন করলো যারা শ্রমিকশ্রেণীর রক্তপতাকা উড্ডীন কবলো সেই দলটাই বেআইনী ঘোষিত হলো।

❑ দুর্ভিক্ষ, ১৯৫১ ❑

প্রজাতন্ত্র ঘোষণার পর ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম বাংলার বুকে আবার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। রাষ্ট্রনায়করা অস্বীকার করলেন দুর্ভিক্ষে মৃত্যুসংবাদ। যারা ওপার বাংলা থেকে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে তাদের মধ্যে ছিল সেই সব কারিগর যারা ঢাকা, রংপুর মৈমনসিংহ, যশোহর, বগুড়া প্রভৃতি জেলাগুলিতে তখনও উত্তম গুণসম্পন্ন মসলিন বস্ত্র প্রস্তুত করতো। সেই সব হস্তচালিত তাঁত শিল্পীরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিহত আত্মীয় পরিজনকে ফেলে রেখে প্রাণ হাতে নিয়ে আশ্রয়েব আশায় শরণার্থী শিবিরে উদাসনয়নে দিনযাপন করতে শুরু করলো। কুশলী দক্ষ গ্রামীণ কারিগররা স্বাধীন দেশের সরকারের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরাকাষ্ঠার পরিচয় পেল পুলিশের লাঠির ঘা যখন পড়তে থাকে তাদের পিঠে, রাইফেল থেকে গুলি বেরিয়ে তাঁত শ্রমিক পরিবারের বুক যখন ঝাঁঝরা করে দেয়। স্ত্রীর সামনে স্বামীকে টেনে হিঁচড়ে, পুত্র কন্যার আকুল প্রতিরোধের বেড়া ভেঙ্গে সমস্ত প্রতিরোধ চুরমার করে সমর্থ পুরুষটিকে পিটতে পিটতে যখন কারাগারে নিক্ষেপ করে। তখন 'ধিক্, এ স্বাধীনতা' কণ্ঠে ধ্বনিত হয়।

পশ্চিমবাংলার বুকে ঐ সময় কি ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রতিবেদনটি

'গণশক্তি' পত্রিকার ১৫-১১-৯৮ তারিখে 'অতীতের পৃষ্ঠায়' প্রকাশিত হয়েছিল।

"সুন্দরবন অঞ্চলে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ ও গ্রামে গ্রামে অনাহারে মৃত্যু শুরু হয়। শাক ঘাসের বীজ খেয়ে তিলে তিলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। গত ২ মাসে ক্যানিং, সন্দেশখালি থানায় প্রায় ২৮ জন মারা যান। সুন্দরবনের প্রতি লটে ১ থেকে ৫ হাজার জনের মৃত্যু ঘটেছে। ক্যানিং থানার কালিকা থানা ইউনিয়নের বারবনি গ্রামের নুর নেইয়া, নোয়ানি শেখ, কেওড়াতলা গ্রামের ৭ জন সর্দার, চাষীর ছেলে মেয়ে দেউলি ইউনিয়নে গাঁইতি গ্রামের কংগ্রেসী জেলে আবদ্ধ। তিতু কর্মকারের ছেলে ও মেয়ে, বাস্তহারা নটবর সর্দার, ভাগচাষী দুর্গাচরণ সর্দার অনাহারে মারা গেছেন। ১৫ই নভেম্বর, ১৯৫১, ২৪ পরগনা কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষে হেমন্ত ঘোষাল এবং কৃষক সংগঠনের পক্ষে প্রভাস রায় এক বিবৃতিতে বলেন—"কংগ্রেস ব্রিটিশ আই. এ. এস. দের কায়দায় ফতোয়া দিতেছেন সুন্দরবনে কেউ না খেয়ে মরেনি। আমরা কংগ্রেস মন্ত্রীসভাকে চ্যালেঞ্জ করছি তাদের যদি সৎসাহস থাকে সুন্দরবনের বুভুক্ষ মানুষদের কাছে গিয়ে বলুন। এই সব ঘটনা মিথ্যা তাঁরা কংগ্রেস সরকারের সৃষ্টি দুর্ভিক্ষনীতিকে পরাস্ত করার আহ্বান জানান।

কাশিপুর উদ্বাস্তুশিবিরে ১৯৫১ সালের ১২ই থেকে ১৫ই নভেম্বর চার দিনে ৯০ টি শিশুর শ্বাসকষ্টে মৃত্যু ঘটে। মৃত শিশুদের মাছের গাদার মতো ফেলে রাখা হয় এবং গভীর রাত্রে হিন্দু সৎকার সমিতির গাড়ি (WBK 138)'তে গোপনে সৎকার করা হয়। উদ্বাস্তুদের প্রতি কংগ্রেস সরকারের নিষ্ঠুর ও মানবতাহীন ব্যবহারের বলি এরা। ঐ ক্যাম্পে ১৫ দিনের মধ্যে মোট একশ চল্লিশটি শিশু ও ৭৮ জন বাস্তহারার মৃত্যু ঘটে। পশ্চিমবঙ্গে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সম্পাদিকা শ্রীযুক্ত শোভা নুই, ও শিশুকল্যাণ সমিতির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা মঞ্জুশ্রী দেবী ও ইণ্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সহকারী সম্পাদক ডাঃ এ কে পাল এক বিবৃতিতে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবী জানান।"

শিলিগুড়ি সংবাদ ঃ— "১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে শিলিগুড়ি শহরে ভয়ঙ্কর খাদ্যাভাব সৃষ্টি হলে গরীব মানুষদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়, বেশ কিছু মানুষের অনাহারে মৃত্যু হয়। শহরে কোন রেশন ব্যবস্থা ছিল না।" অথচ ইংরাজদের একটি প্রতিষ্ঠান ষ্টীল ব্রাদার্সের শিলিগুড়ি বাজার থেকে খাদ্যশস্য ক্রয় এবং অবাধ রপ্তানিব একচেটিয়া অধিকার বজায় ছিল। এসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ৩রা ফেব্রুয়ারী শিলিগুড়ি শহরে এক বিশাল দুর্ভিক্ষ-বিরোধী সভায় গণতন্ত্র ধর্ষণের ঘটনা ব্যাখ্যা করা হয়।

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই কংগ্রেস সরকার বেআইনী ঘোষণা করে মজুর-কৃষকদের রাজনৈতিক সংগঠন ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির যাবতীয়

কার্যকলাপ। কারণ তখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে একমাত্র কমিউনিষ্টরাই জমিদারী প্রথা বিনা ক্ষতি পূরণে বাজেয়াপ্তকরণ ও সেই সমস্ত জমি যা সরকারের খাসে বর্তেছে তা বিনামূল্যে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে বন্টনেব দাবীতে কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলেছে। ভাগচাষীদের জমির ফসলের তিনভাগের দুভাগ দাবী করেছে। ক্ষেতমজুরদের বাঁচার মতো মজুরীর দাবী করেছে। এক কথায় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান মর্মবস্তু ভূমিবিপ্লবের ডাক দিয়েছিল। এতে আতঙ্কিত জমিদার-মহাজন শ্রেণী নিজেদের শ্রেণীর সরকারের ওপর চাপ দিয়ে কমিউনিষ্টদের কার্যকলাপ আইনতঃ নিষিদ্ধ ঘোষণার জন্য সরকারী ফতোয়া আদায় করে নিয়েছে। মৌলিক ভূমিসংস্কারের প্রতিশ্রুতি জাতীয় নেতারা স্বাধীনতা প্রাপ্তির বহু পূর্ব্বে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর তারা বেমালুম তা বিস্মৃত হলেন। গ্রামীন কারিগরদের স্বার্থ সুরক্ষিত করার প্রতিশ্রুতি, দেশভাগ জনিত পূর্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি পূরণে ঠিক একই ভাবে স্বাধীন দেশের সরকার ব্যর্থ হলো। যখন দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হলো তখন 'গোদের ওপর বিষ ফোড়া'র মতন সামাল দেওয়ার কোন ক্ষমতাই কংগ্রেস সরকারের ছিল না। রাজনৈতিক অনিচ্ছার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটলো। মানুষ আবার পূর্ববর্তীকালের 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' এর অবিকল প্রতিরূপ স্বাধীন দেশের মাটিতে প্রত্যক্ষ করতে থাকে। আবার সেই কাতর আবেদন-মধ্যবিত্ত ধনীর দ্বারে দ্বারে 'এক বাটি ফ্যান দাও মা' শিশু পুত্র, কন্যা, স্ত্রীর হাত ধরে বৃদ্ধের আবেদন। স্বচ্ছলপরিবার ওদের দেখে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। ওরা তাঁত শিল্পী পরিবার। বাস্তুভিটা আর ঠকঠকি ফেলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মৃত্যুভয়ে ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় শরণার্থী শিবিরের মানুষ। সেখানেও গুলি চলেছে। লাঠি চলেছে। তাই পরিবারের সন্তান সন্ততি আর রুগ্ন স্ত্রীর হাত ধরে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন। একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের বন্ধ বহির্দ্বারের বাইরে ওরা এক বাটি ফ্যানের জন্য হা পিত্যেস নয়নে দাঁড়িয়ে আছে। ঘটনাটি কোন একটি সংবাদ পত্রে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। অনেকক্ষণ পরিবারটি এসেছে গৃহস্থের দ্বারে। গৃহিনী বিরক্তি মাখানো মুখে দ্বার উন্মোচন করলেন হাতে তাঁর এক বাটি সত্যই ভাতের ফ্যান। বৃদ্ধ এবং অন্যান্য সকলেই নিজের নিজের বাটি সম্মুখে তুলে ধরে। মহিলা বৃদ্ধের বাটিতেই ফ্যানটুকু উজার করে ঢেলে দিয়ে সশব্দে দরজা বন্ধ করে ভিতরে চলে যান। ক্ষুধার্ত শিশু পুত্র-কন্যা আর চক্ষু কোটরাগত অস্থিচর্মসার স্ত্রীকে পাশে ফ্যানের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেও বৃদ্ধ একাই সবটুকু ফ্যান নিঃশেষ করে ফেলতে ককিয়ে উঠলো শিশু পুত্র কন্যা। কন্যা বলে উঠলো— 'বাবা, তুমি সবটুকু খেয়ে নিলে। আমাদের জন্য একটুও রাখলে না'। সম্বিত ফিরে

আসতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো বৃদ্ধ। মাটিতে অসহায়ের মতো মাথা ঠুকতে থাকে আর বলতে থাকে অস্ফুট স্বরে— 'এ আমি কি করলাম। এ আমি কি করলাম। সব ফ্যানটা কেন আমি খেয়ে নিলাম। সম্মুখে অভুক্ত স্ত্রী তখন নীরব নিথর।

'গণআন্দোলনের দিনলিপি' থেকে—

'গণশক্তি'র সংবাদ ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩

১৯৫৩ সালের পরিস্থিতি ঃ—কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তখন এ রাজ্যে ডিক্টেটর।

"১৯৫৩ সালে সুন্দরবনে ব্যাপক দুর্ভিক্ষের কালোছায়া দেখা দেয়। এমনকি মেদিনীপুরের মতো শস্যে বাড়তি জেলাতেও খাদ্যভাব দেখা দেয়। চব্বিশ পবগণার হাড়োয়া থানার চারাবাড়ি, গাবতলা, শুয়ারমারি, ডিহি গাজা, নজদিপুর, তেঁতুলবাটি, মালঞ্চ, বিঘাবাটী প্রভৃতি গ্রাম, মেদিনীপুরের কাঁথি, শালবনী, গড়বেতা, অঙ্কন প্রভৃতি, বর্ধমানের পূর্বস্থলী, কোচবিহারের ৪নং ও ৬ নং ইউনিয়নের তল্পিগাড়ি, গয়েরগড়ি, দলুদাদলগিরি, ভাওয়া গুড়ি প্রভৃতি গ্রামে গ্রামে অর্ধাহাব অনাহারে কৃষকরা মৃত্যুর সামনে এসে দাঁড়ান। ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩ হাড়োয়া থানার আটশত ব্যক্তি, মেদিনীপুবের ভগবানপুরে ৪ হাজার কৃষক ও ক্ষেতমজুর ও জনসাধারণ সরকারের নিকট খাদ্যের দাবিতে গণদরখাস্ত পেশ করেন।"

(গণশক্তি ২২.২ ৯৯)

২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩

১৯৫৩ সালে পশ্চিমবাংলায় দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ পরিস্থিতির হাত থেকে দরিদ্র জনগণকে রক্ষা করার পরিবর্তে রাজ্য সরকার খাদ্যের দাবীতে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে ভয়ঙ্কর দমনপীড়নের পথ অবলম্বন করে।মতপ্রকাশের স্বাধীনতাও কেড়ে নেওয়া হয়। 'গণশক্তি' পত্রিকার পৃষ্ঠায় ২৯শে ফেব্রুয়ারী ৯৯ নিম্নোক্ত সংবাদ পুনঃ প্রকাশিত হয়।

"পশ্চিমবঙ্গ এমনকি রবীন্দ্রনাথ, দীনবন্ধু মিত্রও বাদ পড়েননি।"

২৮শে ফেব্রুয়াবি, ১৯৫৩ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ 'সংকেত' নাটক, 'নানকিং' নামক কাব্যপুস্তিকাকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়। 'লোকনাট্য' নামক নাট্য সমাজকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। 'পথের আলো'কে নিষিদ্ধ করা হয়। 'পরিচয়' পত্রিকাকে নানাভাবে পীড়ন করা হয়। ৪০ জন সাহিত্যিক ও শিল্পীকে গ্রেপ্তার করা হয়। ন্যাশনাল বুক এজেন্সীকে দুবছর তালাবন্ধ করে রাখা হয়। কলকাতা পুলিশ কমিশনার গণনাট্য সঙ্ঘকে একটি

নির্দেশে জানান ৬১ খানা নাটক অথবা মুদ্রিত কাব্য বা পাণ্ডুলিপি পুলিশ কমিশনারের কাছে জমা দিতে হবে। এসবের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়', 'গোরা' ও 'বিসর্জন' এবং দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' এবং 'অমর ভারত' প্রভৃতির নামও রয়েছে।

('গণশক্তি' ২৮-২-৯৯)

১লা মার্চ ১৯৫৫

"পরপর তিনবছর যাবৎ বন্যা, অনাবৃষ্টি ও পোকায় ধান নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে কোচবিহারে তীব্র খাদ্য সংকট দেখা দেয়। চাষের জমিতে তিন চারফুট বালি জমে। সরকারী উদ্যোগ ছাড়া এই বালি অপসারণ দুঃসাধ্য। ঐ জেলার শস্যভাণ্ডার তুফানগঞ্জের বুভুক্ষু কৃষকরা ১৪দিন ধরে টেষ্ট রিলিফ ইত্যাদিব দাবীতে কোর্ট প্রাঙ্গণে অবস্থান-ধর্মঘট করেন। পুলিশ ৯জন কৃষককে গ্রেপ্তার করে। ১লা মার্চ, ১৯৫৫, কোচবিহার শহরে বন্দীমুক্তি, কৃষকদের দাবী আদায় ইত্যাদি দাবীতে এক বিশাল জনসভা হয়। ঐ জনসভা থেকে সমস্ত জেলাব্যাপী আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়।

('গণশক্তি' ১লা মার্চ ১৯৯৯, 'গণ আন্দোলনের দিনলিপি')

স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবাংলায় চরম খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছিল ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে এবং ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দেও। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে খাদ্য আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে ৮০ জন কৃষক ও যুবক কলকাতার বুকে নিহত হওয়ার ঘটনা পশ্চিমবাংলায় নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে। সেদিনটা ছিল ৩১শে আগষ্ট। আর ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের খাদ্য আন্দোলনের অংশ গ্রহণের অপরাধে পুলিশের লাঠি ও গুলি চলে সমগ্র রাজ্যজুড়ে। কলকাতা তো বটেই। কোন্নগর, চন্দননগর, শান্তিপুর, নবদ্বীপ থেকে কুচবিহার পর্যন্ত পাহাড় থেকে সমুদ্র এলাকা তোলপাড় হয় খাদ্যের দাবীতে। খাদ্যের দাবীকে সমর্থন জানিয়েছিল কমিউনিষ্টরা। তাই ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী) নেতা ও কর্মীদের ব্যাপক গ্রেপ্তারের কাহিনী এবং খাদ্য আন্দোলন ক্রমে বন্দী মুক্তি আন্দোলনে পর্যবসিত হলে রাজনৈতিকভাবেই জাতীয় কংগ্রেস দল জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পশ্চিমবাংলার জনগণ সরকারী ক্ষমতা থেকে কংগ্রেসীদের টেনে নামিয়ে দেয়। প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম যুক্তফ্রণ্ট সরকার। এর পরের ঘটনা সকলেরই জানা, পশ্চিমবাংলায় ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় যুক্তফর্ণ্টের সরকার এক বছরেরই মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর ষড়যন্ত্রের জন্য ভেঙ্গে পড়লে রাজ্যের বুকে যে ভয়াবহ সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয় তা অভূতপূর্ব। এইরূপ সন্ত্রাসের কবলে বহু পরিবার যারা কংগ্রেসী ছিল না কমিউনিষ্টদের কেবল সমর্থন করতো, বেছে বেছে এই

ধরনের পরিবারগুলোকে শারীরিক ভাবে নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা সফল করে তুলতে কংগ্রেসীরা উঠে পড়ে লাগে। ১৯৭০-১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে পর্যন্ত পশ্চিমবাংলায় আধা ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের রাজত্বের কাহিনী সুবিদিত। সন্ত্রাস সৃষ্টির দ্বারা দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে একবছরের মধ্যে দশলক্ষ বিঘা বেনামা জমি যা বৃহৎ জোতজারদের কাছ হতে উদ্ধার করা হয়েছিল তা আবার পূর্বতন মালিকদের হাতে সন্ত্রাসের সুযোগে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল।

কংগ্রেসীরা ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মার্চের পর থেকেই পশ্চিমবাংলায় গড়ে তুলেছিল এক দুর্ধর্ষ ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী 'ফ্যান্সীক্লাব'। কমিউনিষ্টদের বিশেষতঃ মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির লোকজনকে গুপ্তহত্যা করার কাজে ওরা হাত পাকিয়েছিল। পুলিশের ভূমিকা ছিল গৌণ, সহায়ক শক্তির অত্যাচারীদের দেশের বুকে কল্যাণকর রাষ্ট্রে জনগণের ভূমিকা বিলুপ্ত হলো। সরকার, জনগণের জন্য এবং জনগণের দ্বারা রাষ্ট্রনীতির বহুশ্রুত এই তত্ত্ব খারিজ হয়ে গিয়েছিল দিল্লীর মসনদ থেকে। মধ্য শ্রেণীর জমির মালিক যারা অকৃষক তারা ভাগচাষী উচ্ছেদ করতে ব্যগ্র হয়, ক্ষেতমজুররা এক কেজি চাল এবং আট টাকা নগদ মজুরীদাবীতে সোচ্চার হলে জোতদাররা গাঁতায় অর্থাৎ নিজেরা নিজেদের জমি চাষ করতে আরম্ভ করে। এতকাল ক্ষেতমজুর ভাগচাষীরা জোতদারকে বয়কট করতো, সন্ত্রাসের কালে কৃষি শ্রমিকদেরই বয়কট করে জোতদাররা। ক্ষেতমজুর গ্রামীন কারিগররা দিবালোকে খুন হতে থাকে। তাঁতী বা ভাগচাষী, শ্রমজীবি মানুষ আতঙ্কে দিন কাটাতে থাকে। গাছের ডালে নিহত মজুরের নিথর দেহ ঝুলছে, নয়তো খালের জলে পচে ভেসে উঠছে। নিত্যই গণহত্যার সংবাদ। বামপন্থীদের মধ্যে অনৈক্য। একদল শাসক শ্রেণীকে তোল্লা দিচ্ছে উগ্র মার্কসবাদ বিরোধিতা থেকে। যে ট্রটস্কী পন্থীবা ফ্যাসিষ্ট পদ্ধতিতে ঢাকার রাজপথে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মার্চ রেল শ্রমিকদের নেতা প্রগতিশীল লেখক বাইশ বৎসর বয়স্ক তরুণ সোমেন চন্দকে পিছন থেকে মিছিলের মধ্যেই শানিত অস্ত্রের আঘাতের পর আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছিল, দুই চোখ খাবলে তুলে নিয়েছিল সেই তথাকথিত বাম পন্থীরা ১৯৭০-৭৭ খ্রীঃ একই পদ্ধতি অবলম্বন করে মার্কসবাদী শ্রমজীবি মানুষ ও সংগঠক তরুণ কর্মীদের শাসকদলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিশ্চিহ্ন করার অভিযান চালিয়ে এক শ্বাস রোধকারী পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল।

ডঃ অমর্ত্য সেন তাঁর কল্যাণ অর্থনীতির তত্ত্বে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে যে পাঁচটি স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করেছিলেন তার অন্যতম 'রাজনৈতিক স্বাধীনতা'র কোন অবশেষটুকুও ছিল না অন্ততঃ পশ্চিমবাংলায় এই সাতবছরে। সন্ত্রাস তখন বিরাজমান সর্বত্র। ১৯৭০

খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মার্চে শুরু হয়েছিল হুগলী জেলায় সন্ত্রাসের অভিযান। বাঁশবেড়িয়া ত্রিবেণী এলাকার কেশোরাম রেয়ন কারখানার জ্বলন্ত বয়লারের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল ননীদেবনাথ, রামজীবন সাঁতরা আর তারণ মালি, তিন মার্কসবাদী কর্মী ও সমর্থকের খুন করা দেহগুলো। এইভাবে শেষ হয়েছিল সৎকার কার্য। সাতবছরে এগারোশত সি. পি. আই. (এম) কর্মী ও সমর্থক হত্যা করা হয়েছিল। মুখে ছিল উল্লাসভরা ধ্বনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সৃষ্ট সেই 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের সন্তানদলের 'বন্দেমাতরম্'। ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দের বিধানসভা নির্বাচনে সি. পি. আই. (এম) একাই একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করলেও তাদের হাতে রাজ্য ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়নি। পরের নির্বাচনে যাতে মার্কসবাদীরা আবার সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারে সেই লক্ষ্যে ১৯৭২ খ্রষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনটাই জালিয়াতি জোচ্চুরী করে পণ্ড করে দেওয়া হলো। দেশের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নেতা জ্যোতি বসু লিখলেন তাঁর অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ একটি স্বল্পাকার রচনা 'পশ্চিমবাংলায় সংসদীয় গণতন্ত্রের ধ্বংস সাধন' (Subversion of Parliamentary Democracy in West Bengal)।

দেশের শাসন ক্ষমতার তখন কংগ্রেস (ইন্দিরা) দল। কংগ্রেস দল দুটুকরো। একদল ক্ষমতায় অপর একদল কারাগারে। জেলে চলেছে বন্দীহত্যা অবশ্য এটা কেবল পশ্চিম বাংলার ক্ষেত্রে। কারাগারে স্থান সঙ্কুলান হয় না-তাই ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরের শেষে' ৭২ সালের জানুয়ারী মাসে পশ্চিমবাংলার উপচে পরা কারাগার থেকে কয়েকশত বন্দীকে গরু ছাগলের মতো ট্রেনে তুলে 'পাকিস্থানের চর' সাজিয়ে (তখন 'বাংলাদেশ' গঠিত হচ্ছে) মাদ্রাজের কুড্ডালোর জেলে চালান করে দেওয়া হয়েছিল। পশ্চিমবাংলার কারাগারে তখন বিরোধী মার্কসবাদী কর্মীরা এর প্রতিবাদে সরব হয়েছিলেন। এঁরা কোন রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা পান নি। সাধারণ কয়েদীদের মতো গাদা গাদা বন্দী জেল ওয়ার্ডে ঠেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হতো। বহু সি. পি. আই (এম) কর্মী ও নেতাকে দীর্ঘকাল আত্মগোপনে যেতে হয়েছিল। জাতীয় কংগ্রেস দলের এ রাজ্যের নেতা থেকে চুনোপুঁটিরা তরতাজা মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায় থেকে ফ্যালা-বাণ্টিরা, হাতকাটা মদন, এক চোখ কানা টুটুগুণ্ডা সকলের মুখে এক কথা 'পশ্চিমবাংলাকে ইন্দোনেশিয়া বানাবো'। হত্যা করা হলো ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা প্রবীন স্বাধীনতা সংগ্রামী হেমন্ত কুমার বসুকে।

১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জুন শেষ রাত্রে জারী করা হয়েছিল দেশ জুড়ে জরুরী অবস্থা। মার্কসবাদী সাংসদ জ্যোতির্ময় বসু থেকে কংগ্রেসী নেতা মোরারজী দেশাই এমন কয়েকশত নেতাকে নতুন করে কারারুদ্ধ করা হলো। সংবাদপত্রে, মুদ্রনে সেনসর শিপ

প্রথা চালু করা হলো। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের কবিতাব বই, উদ্ধৃতি দেওয়া নিষিদ্ধ হলো। তিন 'বন্দ্যোপাধ্যায়' যথা মানিক, বিভূতি ও তারাশংকরও বাদ গেলেন না। যে গল্প, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধে সংগ্রামের কথা শ্রমের কথা আছে তা নিষিদ্ধ হ'লো।

এই সাতবছরে যা ঘটেছিল তা উল্লেখ করতে হ'লে আর একটি 'মহাভারত' রচিত হবে। চাষবাস, শিল্প-কলকাখানা, বিদ্যুৎ সরবরাহ, হাসপাতাল, পরিষেবা সব কিছু জাহান্নমে চলে গেছলো। তন্তুবায়ীরা আর 'তানাপোড়েন' চালাতো না, কৃষক তার হালবলদ বিক্রী করে দিয়েছিল, বিদ্যালয়ে, মহাবিদ্যালয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু হয়েছিল পরীক্ষায় টোকাটুকি নয়, এবারের 'গণটোকাটুকি' বর্ধমানজেলার দুর্গাপুর এ. ভি. বি. উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক বৃদ্ধ মানুষ বিমল দাশগুপ্তকে চেয়ারেব সঙ্গে বেঁধে গায়ে পেট্রল ঢেলে ক্লাশের মধ্যে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হলো। এইভাবেই ফ্যাসিবাদের অভিযান চলেছিল সাতবছর ধরে। এখনও তারা দুঃস্বপ্ন দেখে রাত্রের বিছানায় যারা সেইসময় ফ্যাসিবাদের আগুনে ঝলসে যেয়েও এখনও জীবিত আছে। ত্রিশবছর পূর্বে যারা কারাজীবন যাপনে বাধ্য হয়েছিল, আত্মগোপনে গেছলো সেই কালের জীবিতরা রাত্রের দুঃস্বপ্নে ঘুম ভেঙ্গে গেলে স্বস্তিব নিঃশ্বাস ফেলে।

ডঃ অমর্ত্য সেনও জানতেন ঐ সময়ের তাঁর রাজ্যের ঘটনাবলীর কথা। দেশে গণতন্ত্র থাকলে মানুষ ইতিবাচক ও নেতিবাচক ক্রিয়া নির্ধারণ কবতে পারে। স্বাধীনভাবে জীবিকা মিললে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা থাকে। সত্তবের দশকের সাতবৎসরে ('৭০-'৭৭ খ্রীঃ) পশ্চিমবাংলায় 'গণতন্ত্র' বলতে ছিল ফাঁকা আওয়াজ। চরম খাদ্য সংকট, রেশনব্যবস্থা বিপর্যস্ত। মানুষ কোন অন্যায়েরই প্রতিবাদ করতে সাহস পেতো না। একজন তাঁত শ্রমিককে গাছের মোটা গুঁড়িতে বেঁধে রাখা হয়েছিল সকাল থেকে। মানুষ সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে। কেউ প্রশ্ন করে না কেন বা কারা তাকে এভাবে রজ্জুবদ্ধ করে রেখেছেন। একদল মধ্যবিত্তশ্রেণী থেকে আগত যুবক বসে আছে হতভাগ্য লোকটির সামনে। চোখে মুখে যুবকগুলির খুনের নেশা। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসতে লোকটির গাত্রে পেট্রোল ঢেলে দেশলাই কাঠি জ্বেলে দেওয়া হলো। আর্ত চীৎকারও করতে পারেনি তাঁত শ্রমিকটি, কারণ তার মুখে কাপড় গোঁজা আর তার ওপর কাপড়খণ্ড দিয়ে মাথার পিছন দিক বাঁধা। ঐ তাঁত শ্রমিকটি ইউনিয়ন করতো। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বা কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কেন খুন হলেন? বর্ধমানের আইনজীবি জননেতা ভবদীশ রায়। মাধ্যমিক শিক্ষক নেতা সন্তোষ ভট্টাচার্য্য বা রাস্তায় ট্রফিক কনষ্টেবল? এরাও যে কর্মরত অবস্থায় লাশ বনে গেলেন? জীবিত গণ্যমান্য থেকে সাধারণ

নাগরিককে হত্যা করতে করতে উন্মত্ত বিকৃত অবস্থায় শেষে কলেজ স্কোয়ারে মনীষি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শ্বেত প্রস্তরের আবক্ষ মূর্তির মস্তিষ্কটি কেটে ফেলে রাস্তায় ফুটবলের মতো ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হলো। এইসব ঘটনা পরম্পরায় মানুষ প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে ফেললো। শিশুহত্যা, নারী, বৃদ্ধ হত্যা কিছুই যখন বাদ গেল না তখন ওরা নিজেদের মধ্যেই খুনোখুনি শুরু করলো। এইভাবেই শেষ হলো 'ফ্রান্সী ক্লাব' নামক মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আগত যুবকদের এক সময়ের চিত্তবিনোদনের প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব যাদের ফ্যাসিষ্ট পদ্ধতিতে নরহত্যায় পারদর্শীতা ছিল।

মানুষ 'রাজনৈতিক গণতন্ত্র' এর অধিকার প্রয়োগ করে নির্বাচিত সরকার গঠন করবে এটাই তো সার্বজনীন ভোটাধিকার। দেশে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হলেও যদি রাজনৈতিক গণতন্ত্র থাকে তবে সেই দুর্ভিক্ষ মোকাবিলা করা সহজ হয়ে যায়। সরকারের দুর্ভিক্ষ মোকাবিলার রাজনৈতিক ইচ্ছা তখন দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের কাজে কর্মে প্রতিফলিত হয় বাস্তবে তখন প্রকৃত কল্যাণকামী সরকার এবং রাষ্ট্রব্যবস্থাব আমলে বা রাষ্ট্রের ছত্রছায়ায় একজন নাগরিকেরও অনাহারে মৃত্যু ঘটে না। 'ওয়েলফেয়ার ষ্টেট' কথাটির এটাই প্রকৃত মর্মবস্তু। নোবেলজয়ী অধ্যাপক অমর্ত্য সেন তাঁর বিশ্লেষনে এসব উল্লেখ করলে ভালো হতো।

১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবাংলায় ব্যাপক খাদ্য সংকট সৃষ্টি করে দুর্ভিক্ষ মহামারী। সে সময়ের প্রতিবেদন গুলোর কিছু কিছু এখানে তুলে ধরা হলো।

দুর্ভিক্ষ ১৯৭৪

সংবাদ : ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে চব্বিশ পরগণা জেলার বাটা মহেশতলায় প্রদর্শিত গণবিক্ষোভ ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ লাঠি, কাঁদানে গ্যাস ও শেষে গুলি ছোঁড়ে। ঘটনাস্থলে একজন এবং রাত্রে বাঙ্গুর হাসপাতালে দুই জনের মৃত্যু হয়। মার্চ (১৯৭৪) মাসে রাজ্যের অস্বাভাবিক পরিস্থিতির দরুণ রেশনেও খাদ্যদ্রব্য অমিল হয়। বাজারে বেবিফুডও মেলে না। নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য, কেরোসিন, বেবিফুড ইত্যাদির দাবীতে ১১ই মার্চ, ১৯৭৪ কয়েক হাজার মহিলা রাজভবনের সম্মুখে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে।

গ্রীষ্মকালে প্রবল অনাবৃষ্টি, খরার মধ্য দিয়ে ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাস ব্যাপী পশ্চিম বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। চাষ যোগ্য জমি যতদূর দৃষ্টি পড়ে ফেটে চৌচির। ফাটল এক একস্থানে এত গভীর এবং প্রশস্ত যে ছোট খাটো পশুও

ঐ ফাটলে সেঁধিয়ে যেতে পারে। ধূ ধূ মাঠ, মানুষ বা পশু দেখা যায় না। রৌদ্রতাপ এমন প্রচণ্ড যে কার সাধ্য গৃহের বাইরে দিন-দুপুরে বের হয়। বাতাসে আগুনের হল্কা, গ্রীষ্মকালীন ফসলের কোন অস্তিত্ব চোখে পড়ে না। বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ সব অগ্নিমূল্য। ভাদ্রমাস, অনাহারের মাস, অনটনের মাস। মজুররা কর্মহীন, তাঁতশ্রমিকরা, গ্রামীণ কারিগররা কর্মহীন। কিন্তু, তাঁতের সঙ্গে পরোক্ষ যুক্ত যারা মহাজন তাদের অভাববোধ নেই।

হুগলীর পাণ্ডুয়ার জয়পুর রাস্তার পাশে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের বাসিন্দা এক তন্তুবায়ী মহাজনের কারখানা ছিল। শ্রমিকরা মজুরী বৃদ্ধির দাবী তুলেছিলেন, একদিন বোধ হয় ধর্মঘটও পালন করেছিল। ধর্মঘট ভাঙ্গতে পুলিশ উপস্থিত। ধর্মঘটী শ্রমিকদের না পেয়ে পুলিশ ফিরে যায়।

গোটা রাজ্যেই দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ইন্দিরাপন্থী কংগ্রেস দলের। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় খুলে দিয়েছে লঙ্গরখানা। পাশাপাশি আধাফ্যাসিবাদী সন্ত্রাস। সংবাদপত্রের প্রতিদিনের পৃষ্ঠায় নিহতের সংবাদ। পিচের ড্রামে নিহত তরুণদের লাশ, রাস্তার পাশে, মাঠের-মধ্যে, মধ্যে খালেব ধারে, ব্রীজের নিচে নির্ঝর মান্নান-মহাদেব-গফুরদের লাশ।

সিউড়ি, লালগোলা, হিলি, বাঁকুড়া থেকে জলপাইগুড়ি সর্বত্র মানুষের লাশ, কারা কাকে দাহ করবে, কে কাদের সমাহিত কববে। হাজতে মহিলারা ধর্ষিতা হচ্ছে। পথে, ট্রেনে ভিক্ষুকের সংখ্যা সাংঘাতিকরকম বৃদ্ধি পেয়েছে। ভিখারী সংখ্যা এমন ক্রমবর্ধমান যা পূর্বে কখনও ঘটেনি।

'গণশক্তি'র পৃষ্ঠায় বাঁকুড়াজেলার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। "বাঁকুড়া জেলার বাঁকুড়া সদর, ছাতনা, শালতোড়া থানার তিলিড়ি, শামলা, বামুতোর গ্রাম ও অন্যান্য স্থানে অনাহারে মৃত্যু ঘটে ২০০ জনের। বাঁকুড়া জেলা শাসকের কাছে সি. পি. আই (এম) ৮৫টি লঙ্গরখানা খোলার দাবী জানিয়েছে।

'যুগান্তর' (১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪) লিখছি—"জলপাইগুড়িতে এ পর্যন্ত অনাহারে মৃত্যু ঘটেছে ৪০০ জনের এবং মৃত্যুর অপেক্ষা করছেন আর কযেকশত নিরন্ন মানুষ।"

ঐ একই দিনের 'যুগান্তর' পত্রিকার পৃষ্ঠায় দাম্ভিক মুখ্যমন্ত্রীর সদর্পে ঘোষণা প্রকাশিত হয়েছে।—

"আগামী দুমাস পশ্চিমবঙ্গের অত্যন্ত কঠিন সময়। কিন্তু এই সরকার অনাহারে কাউকে মরতে দেবে না।"

১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ খ্রীঃ সংবাদ সূত্র জানায় যে, ধুরন্ধর বাক্যবাগীশ মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করছেন যে, পশ্চিমবাংলার একজনও অনাহারে মারা যাবে না। কখনও তার দলের রাজ্য সভাপতি অরুণ মৈত্র স্বীকারোক্তি সহ বিবৃতি দেন যে, গভীর খাদ্যাভাব জনিত রোগে এবং অনাহারে পশ্চিমবাংলায় প্রায় ১০০০ জন প্রাণত্যাগ করেছে। ১৮ই সেপ্টেম্বর 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া', ১৯শে সেপ্টেম্বর প্রকাশিত 'যুগান্তর' এইরূপ ভয়াল পরিস্থিতির জন্য কংগ্রেস সরকারকেই দায়ী করে প্রবন্ধ ছেপেছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে দুমুঠো অন্নের জন্য ভয়ঙ্কর হাহাকার, গ্রাম শহর উথাল পাথার। চোখের কোণে জল শুকিয়ে যাচ্ছে, কান্নারও ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে।

দুর্ভিক্ষের জন্য আসল দায়ী সরকার। প্রত্যেকটি গ্রাম শহরে খাদ্য মজুত, মজুত খাদ্য পচে যাচ্ছে অথচ তা বাইরে আসছে না। এত মানুষের জীবনহানি তথাপি সরকার কোন জেলাকেই দুর্ভিক্ষ পীড়িত ঘোষণা করছে না। তাহলে যে দায়িত্ব এসে যায়। 'দুর্ভিক্ষ' আর 'বন্যায়' প্রভেদ আকাশ পাতাল। দুর্ভিক্ষের জের আরও কয়েকবছর থেকে যায়।

সাধারণ মানুষের মুখে বিক্ষোভ বিস্ফোরক আকার গ্রহণ করছে। জেলায় জেলায় জেলা শাসকদের কাছে হাজার হাজার মানুষের বিক্ষোভ সমাবেশ সন্ত্রাসের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে। কলকাতায় সমাবেশ থেকে মজুত উদ্ধারের সংগ্রামে নামার আহ্বান শোনা যায়। ২৭শে সেপ্টেম্বর সংবাদ পত্র জানাচ্ছে— "খাদ্য, কাজ, খয়রাতি সাহায্য, টি. আর. স্কীম চালু করা, বাঁচার মতো মজুরীর দাবীতে সি. পি. আই. (এম) বীরভূম জেলাকমিটির ডাকে পাঁচহাজারেরও বেশি মানুষ সিউড়ির শহরে বিক্ষোভ সমাবেশে জমায়েত হয়। বিশাল মিছিল বীরভূম জেলাকে দুর্ভিক্ষ পীড়িত বলে ঘোষণার জন্য জেলা শাসকের দপ্তরে দাবী জানায় ও ডঃ শরদীশ রায় এম. পি. র নেতৃত্বে দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করে।

"ঐ দিন বীরভূম জেলার রাজনগর ব্লকে নলহাটির ১ নং ব্লকে, পাইকর ব্লকে, বোলপুর প্রভৃতি অঞ্চলে তিনহাজার নরনারী সি. পি. (এম). ও গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির নেতত্বে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং খয়রাতি সাহায্য আদায় করেন।"

২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ খ্রীঃ পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির কলকাতা জেলা কমিটির আহ্বানে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে বিশাল মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেখান থেকে মহিলারা মিছিল করে রাজভবনে রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি দেওয়ার জন্য এসপ্লানেড ইষ্টে জমায়েত হন। মহিলা নেত্রীরা "রাজ্যজুড়ে নারী লাঞ্ছনার জন্য"

কংগ্রেস সরকারকে দায়ী করেন। কংগ্রেস সরকার যে কায়দায় গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে অবদমিত করার যে পথ অবলম্বন করেছে বক্তারা সেই আধাফ্যাসিবাদী কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করে বলেন এই ব্যাধি পশ্চিমবাংলার বুকে দৈনন্দিন জীবন ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। শেষ পর্যন্ত আর 'আধা' নয়, পুরা ফ্যাসিষ্ট রাজ কায়েম হয়ে যাবে। স্মারকলিপিতে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় নারী ধর্ষণ ও হত্যার সুনির্দিষ্ট উদাহরণ দেওয়া হয়েছিল।

দৈনিক সংবাদপত্র 'গণতান্ত্রিক' থেকে উদ্ধৃতি ঃ....................

২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ ভারতসভা হলে পাঁচটি বামপন্থী মহিলা সংগঠনের উদ্যোগে এক যুক্ত কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশানে মূলপ্রস্তাব উত্থাপন করেন গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সম্পাদিকা পঙ্কজ আচার্য। কনভেনশানে গ্রাম শহরে ন্যায্য মূল্যে খাদ্য সরবরাহ পর্যাপ্ত রেশন, '৬৯ সালের দরে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ, মজুত উদ্ধার, কালোটাকা বাজেয়াপ্ত ইত্যাদি এগারো দফা দাবীর ভিত্তিতে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়।

২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী)র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ডাকে শহীদমিনার ময়দানে এক বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন কৃষ্ণপদ ঘোষ। সভায় রাজ্যকমিটির সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্ত বলেন—"জোতদার-মজুতদারদের ঘরে খাদ্য শস্য মজুত থাকবে আর হাজার হাজার মানুষ না খেয়ে মরবে এ অত্যাচার কোন অবস্থাতেই চলতে পারে না। মাত্র দু শতাংশ মানুষেব হাতে অন্ততঃ ২০ লক্ষ টন খাদ্য শস্য মজুত থাকে। কংগ্রেস সরকারের মানুষ মারার খাদ্যনীতিব দৌলতে এরা গ্রাম শহরের হাজার হাজার মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে।" সভায় কংগ্রেস সরকারের সৃষ্ট সর্বগ্রাসী সংকটের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের আহ্বান জানানো হয়।

৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৭৪ ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে কলকাতার ৬টি কেন্দ্রীয় ট্রেডইউনিয়নের ডাকে শ্রমিক কর্মচারী এবং শিক্ষকদের এক যুক্ত কনভেনশান অনুষ্ঠিত হয়। এই যুক্ত মঞ্চ থেকে শ্রমিক-কর্মচারী স্বার্থ বিরোধী নীতিকে পরাস্ত করার জন্য ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়।

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে খাদ্য, বস্ত্র, টেষ্ট রিলিফ, মূল্যবৃদ্ধি রোধ, কালা কানুন বাতিল, রেল ও সরকারী কর্মচারীদের উপর থেকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার কৃষকদেব ফসল রক্ষার জন্য পুলিশের আক্রমণ বন্ধ, ছাঁটাই-লে-অফ বন্ধ এবং মিশা ও ডি. আই. আর.

বাতিলের দাবী জানানো হয়।

১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের দুর্ভিক্ষের জের চলে বহুদিন। ক্ষমতায় আসীন সরকার নয়, দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় নেমে পড়েছিল বরং ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (মাঃ) ও তার সঙ্গী সাথীরা।

খোলা বাজার নীতির সর্বশেষ প্রাপ্তি/

অত্যাবশ্যকীয় সব্জির যতটা না প্রকৃত অভাব ছিল, তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি অভাব সৃষ্টি করা হয়েছে, বলেছেন প্রখ্যাত খাদ্য বিশেষজ্ঞ দেবীন্দর শর্মা। তিনি জৈব প্রযুক্তি ও খাদ্য নিরাপত্তা ফোরামের সভাপতি। এই ফোরামে আছেন কৃষি বিজ্ঞানী, কৃষক পরিবেশবিদ্ ও অর্থনীতিবিদরা। তিনি বলেন যে, জুন জুলাই মাসে অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধির কোন ব্যাখ্যা দিতে পারে নি সরকার। সাহেব সিং বর্মা গরীব মানুষকে পিঁয়াজ খেতে বারণ করেছিলেন। তার খেসারত তাঁকে দিতে হলো। দেবীন্দর শর্মা বলেন, মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইলেকট্রনিক ও গৃহস্থালীর আধুনিক তৈজস পত্রেব বেসরকারী ব্যবসা থেকে সরকারী নিয়ন্ত্রনের প্রত্যাহার দরকার। কিন্তু নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে এই নিয়ন্ত্রণ কতটা জরুরী বোঝা গেল। যাঁরা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন ও বিপণনকে সরকারী নিয়ন্ত্রনের অবনমন চেয়েছেন, মজার ব্যাপার, তাঁরাই পেঁয়াজের জন্য মাদার ডেয়ারী সুপার বাজারের বিক্রয় কেন্দ্রে লাইন দিয়েছে। (সূত্র ঃ-- আজকাল, ১১ অক্টোবর, ১৯৯৫)

মুক্ত বাজার বা খোলাবাজার অর্থনীতির পরিণাম কি ভয়ঙ্কর উপরোক্ত সংবাদটুকু দেখলেই তা বোঝা যায়। দেশের কেন্দ্রীয় সরকারে ১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দে পবিবর্তন ঘটেছে। জাতীয় কংগ্রেস দল বা পূর্বতন যুক্তফ্রন্ট সরকার নয় একেবারে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের উন্মত্ত সমর্থক ভারতীয় জনতা পার্টি বা বিজেপির নেতৃত্বে এক কোয়ালিশন সরকার। এই সরকার মুক্তবাজার অর্থনীতির দোহাই পেড়ে যা করছে তাতে তাঁতশিল্প প্রমুখ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প তো কোন ছাড়, দেশীয় প্রাইভেট ব্যবসা ও কলকারখানার ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আর দুবাহু তুলে কর্মসংস্থানহীন শিল্পায়নের ওজর তুলে বিদেশী পুঁজিপতিদের কাছে এ দেশের বিশাল বাজার একেবারে উন্মুক্ত করে দিয়েছে আমদানী শুল্ক ক্রমাগত হ্রাসের মাধ্যমে। ভারতবর্ষের অর্থনীতির চিত্র, বর্তমানকালে ঘন ঘন পরিবর্তন ঘটছে। পুঁজিপতিরা আরামে যথেচ্ছচার চালানোর লাইসেন্স পাচ্ছে। কালোটাকার পাহাড় গড়ে তুলেছে, ইতিমধ্যেই মজুত কালো টাকার পরিমাণ এক লক্ষ কোটি টাকা অতিক্রম করেছে। মজুত কালোটাকাই এখন দাপটে দেশের অর্থনীতির নিয়ন্তা। এই টাকা বাজেয়াপ্ত

করতে পারলে তো আর বিদেশী ঋণের ওপর নির্ভর করতেই হয় না। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার যেহেতু ওরাই চালায় তাই কালোটাকা বাজেয়াপ্ত করার কোন ইচ্ছাই কেন্দ্রীয় সরকারের রাজনৈতিক কর্মসূচীর মধ্যে নেই।

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সুবর্ণজয়ন্তী পূর্তির দুবৎসর পরে সরকার অধিগৃহিত বা রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প, কলকারখানা, ব্যাংক, যাত্রী পরিবহন, মিল, খনি থেকে আরম্ভ করে, শিক্ষাব্যবস্থা (কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা) ওষুধশিল্প, সমস্তই বিরাষ্ট্রীয়করণ বা পুঁজিপতিদের হাতে ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প রুগ্ন হয়ে পড়বে সেগুলিকে তুলে দেওয়া হবে এবং যে গুলি ইতিমধ্যেই রুগ্ন সেইগুলি তুলে দেওয়া হয়েছে বা প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। এর ফলে কয়েক কোটি মানুষ নতুন করে কর্মহীন হয়ে পড়ছে বা পড়বে। ব্যক্তিগত পুঁজির বৃহৎ মালিক গোষ্টী বা মালিকরা (যেমন ডানলপ, হিন্দুস্তান, ত্রিবেনী টিসুস্ ইত্যাদি) লাইন দিয়ে পশ্চিমবাংলাকে শিল্পের ক্ষেত্রে বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য সুবৃহৎ কারখানা গুলি বন্ধ করে দিয়েছে বা দেবার ষড়যন্ত্র পাকা করেছে।

এই সরকার দেশব্যাপী ভূমিসংস্কারের কোন কর্মসূচীগ্রহণ করেনি। পশ্চিমবাংলা, কেরল ও ত্রিপুরার বামফ্রন্ট শাসিত রাজ্যগুলি ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যগুলিতে জমিদারশ্রেণীর ভাড়াটিয়া সশস্ত্র গুণ্ডাদের হাতে (যেমন বিহারে রণবীর সেনা) ভূমি হীন কৃষকরা প্রাণ হারাচ্ছে। উত্তরপ্রদেশে, বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ প্রতিদিন রক্তাক্ত হচ্ছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুইদশকে তাঁতশিল্পে বিশেযতঃ হস্ত চালিত তাঁতের ক্ষেত্রে কিছুটা জোয়ার এসেছিল গান্ধীজির নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস চরকায় সুতা কাটা, খদ্দর পরিধান প্রভৃতি কর্মসূচী গ্রহণ করার জন্য। কংগ্রেস মঞ্চ থেকে লক্ষ্য হিসাবে ঘোযণা করা হয়েছিল স্বদেশী শিল্পের জাগরণ। এখন? বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারও 'স্বদেশী জাগরণ' কর্মসূচী গ্রহণ করার কথা নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষণা করেছিল। যেমন কৃযিতে পরিকাঠামো উন্নতির কথা, দরিদ্রদের জন্য আবাসন বাসস্থান নির্মাণ করার পরিকল্পনা প্রভৃতি ঘোযণার মাধ্যমে 'বেরোজগারী' হটানোর কথার বাগাড়ম্বরে সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠা ভর্তি করে দিয়েছিল। আর অভিজ্ঞতা হচ্ছে ঠিক বিপরীত। সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ গ্রামীণ কুটির শিল্পের যতটুকু এখন ঝড় ঝাপটা ভূমিকম্পের পরও অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে পর পর বুর্জোয়া পুঁজিপতি-জমিদার শ্রেণী রক্ষক কেন্দ্রীয় সরকারগুলির নীতির ফলে সেই অল্প সংখ্যক জীবিত তন্তুবায়ীরা কিভাবে আর ক্ষয়িষ্ণু শিল্পটার অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব হবে তার কোন দিশার সন্ধান পাচ্ছে না। 'সাবসিডি' 'রিজার্ভেশন' 'বাজার সহায়ক স্কীম' সবই প্রত্যাহার করা হচ্ছে। একচেটিয়া দেশী বিদেশী বস্ত্র শিল্প মালিকদের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় টিকে থেকে স্বাধীন ভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে বলে বাণী বিতরণ

করা হচ্ছে, যেটা কার্যতঃ অসম্ভব। এখন সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ব সুতাকলগুলি বন্ধ করা হচ্ছে।

ইদানীন্তন কালে তাঁত শিল্পকে সংকটজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ভূয়া সোসাইটি গঠিত হয়েছিল সত্তরের দশকে বা তারও আগে পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত প্রফুল্লচন্দ্র সেনের আমল থেকে। প্রফুল্লচন্দ্র সেন যখন ষাটের দশকে পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তিনি কলকাতার বড় বাজারের মাড়োয়ারী সমাজের বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজিপতি বা ব্যবসায়ীদের হাতে তাঁত কারখানাগুলো প্রায় বন্ধক দিয়ে দেন। বড় বাজারের ব্যবসায়ীরা মওকা বুঝে হস্ত চালিত এই কুটির শিল্পের ওপর প্রচণ্ড থাবা বসিয়ে দিল, হ্যাণ্ডলুমে তৈরি উৎকৃষ্ট ধুতি, শাড়ি, লুঙ্গী ইত্যাদি প্রস্তুত করে তার ওপর ধনিয়াখালি, শান্তিপুর, কাটোয়া, রাজবলহাট, বেগমপুর, ইত্যাদি নামে অভিহিত করা শুরু হলো। অর্থাৎ এক ধরনের জালিয়াতি ব্যবসায় পরিণত হলো হস্তচালিত তাঁত শিল্পের বেনামে। সমবায় আর তার সঙ্গে তন্তুবায়ীদেরও সুনাম ধ্বংস হতে থাকল। বড়বাজারের বস্ত্র ব্যবসায়ী মহাজনদের অঢেল টাকা খাটতে থাকলো হস্ত চালিত তাঁত শিল্প সমবায় গুলোতে শীর্ষ সমবায় বা শীর্ষ উন্নয়ন সংস্থা তাঁত বস্ত্রের যে সমস্ত মেলা বা শোরুম বা বাণিজ্য কেন্দ্র খোলে সে গুলো শেষপর্যন্ত বড় বাজারের মিলে প্রস্তুত বস্ত্র বিক্রেতা বা একচেটিয়া বৃহৎ বস্ত্র ব্যবসায়ীদের খপ্পরে চলে যায়, কোঅপারেটিভ আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বড়বাজার এলাকার ব্যবসায়ীরা প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের মুখ্যমন্ত্রীত্বের আমলে হস্তচালিত তাঁত সমবায় গুলির মালিক সেজে কয়েক কোটি টাকা শুষে নিয়েছে বা মুনাফা করে নিয়েছে।

সত্তরের দশকে সমবায়গুলির চেহারা আরও করুণ, ক্ষীণতম হয়ে ওঠে। একদিকে পশ্চিমবাংলার জওহরলাল নেহেরুর ঘোষিত ও অনুসৃত মাশুল সমীকরণ নীতির জন্য বৃহদায়তন ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প একটি দুটি ছাড়া এরাজ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠিত হলো না, অন্যদিকে প্রধান কুটির শিল্প হস্তচালিত তাঁত শিল্প যার ওপর এরাজ্যের গ্রামীণ পরবর্তীকালে শহরের অর্থনীতির অর্ধেকেরও বেশি মানুষ নির্ভরশীল সেই শিল্পটিকে উন্নতির পথে ঊর্ধগামী করার পরিবর্তে অধোগামী করা হলো মহাজন তোষণ নীতির দৌলতে। ভূয়া সমবায়ে রাজ্য ভরে গেল। তুলা থেকে সুতা তক্‌মা তার ক্ষেত্রে কিন্তু মাশুল সমীকরণ নীতি চালু করা হলো না।

যে জাতীয়তাবাদীরা অনন্তকাল ধরে খদ্দর পরে নিজেদের পিছনে দেশপ্রেমিক তক্‌মা এঁটে জাতীয় পতাকা আন্দোলিত করে নিজেদেরকে ১৯৪২ সালের 'ব্রিটিশ ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের শরিক এইরূপে প্রচারের জয়ঢাক বাজাতো তারাই খদ্দর প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় 'চিত্তরঞ্জন লুম' এবং 'পিটলুম' গুলো তাঁতীদের হাত থেকে নিয়ে তুলে

দিল সেই মহাজনদের হাতে। ভারতবর্ষে পুঁজিবাদ যাতে স্ফীততর হতে পারে তার জন্য একচেটিয়া পুঁজিপতি এবং বহুজাতিক কর্পোরেশন গুলির মালিকদের কাছে সমগ্র বস্ত্রশিল্প সমর্পণ করার অঙ্গীকারবদ্ধ ভারতবর্ষের কেন্দ্রে শাসন ক্ষমতার আসীন সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতৃত্ব প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন করলো। গ্যাট (Gatt) চুক্তিতে স্বাক্ষর করা বা বিশ্বায়নের প্রবল ঢেউ বৃহৎ পুঁজির সেবাদাস সংবাদ পত্রগুলোর তারস্বরে ওকালতি দুর্বল হতশ্রী তাঁতশিল্পীদের দিকে ফিরেও দৃষ্টিপাত কবে না। বৃহৎ পুঁজির নিটোল বিকাশে যাতে কোন বাধা না আসে তার জন্য হস্তচালিত মান্ধাতা আমলের শিল্পটির বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও ওরা কেড়ে নিতে চায়।

দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের যাঁরা কাণ্ডারী ছিলেন, হাল ধবেছিলেন, তিমির বিনাশী জাতির জনকের নামে দিবারাত্র জয়ধ্বনি করতেন, তাঁরাই শেষপর্যন্ত আখেরে গুছিয়ে নিতে 'তিমির বিলাসী' বনে গেলেন। তাঁতশিল্পে কর্মসংস্থান হতে পারে তা চিন্তা করাই অমূলক হয়ে গেল। ক্রমে পূর্বপুরুষের 'জাত-ব্যবসা' ত্যাগ করে অন্য পেশায় চলে যেতে বাধ্য হতে থাকে।

বর্তমানে পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকার স্থিত হয়ে আছে প্রায চব্বিশ বছর বা হয়তো কিছু বেশী, ষষ্ঠবারের জন্য বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসীন. বামফ্রন্টের ঘোবতর শত্রু বলবে না এই সরকার তাঁতশিল্পকে রক্ষার জন্য শিল্পী বা শ্রমিকদের স্বার্থে কিছুই করেনি। সঙ্গতিহীন তাঁতশিল্পীবা অনেকেই এখন আবার তাঁতঘরে ঢুকছে, অতীতের সঙ্গে তুলনা করলে হতাশার চিত্র ফুটে ওঠে। কযেকটা ওয়ার্কশেড, বৃদ্ধ শ্রমিকের জন্য মাসিক চারশত টাকা পেনশন, কি চশমা বা তাঁতঘবের জন্য অনুদান হয়তো জুটছে। কিন্তু সারা বছর স্থানীয় মহাজনদের কাছে তাঁত শিল্পী সমবায়গুলোকে পর্যন্ত ঘুরতে হচ্ছে ওদের পাল্লায় পড়তে হচ্ছে। সেই এক অতীত চিত্র। উৎপন্ন বস্ত্রের সুতা বাজারের পাইকার, মহাজন, বস্ত্রব্যবসায়ীদের কাছ হতে অগ্নিমূল্যে খুচরা ক্রেতাকে কিনতে হলেও উৎপাদনকারী তন্তুবায়ী বস্ত্রের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, ফলে তাঁতী যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে যাচ্ছে।

২২

❑ বর্তমান পরিস্থিতি ❑

হুগলী জেলার বা আরও কয়েকটি জেলার তাঁতশিল্পীরা বা তাঁদের সমবায়গুলো সুতা ক্রয় করতে যদি দিনাজপুর স্পিনিং মিল বা মেদিনীপুরের তাম্রলিপ্ত স্পিনিং মিলে যেতে

পারে তবে হয়তো কিছুটা দামে সস্তা পাবে কিন্তু একি সম্ভব? পরিবহন ব্যয়ই হয়ে যাবে বিপুল। রাজ্যের কোথাও 'ইয়ার্ণ ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা হয়নি। পাণ্ডুয়া বা সোমড়ার তাঁত সমবায়কে কাটোয়ায় অবস্থিত 'তন্তুজ' এর গোডাউন থেকে সুতা আনতে যেতে হবে আর উৎপন্ন বস্ত্র সম্ভার জমা পড়বে কলকাতা সল্টলেক সিটিতে অবস্থিত কেন্দ্রীয় গোডাউনে। এই যাতায়াতের দরুণ যে ব্যয় হয়ে যাচ্ছে সমবায়ের তহবিল থেকে তা পূরণ হবার কোন আশা নেই।

প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের আমলে তাঁতশিল্পীদের রক্ষার জন্য গঠিত হলো 'ব্লক লেভেল উইভার্স কোঅপারেটিভ সোসাইটি' কিন্তু সেগুলো পূর্বোল্লেখিত কারণে একের পর এক বন্ধ বা রুগ্ন হয়ে যেতে থাকে। সমবায় আইনের বেড়াজালে ভূয়ো সমবায়গুলোকে যেমন বাতিল করা সহজ নয়, সেইরূপ যে সব রুগ্ন সমবায় কে পুনরুজ্জীবিত করে তোলা হয় সমবায় গুলো নিবন্ধীভুক্তি করনের কাজ করবে 'হ্যাণ্ডলুম ডাইরেক্টরেট', কিন্তু ভূয়া বাতিল করার বা পুনরুজ্জীবিত করার এক্তিয়ার নেই।

এর পর তাঁতবিহীন তাঁত শ্রমিকদের জন্য 'লুমলেশ উইভার্স কোঅপারেটিভ সোসাইটি' চালু হ'লো। তারা যাতে কমন শেডের নিচে একত্র বসে বস্ত্র উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে তার জন্য শেড নির্মাণের অর্থ এলো। কিন্তু তা এত শর্তকণ্টকিত এবং সেন্ট্রাল কো অপারেটিভ ব্যাঙ্কের দেনার ওপর নির্ভরশীল যে এই টাকার সোসাইটিগুলো শেড নির্মাণ সম্পূর্ণ করতে পারলো তো নয়ই, পরন্তু ব্যাংকে ঐ টাকা গচ্ছিত থাকায় ব্যাংকই সুদে আসলে প্রকৃত লাভবান হচ্ছে। কো অপারেটিভ গুলো এই জন্যই রক্ত শূন্যতা রোগে ভুগছে।

তাঁত সমবায়ের মজুত অর্থে জেলা সমবায় ব্যাংক স্ফীত থেকে স্ফীততর হয়ে উঠছে। ব্যাংকে যে অর্থ মজুত থাকলো তার সুদের হার সোসাইটি যা পায় আর যে টাকা তাকে ব্যাংক নির্দিষ্ট হারে গ্রহণ করতে হয় উভয়ের সুদের হারের বিশাল ফারাক, দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে হার অনেক বেশি। এই ধরনের দ্বিচারিতা রিজার্ভ ব্যাংক নির্দিষ্ট ফরমূলা বা গাইড লাইন অনুযায়ী পালন করা হচ্ছে। সুদ আদায় বা প্রদান নিয়ে সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংকগুলো 'হ্যাণ্ডলুম কোঅপারেটিভ সোসাইটি' গুলোর সঙ্গে বরাবরই বিমাতৃসুলভ আচরণ করে যাচ্ছে। এরা বর্তমান কালের নতুন আকৃতির মহাজনের ভূমিকায় অবতীর্ণ।

শেড নির্মাণ শর্তকণ্টর্কিত হওয়ায় উপযুক্ত সময়ের মধ্যে শেড নির্মাণ সম্পূর্ণ হলো না। ফলে নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় মাল মশলার দাম কেন্দ্রীয় সরকার অস্বাভাবিকভাবে

বৃদ্ধি করায় নির্মাণকার্য মাঝপথে স্থগিত হয়ে গেল। 'লুমলেশ সোসাইটি'র শেডনির্মাণের ধারণার এই ভাবেই পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটলো। অতিরিক্ত কোনও অর্থও কেন্দ্রীয় সরকার বরাদ্দই করলো না।

তন্তুবায় সমবায় সোসাইটিগুলোর শেয়ার হোল্ডারের মোট সংখ্যা যা তার এক পঞ্চমাংশও বোধ হয় কাজ পায় না। বাকিরা আদৌ কাজ পাবে কিনা তা তারা নিজেরাও জানে না তো বটেই, সোসাইটির কর্মকর্তারা প্রকাশ করবেন না। সরকারও সমবায়ের সদস্যদের কাজ পাওয়া নিয়ে মাথা ঘামায় না। সোসাইটিগুলো ছাড়া গরুর মতো চরে খাচ্ছে।

'তন্তুজ' কিংবা 'তন্তুশ্রী' কাছে সোসাইটিগুলোর প্রাপ্য প্রতিবছর লক্ষাধিক টাকা বাকী পড়ে যাচ্ছে। উৎপন্ন দ্রব্য সোসাইটির নিজ ব্যয়ে শীর্ষ সমবায় বা সংস্থার কেন্দ্রীয় গোডাউনে পৌঁছে দিয়ে আসবে অথচ নগদ মূল্য পাওয়া যাবে না। এক 'তন্তুজ', 'তন্তুশ্রী'র কেন্দ্রের কাছ হতে প্রাপ্ত অর্থ তাদের কাছে ঠিক সময়ে পৌঁছে দেয় না। অর্থদপ্তর দীর্ঘ কাল এদের প্রাপ্য কেন্দ্রীয় সাহায্য মেটায় না। যদিও কেন্দ্র সময় মতো এবং নিয়মানুযায়ী তাদের দেয় অর্থের অংশ রাজ্য সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু তা চলে যাচ্ছে রাজ্যের কোষাগারে। কারণ রাজ্যের প্রবল আর্থিক সংকট।

তাঁতশ্রমিক আন্দোলনের রাজ্যস্তরের নেতারাই এখন 'তন্তুজ' বা 'তন্তুশ্রী'র মতো প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান। এই ঘটনায় তাঁতশ্রমিকদের রাজ্যস্তরের কেন্দ্রীয় সংগঠন 'পশ্চিমবঙ্গ তাঁত শ্রমিক ইউনিয়ন' খুশি। মনে করে এখন থেকে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটবে।

তৃতীয় বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে রাজ্য ও জেলাস্তরে তাঁতশিল্প, সমবায় গুলোব কাজকর্মের দেখভাল করার জন্য 'কোঅর্ডিনেশন এণ্ড মনিটারিং কমিটি' রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পক্ষ থেকে চালু করা হয়েছিল। কিছু পরিমাণ ও সাংগঠনিক কাজে ঐ কমিটি রাজ্য ও জেলাস্তরে সক্রিয়ভূমিকাও গ্রহণ করেছিল। কিন্তু চতুর্থ বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে রাজ্যস্তরের ঐ 'কমিটি' কখনও কোন সভাই করেনি পঞ্চম বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে দুই স্তরের 'কমিটি' ও সম্পূর্ণ নিষ্ক্রীয়। সরকার, জেলাপরিষদ এবং জেলার 'সংশ্লিষ্ট আমলা মহোদয জেনেছেন উভয় 'কমিটি'র কোন অধিবেশনই আহ্বান করা হচ্ছে না। পঞ্চম বামফ্রণ্ট সরকারের ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প দপ্তর 'হস্তচালিত তাঁতবস্ত্র অধিকার'কে পর্যাপ্ত ক্ষমতা দিলেও ঐ অধিকার তৃণমূলস্তরে পৌছায় নি। আমলা নির্ভবতা এবং বিভাগীয় আমলার ইচ্ছাধীন তাঁত সমবায় গুলোর জীবন যাত্রা। যে অসংখ্য

তাঁতশ্রমিক তাঁতসমবায় গুলোর বাইরে অবস্থান করছে সমবায়বহির্ভূত সেই বিশাল কয়েক লক্ষ তাঁত শিল্পীর স্বার্থ দেখার প্রয়োজনটা বেশী। প্রথমতঃ দ্বিতীয় বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে পশ্চিমবাংলার ক্ষয়িষ্ণু এই শিল্পটিকে রক্ষার জন্য যে প্রচেষ্টা হয়েছিল বাকী তিনটি সরকারের (বামফ্রণ্ট) আমলে দেখা যাচ্ছে একটা 'গয়ং গচ্ছ' ভাব, আমলাতান্ত্রিক শিথিলতা। চতুর্থ বামফ্রণ্ট সরকারের মন্ত্রী মহোদয় তাঁতশ্রমিকদের একমাত্র রাজ্যব্যাপী সংগঠন 'পশ্চিমবঙ্গ তাঁত শ্রমিক ইউনিয়ন (সি. আই. টি. ইউ অনুমোদিত) এর সঙ্গে বৈঠক করতেন, সমস্যার কথা শুনতেন সরকারের সীমাবদ্ধতার কথাও বলতেন, 'কিছু একটা' করার প্রতিশ্রুতি দিতেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়নি কিছুই। মন্ত্রী মহোদয় যা প্রতিশ্রুতি দিতেন বা সমস্যার কথা বলতেন তা ছিল সহমর্মিতা, মমত্ববোধ এবং সহযোদ্ধার মনোভাবে ভরা। আমলাবর্গ তাঁর কথাকে গুরুত্বকে না দিয়ে আপন ইচ্ছায় চলতো। আর তৃতীয় এবং পঞ্চম বামফ্রণ্ট সরকারের মন্ত্রী মহোদয় না বোঝেন তাঁত শ্রমিকদের সমস্যা, না গুরুত্ব দেন ট্রেড ইউনিয়নকে।

আশির দশকে কেন্দ্রে রাষ্ট্রক্ষমতায় রাজীব গান্ধীর আমলে তখন সুতা-রপ্তানির জন্য বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদিত হলো দেশের আভ্যন্তরীন চাহিদার কথা মাথায় না রেখেই। দেশের সর্বাধিক প্রাচীন কুটির শিল্পটিকে অনিবার্য মৃত্যুর দিকে ঠেলে না দিয়ে যদি তাঁতীদেরকে সুলভে সুতা সরবরাহ করা হতো তবে শিল্পটি বাঁচতো। চুক্তি অনুযায়ী প্রতিবছর বিদেশে সুতা রপ্তানীর মোট পরিমাণ প্রায় ত্রিশহাজার মেট্রিক টন। সুতার আভ্যন্তরীন অভাব নিদারুণ বৃদ্ধি ঘটলো, তাঁতশিল্পীদের দুশ্চিন্তার শেষ নেই। সুতার রেকর্ডপরিমাণ মূল্যবৃদ্ধি ঘটলো পাশাপাশি 'জনতাবস্ত্র প্রকল্প' প্রত্যাহার করা হলো ফলে মোটা সুতার শিল্পীরা পড়লো চরম বিপদের মুখে। রাজ্যের গরীব মানুষ যারা কিছুটা সস্তায় কাপড় কিনতো তারাও বঞ্চিত হলো। কেন্দ্রীয় সরকার নব্বুইয়ের দশকে তাঁত শিল্পীদের স্বার্থে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঢাক ঢোল পিটিয়ে 'ইয়ার্ণ সাবসিডি স্কীম' চালু করলো যারা শেষ পর্যন্ত 'বন্যার জলে' ভেসে গেল কিছু কঠিন শর্ত জুড়ে দেওয়ার জন্য তাঁতীদের সরাসরি যে সাবসিডি পাওয়ার কথা তা মধ্যপথে কিছু 'মিড্‌ল্‌ ম্যান' এবং শীর্ষ সমবায়গুলো লাভ করলো।

এরপর এলো 'হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট' বা 'এইচ. ডি. সি' স্কীম চালু হলো কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক যা শর্তকণ্টকিত থাকায় রূপায়িত করা দুঃসাধ্য হচ্ছে। এত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও রাজ্যে হস্তচালিত তাঁতশিল্পের অবস্থা নিম্নরূপ দাঁড়িয়েছে ঃ—

১৯৯৫-৯৬ সালের সেনসাস রিপোর্ট

১। হস্ত চালিত তাঁতের সংখ্যা ৩,৫০,৯৯৪, ২। মোট শিল্পীসংখ্যা ৬,৬৬,৫১৫
৩। রেজিঃ সমবায় সমিতির সংখ্যা (৩১-১-৯৮)-২১, ৪। সমবায় সমিতির অধীন তাঁতের সংখ্যা—১,৮৩,২৫৪।

কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিরোধী নীতি তাঁত শিল্পের যেটুকু অবশেষ এখনও অবশিষ্ট আছে তা শেষ করবে। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে দ্বারপ্রান্ত বিংশ শতাব্দীর সীমান্তে উপনীত হয়ে তাঁত শিল্পকে রক্ষার জন্য সংগ্রাম এখনও চলেছে পশ্চিমবাংলাতেই, অন্যান্য রাজ্যে এই শিল্পটি পরিচালিত হচ্ছে যন্ত্রে অথচ ব্যবহৃত হচ্ছে হ্যাণ্ডলুম বা হস্তচালিত তাঁত নামে। এখনও হুগলীজেলার বেগমপুর, ধনিয়াখালি, রাজবলহাট, জিরাট, গুপ্তিপাড়া, বদনগঞ্জ, হরিপাল, নদীয়ার শান্তিপুরী ধুতি, ফুলিয়ার টাঙ্গাইল শাড়ী, সমুদ্রগড়, ধাত্রী গ্রামের মসলিন, জামদানী, বিষ্ণুপুরের, মেদিনীপুরের বেডশীট, পর্দার কাপড়, মুর্শিদাবাদ মালদার সিল্ক, (রেশম সুতা), বীরভূমের মটকা, তসর এমন বহু কীর্তি আজও বাংলার তাঁতশিল্পের গৌরব।

❑ পশ্চিমবাংলায় রেশম চাষ ও সিল্কবস্ত্রের বর্তমান চিত্র ❑

ব্রিটিশ পূর্ব ভারতে রেশম সুতার খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া। মূলতঃ মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলায় রেশম সুতার প্রয়োজনে তুঁত গাছের চাষ হয়। যে গুটিপোকা তুঁত গাছে বাসা বাঁধে সেই গুটিপোকা হতে হবে বীজানুমুক্ত। রেশমচাষের সমস্যা সম্পর্কে পশ্চিমবাংলায় অভিজ্ঞ সংগঠন, প. ব. তাঁতশ্রমিক ইউনিয়নের পশ্চিমবঙ্গ কমিটির অন্যতম সহসভাপতি মালদহের বিধায়ক শুভেন্দু চৌধুরী বলেন—"রেশম চাষের জন্য প্রয়োজন উন্নত মানের তুঁতপোকা, বীজানুমুক্ত ডিম, উপযুক্তঘর, ড্রইং চেম্বার ও রেশমগুটির বাজার। এখনও এই চাষে পুরানো মান্ধাতা আমলের পদ্ধতি বন্ধ হয় নি। আগের তুঁত মুড়াগুলো ধারাবাহিকভাবে চাষে ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে বিভিন্ন রকম প্রচেষ্টা চালিয়ে এবং উপযুক্ত রসদ লাগিয়েও চাষীর কাছে বিশেষ লাভজনক হচ্ছে না। এই চাষ যদিও কিছু ট্রাডিশনাল ও এক্সপানশান বেশী জমিতে পুরানো মুড়ারই ব্যবহার হচ্ছে। তুঁতজমিতে প্রয়োজন সবুজ সারসহ রাসায়নিক সার কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কল্যাণে আকাশছোঁয়া দামে রাসায়নিক সার চাষীদের আয়ত্বের বাইরে চলে যাচ্ছে ক্রমাগত। আবার এ চাষ সম্পূর্ণ কৃষিভিত্তিক নয় বলে ভর্তুকি থেকেও বঞ্চিত হয় তুঁতচাষীরা কীটনাশক ওষুধের সঠিক প্রয়োগ অনভিজ্ঞ চাষীদের কাছে আর এক সমস্যা।"

(পশ্চিমবঙ্গ রেশম চাষ—শুভেন্দু চৌধুরী)

শুভেন্দু চৌধুরী রাজ্য সিল্কবোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান এবং 'ওয়েষ্ট বেঙ্গল সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংকের অন্যতম ডাইরেক্টার। তিনি ঐ প্রবন্ধে লিখছেন— "একদা বিশ্বের বাজারে রেশম উৎপাদনে চীনের পরেই ছিল ভারতের স্থান এবং এটা ছিল মূলতঃ বাংলার জন্যই। ব্রিটিশ আমলে জমিদারদের খাজনার জুলুমে আর বিভিন্ন ধরনের রোগের মড়কে রেশম চাষীরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে অন্য ফসলে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধোপকরণ তৈরীর জন্য রেশম সুতো প্রয়োজন হলে এবং জাপান রেশম রপ্তানী বন্ধ করলে এই চাষের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় বেশ কিছুটা। কিন্তু স্বাধীন ভারতে এই শিল্পকে গড়ে তোলার সুসংহত কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় নি বলে উৎপাদনে ভাঁটা পড়ে। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর পরিকল্পিত প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে এই কৃষিনির্ভর শিল্পকে গড়ে তোলার।

নতুন পরিস্থিতির গোলক ধাঁধায় ঃ—এটা ঘটনা যে স্বাধীনতার পঞ্চাশবছর উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও বাংলার রেশমচাষীরা এখনও কোন আশার আলো দেখতে পায় নি। এটা দুর্ভাগ্য এই জন্য যে, পশ্চিম বাংলা রেশম চাষে সারা ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় চতুর্থস্থানে। আর একসময় তার স্থান ছিল প্রথম। ভারতবর্ষের থেকে দুবছর পরে স্বাধীনতা পেয়েছে যে চীনদেশে সে আজকে রেশম চাষে এবং সিল্কবস্ত্র উৎপাদনে বহুকাল পূর্বেই ভারতকে ছাড়িয়ে গেছে, জাপান তো অনেক আগেই উন্নতি করেছে এবং ভারতকে টেক্কা দিয়েছে। ভারতে রেশম চাষ এবং সিল্ক বস্ত্র উৎপাদনে দেশীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিরা নিজেদের অবস্থান অধিকতর শক্তিশালী করেছে বিদেশের কাছে আমাদের দেশে বাণিজ্য করার জন্য দরজা হাট করে খুলে দেওয়ার জন্য বহুজাতিক কোম্পানীগুলো রেশমচাষ এবং রেশম সিল্ক বস্ত্র উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ কব্জা করে ফেলেছে। ইংরাজ ভারতে 'ফ্রি ট্রেড' এর অনুমোদন বা সনদ পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাংলার রেশম বস্ত্র উৎপাদন যেরূপ অবস্থায় ছিল ইংরাজ ছদ্মবেশ প্রত্যাহার করে এদেশের বুকে পাকাপাকি শাসকরূপে অধিষ্ঠিত হলো এবং এ সময়ের পরে পরেই রেশম বস্ত্র উৎপাদনের যে হাল দাঁড়াল এবং ব্রিটিশ এদেশের শাসনভার ভারতীয় সতীর্থ পুঁজিপতি ও বৃহৎ জমিদারশ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিভু কংগ্রেস দলের হস্তে অর্পণ করার পর রেশম চাষ ও রেশম সিল্ক বস্ত্র উৎপাদনের যে ক্ষীণতম করুণাকাঙ্ক্ষী দশা জনগণের সম্মুখে সমুপস্থিত হয়েছে তা বিবেচনা করলে হতাশার ভাবই পরিষ্কার ফুটে ওঠে। কেন্দ্রীয় সরকারের উদার বৈদেশিক বাণিজ্য নীতিই এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী। একটা বোবা কালা সরকার রয়েছে কেন্দ্রে যারা কোন মতামত নিতে চায় না।

যুগের ও বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। মধ্যযুগের তাঁতশিল্পীরা যখন ছিল বেগার বা ক্রীতদাসের সমতুল্য তখনকার পরিস্থিতি ছিল যেরকম, বর্তমানকালেব পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত। বর্তমান কালে বেগার প্রথাও নেই, ক্রীতদাস প্রথাও নেই। শ্রমশক্তির মূল্য কিন্তু ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। তাঁত শ্রমিকদের তখন নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার কোন পথ ছিল না। দৈহিক অত্যাচারের মাত্রা ছিল যেমন চরমে, তেমনিই তন্তুবায়ীদের কর্মকুশলতা, উৎকর্ষতা ও দক্ষতাও ছিল চরমে। সমস্ত শ্রমশক্তি ব্যবহৃত হতো নবাব বাদশাহ-সামন্ত নৃপতি-জমিদারদের স্বার্থ রক্ষার্থে এবং সমস্তটাই নিঙড়ে নেওয়া হতো। বর্তমান কালে ভিন্ন পরিস্থিতিতে তন্তুবায়ীরা নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে শীর্ষসমবায় 'তন্তুজ' এবং 'তন্তুশ্রী'র ওপর। আবার 'তন্তুজ', 'তন্তুশ্রী' নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে রাজ্য সরকারের ওপর। সমবায় বহির্ভূত ও সমবায়ভুক্ত কয়েকলক্ষ তন্তুবায়ী যাতে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে যাতে বিপণন ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বিত হয় তার প্রতি দৃষ্টি পড়ছে কম।

তাঁতশ্রমিকদের আন্দোলনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় যারা পরগাছা (Parasite) বলে চিহ্নিত সেই সমস্ত 'জোঁক' মহাজন এখনও 'তন্তুজ', 'তন্তুশ্রী'র আঙ্গিনায় কখনও প্রকাশ্যে কখনও বা ছদ্মবেশে নিজেদের ব্যবসায়ের স্বার্থে ঘোরাঘুরি করছে। এরা ধনিয়াখালি বা রাজবলহাটের নামে ধুতি বা শাড়ি সংগ্রহ মজুত করে মেদিনীপুরের অখ্যাত গ্রাম থেকে ও তার ওপর 'ষ্ট্যাম্পিং' করে 'শীর্ষসংস্থা' বা সমবায়ের কাছে জমা দেয়। 'তন্তুজ' বা 'তন্তুশ্রী' যারা কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করে, রাজ্যসরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ হতে ভর্তুকী পায় যাদের বিশাল প্রশাসনিক পরিকাঠামো, এই দুই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই ব্যর্থ হতে চলেছে। এখন বলা হচ্ছে 'তন্তুজ', 'তন্তুশ্রী' বা 'মঞ্জুষার' ওপর নির্ভরশীল না হয়ে সোসাইটিগুলো নিজের পথ দেখে নিক। এই প্রতিষ্ঠান গুলো প্রতিষ্ঠার পিছনে তন্তুবায় সমবায় সমিতিগুলোর অবদান অনস্বীকার্য। তন্তুবায় সমবায় সমিতিগুলোকে পরিচালনার কাজে সাহায্য করার কথা ঐ দুই প্রতিষ্ঠান থেকে। রাজ্যে সরকারী হিসাবেই হ্যাণ্ডলুমের সংখ্যাই প্রায় চারলক্ষ এবং তাঁতশিল্পীর সংখ্যাই প্রায় সাতলক্ষ।

এখনও বিশাল সংখ্যক তন্তুবায়ী বল্গাহীন দারিদ্রের মধ্যে বাস করছে, মাথার ওপর এদের অনেকেরই কোন ছাদ নেই। অসংখ্য শিশুশ্রমিক কাজ করে এই শিল্পে যাদের বয়স চৌদ্দবছরেরও কম। এরা অতি সামান্য আয় করে অক্ষম বা স্বল্প আয় সম্পন্ন পিতা-মাতার হাতে তুলে দেয়। তাঁতশিল্পী বা তাঁত শ্রমিকরা চিন্তায় বা চেতনার মনে অনেক পশ্চাদপদ। কুসংস্কারাচ্ছন্ন বা ধর্মীয় অনাবশ্যক আচার আচরণে অভ্যস্ত। যার

জন্যে অনগ্রসর চিন্তার এই বিশাল সংখ্যক শ্রমিকদের অন্তরের কোণে বাসা বাঁধতে সক্ষম হল মৌলবাদী চিন্তা। রুটির লড়াইকে রাজের লড়াইয়ে রূপান্তরিত করার সংগ্রামের ময়দানে বা সরকার পরিবর্তন বা বাছাই করার সময় এরা নেচিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করে অনেক সময়েই প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদী সামন্ত মহাজনী শোষণ ব্যবস্থার পাহারাদারদের প্রচারে বিভ্রান্ত হয় নির্বাচনে জয়যুক্ত করে। নতুন সহস্রাব্দে প্রবেশের পর গ্রামীণ অর্থনীতির দ্বিতীয় প্রধান ভরসা গ্রামীন কারিগরদের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। কামার, কুমোর, তাঁতি, মৃৎশিল্পী বা চর্মকাররা যে গভীর সমস্যাবলীর সঙ্গে লড়াই করে অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে তাদের ক্রিয়া কর্মের সঙ্গে জনপ্রযুক্তির মেল বন্ধন ঘটাতে হবে। ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লবের পর যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল তার ধাক্কায় ভারতবর্ষের হস্তচালিত তাঁত শিল্প এবং কৃষকরা চরম সর্বনাশের মুখে দাঁড়িয়ে যায়। ভারতে শিল্পবিপ্লবও ঘটে নি, কিন্তু সামন্তবাদ এবং পুঁজিবাদের মেলবন্ধন ঘটেছে। সাম্রাজ্যবাদী লগ্নীপুঁজির ব্যাপক বিনিয়োগ ঘটছে। ইতিমধ্যেই শিল্পবিপ্লবের থেকে উত্তরণ ঘটেছে বিজ্ঞান ও জনপ্রযুক্তি বিপ্লবের যুগে। অভাবনীয় সব অবিষ্কার ঘটে চলেছে একের পর এক।

হস্তচালিত তাঁত শিল্পীরাও নতুন যুগের আবিষ্কৃত আধুনিক উপকরণের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ব্রিটিশ শক্তির বিজয় লাভের পূর্ব পর্য্যন্ত এবং ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনাবলীর পর সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দী জুড়ে কেবল বিদ্রোহ আর দুর্ভিক্ষের কাল শেষ করে ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন প্রবেশ করে তখন বাংলার যাবতীয় নিজস্ব শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। ইউরোপে তখন শিল্পবিপ্লব ঘটেছে। ইংলণ্ড যখন শিল্পোন্নত দেশ তখন ভারত তার শিল্প গরিমা হারিয়ে বসেছে। কৃষি প্রধান দেশে পরিণত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে যে পরিবর্তন সাধিত হয় তাকে অতিক্রম করে বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পঞ্চাশ বছরের অগ্রগতি ক্ষীয়মান। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটে যায় তার প্রভাব বা প্রতিফলন গ্রামীণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে না ঘটায় গ্রামীণ কারিগরদের তিমির যুগের অবসান হলো না। বাংলার গ্রামীণ কারিগর তাঁতী, কামার, কুমোর, চর্মকার প্রভৃতি পেশা ও জীবিকার মানুষদের স্বার্থ রক্ষার্থে 'গিল্ড' ব্যবস্থা থাকলেও এদের কর্মশালাগুলো ইউরোপের মতো 'গিল্ড' রূপে গড়ে ওঠে নি। বিজ্ঞানের গবেষণাগারগুলোর সঙ্গে এদের শিল্প প্রতিভার কোন যোগসূত্র বা মেলবন্ধন ঘটে নি। শিল্পবিপ্লব ইংলণ্ডে অভিজাত শ্রমিকশ্রেণীর জন্ম দিয়েছিল। আর বাংলার তাঁত শ্রমিকদের পরণে পরিধেয় বস্ত্র জুটতো না, জীপন যাপন ছিল ঘন তমিস্রাচ্ছন্ন।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী অতিক্রান্ত হয়েছে। বেশীর ভাগ তাঁতশিল্প ও শ্রমিক পরিবার এখনও দারিদ্র সীমারেখার নীচে অবস্থান করছে। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, মহামারী আর বিনাচিকিৎসার অভিশাপ দূর হয়নি, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য নিয়ে যে সমস্ত আবিষ্কার চলছে তাঁত শিল্পীদের কাছে তা পৌঁছায় নি। রিক্ত তন্তুবায়ীদের কাছে গবেষণালব্ধ কর্মকাণ্ড না পৌঁছানোর জন্য দায়ী সরকারী লালফিতার ফাঁস। সরকার থেকে মাসে এক লিটার কেরোসিন দেওয়া হতো কেবল হুগলী জেলায়। অথচ কেরোসিন তেল তাঁত শিল্পীদের অতি প্রয়োজনীয় এক উপকরণ তাও বন্ধ হয়ে গেল। ইদানীং তাঁত শ্রমিকদর মধ্যে যারা সমবায়ের অধীনে কাজ করে তাদের জন্য 'হাউস কাম ওয়ার্কশেড', চশমা, টি-বি রোগীদের জন্য চিকিৎসা, 'পেনশন', তাঁত ঘবে বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য দুটি তাঁত পর্যন্ত 'গার্হস্থ্যহার' আদায় করা সম্ভব হলেও এর বেশি সীমাবদ্ধ পরিস্থিতিতে আদায় হওয়া সম্ভব নয়। 'ইমপ্রুভড্ অ্যাপ্লায়েন্স' দেওয়া হয় কিছু। তাঁতীদের ঘরে অপ্রচলিত শক্তির উৎস আমরা পৌঁছে দিতে পারি নি। এতদ্সত্বেও তাঁতশ্রমিকরা বা তাদের সমবায় গুলোকে সরকার বা সরকার অধিগৃহীত সংস্থা বা শীর্ষ সমবায়ের উপর নির্ভরশীল না হয়ে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট। কেন্দ্রিয় সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল 'হ্যাণ্ডলুম ভিলেজ' প্রতিষ্ঠার। রাজ্য প্রতি বছরে একটি গ্রাম যা তাঁতশিল্পী অধ্যুষিত তা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চিহ্নিত করে তার পরিকাঠামো গড়ে তুলতে কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য করবে। লক্ষ্য সেই গ্রামটির সার্বিক উন্নযন। পথঘাট, বিদ্যুৎ, পানীয়জল, শিক্ষা, জলস্বাস্থ্য তো আছেই যাতে ঐ গ্রামের তাঁতশিল্পীরা স্বনির্ভর হয়ে যায় তার জন্য যাবতীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ, ঋণদান, মার্কেটিং, সুতা প্রাপ্তি সবকিছুই সহজলভ্য হয়ে যাবে। উদ্যোগটি প্রশংসনীয়। তবে সাম্রাজ্যবাদীদের পৃষ্ঠপোষিত আই-এম-এফ, বা 'বিশ্বব্যাংক' এর নির্দেশ মেনে চললে এই উদ্যোগ ব্যাহত হবে। এখন এই স্কীম শিকেয় উঠেছে।

স্বনির্ভরতার পথ কষ্টকুসুমিত, নরম আস্তরণ নেই। কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রথমেই বিদেশের বাজারে কার্পাস তন্তু রপ্তানী বন্ধ করতে হবে। আভ্যন্তরীন চাহিদা উপেক্ষা করলে স্বদেশী ভাবনা প্রসারিত হয় না। দেশের তন্তুবায়ীদের হাতে সুতা প্রাপ্তি যাতে সহজ লভ্য এবং তা অবশ্যই সুলভমূল্যে হয় তার প্রতি অগ্রাধিকার দিতে হবে। এরপর প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ, মজুরীবৃদ্ধি, উৎপন্ন বস্ত্রের ন্যায্যমূল্য এবং বাজার সৃষ্টির

সুযোগ করে দেওয়া কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষেই সম্ভব। পরিবারের সন্তানদের মধ্যে যারা শিশু বা কিশোর তাদের যাতে পড়াশুনা ত্যাগ করে তাঁতঘরে ঢুকতে না হয় তার জন্য আর্থিক সহায়তা দান করতে হবে। মহিলারা মাতৃত্বকালীন চিকিৎসা ও ভরণপোষণের সুযোগ পায় তার প্রতিও প্রখর দৃষ্টি দিতে হবে। তাঁতশিল্প যে বিরাট সম্পদ, আমাদের দেশের গ্রামীণ অর্থনীতির অন্যতম উৎস তা স্বীকার করে সরকারের দপ্তরকে সক্রিয় হতে হবে।

রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী ডঃ শংকর সেন গত ৬ই ফেব্রুয়ারী' ৯৯ 'গণ শক্তি' পত্রিকায় প্রকাশিত 'জ্ঞান ও প্রয়োগের ভবিষ্যতে দ্রুত পৌঁছানোর অঙ্গীকার শীর্ষক নিবন্ধে নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন।

"........এদেশের গ্রামীণ কারিগরেরা সংগঠিত শিল্পের সঙ্গে বছরের পর বছর অক্লান্ত লড়াই করে ক্লান্ত হয়ে পেশা ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। গ্রামীণ অর্থনীতি এর ফল সাঙ্ঘাতিক। বিংশ শতাব্দীর শেষে এসেও আমরা.......বিকল্প প্রয়োগ করতে পারলাম না।

".........দেশে বিদেশে বিকল্প প্রযুক্তি নিয়ে শয়ে শয়ে গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে—কিন্তু তাকে মানুষের কাছাকাছি নিয়ে যাবার জন্য যে পরিকল্পনা ও উদ্যোগ দরকার তা কখনোই নেওয়া হয়নি। সরকারী লালফিতের বাঁধন, গবেষণা ও উন্নয়ন ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যবধান দূরে থাক, তাকে ক্রমশঃ বাড়িয়ে তুলছে।

"আমাদের মতো কিছু মানুষ এখনও আছেন যাঁরা কৈশোর বা যৌবনে দেশটাকে পরাধীন থাকতে দেখেছেন। সে এক দুঃসহ গ্লানি। পৃথিবীর বুকে নতুন সহস্রাব্দে যদি আমাদের মাথা উঁচু করে থাকতে হয় তাহলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতার কোন বিকল্প নেই। স্বনির্ভরতা আসলে হলো একটা মূল্যবোধ যা ভাষণ দিয়ে অর্জন করা যায় না। তারজন্য নিজের উপর আস্থা রেখে ঘাম ঝরাতে হয়। দেশের মধ্যে কিন্তু উল্টো ভাবনার স্রোত বইছে। যা কিছু বিদেশী তা যেমন পরিত্যক্ত নয় তেমনি আমাদের দেশের মানুষের মেধা, উদ্যমকে অবহেলা করাটাও কোন কাজের কথা নয়। এই কথাটা মাঠে নেমে প্রমাণ করে দেখাতে হবে।

"কেউ একাজ একা করতে পারবে না। আবার সরকার সবকাজ করে দেবে এই ভাবনাটাও পিছিয়ে দেবে আমাদের। তাই ছোট ছোট উদ্যোগ নিয়ে ছোট ছোট ক্ষেত্রে এখনই মাঠে নেমে পড়তে হবে যে গুলি একত্রিত হয়ে আগামী দিনে বড় পরিবর্তন এনে দেবে।"

❑ প্রাসঙ্গিকী ❑

আমরা এই গ্রন্থের সূত্রপাতে যে আলোচনা উপস্থাপনা করেছিলাম সেই অংশের মধ্যে আলোচনা করতে হবে কি কঠিন পরিস্থিতির মুখে দাঁড়িয়ে তাঁতশিল্পীরা সে যুগে লড়াই চালিয়ে এসেছে। মধ্যযুগে বাংলার তাঁতশিল্পীরা মহামূল্যবান যে মসলিন ও রেশম শিল্পবস্ত্র উৎপাদন করতো তা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এবং তুরস্ক, আরব এবং পার্শিয়াদেশে রপ্তানী হতো। আভ্যন্তরীন বাণিজ্যও রমরমা ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে হিন্দু, মুসলিম, আর্মেনিয়ান বণিকরা রপ্তানী বাণিজ্যে অত্যন্ত পারদর্শী বা দক্ষ ছিল। বাংলার নবাবরা যতই স্বেচ্ছাচারী হক না কেন, এ ব্যাপারে তাঁরা উৎসাহই দিতেন। হিন্দুস্তানের শাসক মোগল সম্রাটও বাংলা থেকে এই শিল্পজাত পণ্য আমদানী রপ্তানীর ব্যাপারে করেব অনেক ছাড় দিতেন। স্থলপথ, জলপথ দিয়ে বাংলায় প্রবেশ এবং বহির্গমনের সমস্ত সুযোগই দেশীয় বণিকরা লাভ করতো।

ঐতিহাসিক ORME তাঁর বিখ্যাত Fragments of the Mughal Empire গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন দিল্লী এবং ইউরোপের বাজারে বাংলার বস্ত্রশিল্পের কদরের কথা।

"Bengal by its situation and productions has the most extensive commerce of any province of the Empire Delhi is from hence supplied with all its linens and silks, raw and manufactured, with cloth, sugar, grain etc. The European nations make their largest and most valuable investment here"

বাংলার নবাব আলিবর্দী খাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এমনকি দৌহিত্র নবাব সিরাজ উদদৌল্লার আমলেও (পলাশীর যুদ্ধ পূর্বপর্যন্ত) বাংলার তাঁতশিল্পীরা ইংরাজ আমলের তুলনায় অনেকে স্বাধীনভাবে কাজ করতো ("used to manufacture their goods freely and without oppression, restriction, limitations and prohibitions.")।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলায় সুতিবস্ত্র এবং মসলিন বস্ত্রেব বাজার দখল করা নিয়ে প্রায়শই লড়াই বেঁধে যেতো ইংরাজ, ডাচ, ফ্রেঞ্চ স্পেনীয়, এশিয়া আর্মেনিয়ান এবং ভারতীয় বণিকগণের মধ্যে। এই বণিকগণ ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য নিজ নিজ দেশের রাজার কাছ হতে সনদ নিয়ে এসেছিল কোম্পানীর মাধ্যমে। আলিবর্দী বরাববই বাজার দখলের লড়াইয়ের মধ্যে প্রবেশ করতেন না। নিরপেক্ষ ভূমিকা অবলম্বন করতেন। যদিও ইংরাজ বিদ্বেষী ছিলেন। তা সত্ত্বেও বিদেশীরা নবারের কাছে অভিযোগ উত্থাপন

করলে তিনি দোষীকে কঠোর সাজা দিতেন। এইরকম একটি ঘটনা ঘটে ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রকমোডক গ্রিফিনের বিরুদ্ধে মোগল এবং এশিয়ার আর্মেনিয় বণিকরা অভিযোগ দায়ের করে। নবাব আলিবর্দী ইংরাজ কোম্পানীর কলকাতাস্থিত গভর্ণর মিঃ বারোয়ালের কাছে গ্রিফিনের বিরুদ্ধে পরোয়ানা পাঠান। পরোয়ানায় নবাব গ্রিফিন কর্তৃক লুণ্ঠিত সমস্ত মালপত্র মোগল ও আর্মেনিয়ানদের ফেরৎ দেওয়ার নির্দেশ দেন, নচেৎ কঠোর শাস্তির মুখোমুখি হতে হুমকী দেন। পরোয়ানায় বর্ণিত নির্দেশনামা ছিল নিম্নরূপ ঃ—

"There merchants are the kingdom's benefactors; Their imports and exports are an advantage to all men and their complaints are so grievious that I can not forseen any longer giving ear to them, As you are not permitted commit piracies, therefore, I now wite you that on receipt of this, you deliver up all the Merchant's goods and effects to them as also what appertains upto me; otherwise you may be assured a due chasntisement in such manner as you least expect."

নবাব আলিবর্দীর কাছে ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে প্রত্যুত্তর দেয় তাতে নবাবের ক্রোধ জন্মায়। ইংরাজ মিথ্যা ভাবে জানায় হিন্দুস্তানের রাজার জাহাজই ঐ বণিকদের বাণিজ্যদ্রব্য বাজেয়াপ্ত করেছে। তাদের (ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী) ঐ জাহাজগুলির ওপর তো কোন নিয়ন্ত্রণই নেই। নবাব ইংরাজদের এই প্রত্যুত্তর অগ্রাহ্য করে স্বীয় আদেশ বহাল রাখলে ইংরাজবণিকরা শেষাবধি আর্মেনীয়দের কাছে লুণ্ঠিত মাল ফেরৎ দিয়ে আসতে বাধ্য হয়।

আলিবর্দীর জীবদ্দশায় ইংরাজরা একই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপীয় বণিককুল ফরাসী, ওলন্দাজ, স্পেনীস, পতুর্গীজ, প্রুশিয়ান, ডেনিস্ প্রভৃতিদের সঙ্গে অপরদিকে আর্মেনীয় (এশিয়) ভারতের মোগল, পাঠান এদ্দের সকলের সঙ্গেই বাণিজ্য করার অধিকার, বাজার দখল করার অধিকার নিয়ে সশস্ত্র লড়াইয়ে মত্ত হয়। ইংরাজ বণিকরা তাদের গোমস্তাদের 'আড়ং' গুলোয় পাঠিয়ে দিত যাতে একটু বেশি বা বর্ধিত হারে দাম দিতে হলেও তা দিয়ে বস্ত্র সম্ভার সংগ্রহ করা যায়। এর ফলে অবশ্য তন্তুবায়ীদের কিছু সুবিধা হয়ে যায়। তারা বিভিন্ন উৎপন্ন বস্ত্র (হস্তচালিত তাঁত বস্ত্র) যে কোন বণিকের কাছে বিক্রয় করে দেয়। যার কাছে বেশি দাম পাবে তার কাছেই পণ্য বিক্রী করে দেয়। এর ফলে ইংরাজরা সমূহ অসুবিধায় পড়ে, কারণ তারা বাধ্য হয় বেশি দামে

বস্ত্র ক্রয় করতে। আর ক্রীত বস্ত্রে গুণগত মানও যথেষ্ট নিকৃষ্ট হয়। ("as the French and the Dutch, by having made larger contracts for them enhanced their prices, as a result of competition the company was compelled from time to purchase cloths of inferior quality")। তাঁতীরা কিছুটা উপকৃত হলো সাম্রাজ্যবাদী বণিকদের অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে কারণ তারা তাদের শ্রম নিঙড়ে উৎপাদিত বস্ত্রের কিছুটা বেশি দাম ইংরাজ ব্যতীত অন্য বণিকদের কাছে হতে পেতে থাকলো। এই অবস্থা চললো ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত।

মোগল সম্রাট, অযোধ্যার নবাব, দক্ষিণে নিজাম, বাংলার আলিবর্দী এমন সব পরিবারের জন্য যে উৎকৃষ্ট মসলিন বস্ত্র তৈরীর প্রয়োজন ঘটতো তার জের চললো পলাশী যুদ্ধের পর আর মাত্র দুবছর। তারপরেই এই যুগের সমাপ্তি। এর মধ্যেই শুরু হয়েছিল ঐতিহাসিক 'সন্ন্যাসী বৈরাগী বিদ্রোহ'। মোগল রাজত্ব ধ্বংসের যুগে ১৭৩৯-৫৯ খ্রীঃ এর মধ্যে নবাবী স্বাধীনতারও সমাপ্তি। মুঘল (বা মোগল) আমলে বাংলাব বস্ত্রসম্ভার সমগ্র ভারতবর্ষে যে কোন বন্দরে প্রবেশ করতো। কোন একটি বন্দরে কর (Customs) দেওয়া হলে ভারতবর্ষের কোন বন্দরে এক বৎসরে আর কর দিতে হতো না। বিরাট বলদের গাড়িতে ভর্তি করে ঐ পণ্যসম্ভার সারা দেশের নানান শহরে গঞ্জে বণিকরা লেনদেন করতো।

গিল্ড ব্যবস্থা

ভারতবর্ষের প্রধান শিল্প বলতে তৎকালীন যুগে হস্তচালিত তাঁতে মসলিন বস্ত্র শিল্পকেই বোঝাত। তাঁত শ্রমিকরা প্রথমে পেশাভিত্তিক জাতি রূপেই পরিচিত ছিল। জাতিভেদ প্রথা যা মধ্যযুগে ছিল প্রবল তার মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত ছিল তাঁতীরাও। সামাজিব ক্রিয়াকলাপও চালু ছিল জাতিভেদ প্রথা মান্য করে। অন্য জাতি বা পেশার মানুষের এই পেশা বা জাতির সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু উপনিবেশবাদীদের পুঁজির লগ্নীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর থেকেই জাতিভেদ প্রথার দুর্লঙ্ঘ প্রাকারের অচলায়তন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। জীবিকার আশায় গোটা সমাজের সম্পত্তিই নিয়োজিত হতে থাকলো তাঁতশিল্পে। তৈরী হলো ইউরোপীয় কায়দায় 'গিল্ড' প্রথা, অনুকরণ করতে শিখলো তাঁতীরা। চালু হলো নিয়ম সমাজে যারা এই শিল্প পেশাদারী রূপে গ্রহণ করবে তাদের একটা সংগঠনের আওতায় আনতে হবে। চালু হলো 'প্রবেশ মূল্য', কাজের ঘণ্টা, বার্ষিক ছুটি এবং অন্যান্য নানাপ্রকার বিধিব্যবস্থা। যাতে যে কেউ ইচ্ছা করলেই আর শিল্পে প্রবেশ করতে না পারে। পাশাপাশি চালু হয়েছিল শ্রমবিভাগ। 'গিল্ড' সদস্য

তাঁতশিল্পীরা অবশ্য স্বাধীনতাও ভোগ করতো। তাদের নিজেদের দু একটা কি দুচারটে তাঁত থাকতো পেশায় একটা কৌলিন্য ছাপ পড়তে শুরু করলো। ইংরাজ বণিকরাও এই প্রথায় উপকৃত হতে থাকলো। উৎকৃষ্ট মানের বস্ত্র পাওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধা সৃষ্টি হলো। সাধারণ ক্রেতা বিক্রেতারা মুখোমুখি হওয়ায় নিকৃষ্ট মানের বস্ত্র উৎপাদনে নানা বাধা সৃষ্টি হওয়ায় তাঁতবস্ত্রের গৌরব বৃদ্ধি পেল।

কিন্তু শ্রমিকদের মজুরী-বৃদ্ধি ঘটলো না। তাঁতশ্রমিকদের অবস্থার কোন হেরফের তো হলোই না, বরং তাদের আর্থিক পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটতে থাকলো। 'মাষ্টার উইভার' বা দক্ষতাঁতীও অত্যন্ত স্বল্প মজুরীতে শ্রম দিতে বাধ্য হতে থাকলো। উৎকৃষ্ট বস্ত্র উৎপাদনে মুখ্যভূমিকা ছিল যাদের সেই সমস্ত দক্ষ শ্রমিকরা পেটের দায়ে একটুকরো পরিধেয় বস্ত্র খণ্ডের জন্য পাগলের মতো হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকলো, কাজ পাওয়ার তাগিদে বেগার শ্রম দিতেও রাজি হতো। পলাশীর যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ বিজয়ী হওয়ার পর পরই এই ঘটনা ঘটতে থাকলো। 'গিল্ড প্রথা' ভেঙে আবার চুরমার হয়ে গেল। তাঁত শিল্প বা দু'একটা লুমের মালিকরা তাঁতবিহীন তাঁত শ্রমিকের পর্যায়ে খুব দ্রুত পৌঁছে গেল। ইংরাজ প্রবর্তিত 'গিল্ড প্রথা'য় তাঁতীরা নিজস্ব তাঁত বস্ত্র সম্ভার উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনে শিক্ষানবীশ বা 'অ্যাপ্রেন্টিশ' নিয়োগ করতো। এদের পরিচয় ছিল 'নিকারী'। শ্রমবিভাজনে এদের নিয়মিত শ্রমিক বলা যেতো না এবং এই কাজে সধারণতঃ শিশু ও কিশোরদের কাজ শেখার অছিলায় এদের পুরা শ্রমশক্তি নিঙড়ে নেওয়া হতো। গ্রামে গ্রামে সৃষ্টি হলো 'নিকারী পাড়া' বা সমাজে নিকৃষ্টের বাসভূমি।

'ইংরাজ কুঠিয়ালরা নিয়োগ করতো 'কারিগর' (বা জার্নিম্যান), 'বণিক' (বা মার্চেণ্ট) 'ফোরম্যান', 'ওয়ার্কম্যান'। ক্রমশঃই জটিল হযে পড়লো সমগ্র উৎপাদন পদ্ধতি এবং বস্ত্রবাণিজ্য। তন্তুবায়ীরা হারিয়ে ফেললো তাদের স্বাধীনতা। অর্থের প্রয়োজনে ইংরাজ বণিকদের দাসত্ব স্বীকার করে তাদের 'আড়ং'য়ে নাম নথিভুক্ত করে 'রেজিষ্টার্ড' তাঁতী বনে গেল। নামের পরিবর্তে পরিচিত হতে থাকলো সংখ্যায় (বা নাম্বারে)। কোম্পানীর কাছ হতে আগাম (বা অ্যাডভান্স) দাদন গ্রহণ করে জাত ব্যবসায়ে টিকে থাকার শেষ চেষ্টা শুরু করলো। কোম্পানী নিয়োগ করলো 'দাদনীমার্চেণ্ট' যাদের মাধ্যমে 'ইনভেষ্টমেন্ট' প্রক্রিয়া চালু হলো।

আর যে সব তাঁতী তখনও ইংরাজ কুঠিয়ালের খাতায় নাম নথিভুক্ত করে গোলামে পরিণত হতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে তারা অর্থ লগ্নীর জন্য মহাজনের দ্বারস্থ হয়। ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে 'মহাজনী' প্রথা। মহাজনরা মজুরীর বিনিময়ে নিয়োগ করে 'পাইকার',

দক্ষ শ্রমিক (বা মুকিম), বস্ত্র শিল্পে মহাজনের উদ্ভব ঘটলো পলাশীযুদ্ধের পরবর্তীকালে তাঁতী এবং মহাজন একই গ্রামের অধিবাসী হলেও মহাজন তাঁতীদেরকে চরম শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট করে আখের সমস্ত রস বার করার মতো সমস্ত শ্রমশক্তি বার করে 'ছিবড়ে' করে ফেলে দেয় যখন সেই তাঁতীর আর শ্রমশক্তি বলতে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তাঁতশিল্পী তার দক্ষতা বিসর্জন দিয়ে বাঁচার জন্য সন্ন্যাসী ফকির বৈরাগীদের দলে ভীড় করতে থাকে।

দাদনী মার্চেন্ট থেকে গোমস্তা ঃ—কোম্পানী অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষে সারা বাংলায় অসংখ্য ফ্যাক্টরী (কারখানা) এবং আড়ং চালু করলো ফলে অন্যান্য ইউরোপীয় পুঁজিপতিরা কিছুটা পিছিয়ে পড়লো। বাজার দখলের লড়াইয়ে ইংরাজদের মোকাবিলা করতে না পেরে অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকরা পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়। ইংরাজ কুঠিয়ালরা তাঁতশিল্পের সর্বনাশ সাধনের জন্য যে সব 'দাদনি মার্চেন্ট' (বা 'মিড্‌ল্ ম্যান) নিয়োগ করেছিলেন তাদের মধ্যে যারা তাঁতীদের ওপর দিয়ে যথাযথ ভাবে শোষণ যন্ত্রটা চালাতে পারতো না তাদেরকে কঠোর শাস্তি পেতে হতো। যে সমস্ত বস্ত্র কুঠিতে 'দাদনি মার্চেন্টদের তত্ত্বাবধানে মজুত হতো কুঠিয়ালের তা 'মন পসন্দ' না হলেই দাদনি মার্চেন্টের ওপর জরিমানা ধার্য্য হতো, তাঁত জামানত বাজেয়াপ্ত হতো, এমন কি তাঁকে গ্রেপ্তার করে আটক রাখা হতো। এ ব্যাপারে কোম্পানীর কুঠিয়ালরা কোন মীমাংসা মধ্যস্থতা মানতে রাজী হতো না, যা সিদ্ধান্ত করার তা তারা গ্রহণ করতো কুঠির মধ্যেই-তার বাইরে যেতো না। বিচার-আচার কুঠিতেই হতো, শাস্তিদানও চলতো একই জায়গায়।

'দাদনি মার্চেন্ট'রা ছিল সকলেই বাঙ্গালী, এদের অনেকেই ফরাসী ও ওলন্দাজ কোম্পানীর অধীনেও 'দাদনি মার্চেন্ট' এর চাকুরী করতো। ঐ দুই ইউরোপীয় বণিককুল ইংরাজদের থেকে অনেক সহজ শর্তে 'দাদনী মার্চেন্ট' দের অর্থের জোগান দিত, ভাল ব্যবহার করতো। ফলে অনেক দেশীয় মার্চেন্ট ইংরাজ কুঠিয়ালের সঙ্গে সম্পর্কই ছিন্ন করতো, ব্যবসার পাট চুকিয়ে দিত।

ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী 'দাদনী মাচেন্ট'দের ব্যাপারে কিছুটা অস্বস্তিতে পড়লো। প্রয়োজনীয় এবং কাঙ্খিত মসলিন, সুতি ও সিল্ক বস্ত্রের প্রাপ্তিযোগ না ঘটায় এই প্রথাই বাতিল করে চালু করলো 'গোমস্তারাজ'। গোমস্তারা সরাসরি তাঁতীদের কাছ হতে সংগৃহীত বস্ত্রসম্ভার তুলে দিত কুঠিয়ালের হাতে অবশ্য তাতেও কোম্পানী সন্তুষ্ট হয়নি। গোমস্তাদেরও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতো না। লণ্ডনস্থিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সদর দপ্তর 'ইণ্ডিয়া হাউস' থেকে কোম্পানীর ডিরেক্টরস বোর্ড কলকাতার ফোর্ট উইলিয়মে অবস্থিত

'ক্যালকাটা কাউন্সিল'কে নিম্নোক্ত মর্মে নির্দেশ বার্তা প্রেরণ করে ঃ—

"Great care must be taken not to risque too much of owestate at a time in the gomasta's hands and that they give at all times sufficient and undouted security to be answerable for what they are entrusted with and that not withstanding your method of sending a Cash Keeper with the gomosta, why waty of a check keeps one key of the Cash Chest yet the gomosta is be accountable for all the money you advance him"

'গোমস্তারাজ' চালু করেই যে কোম্পানীর শোষণ যন্ত্রটা ঠিকঠাক চলছিল তাও নয়। তবে পূর্বের অপেক্ষা নিষ্ঠুরতা বৃদ্ধি পেল। গোমস্তারা নিজেরাই প্রবল দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে উঠলো। প্রবল ক্ষমতাধর হয়ে উঠলো গ্রাম্যসমাজে।

যে বছর পলাশীর যুদ্ধে সঙ্ঘটিত হয় সেই ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দেও চালুছিল 'গোমস্তারাজ'। 'দাদনী মার্চেন্ট' প্রথা বাতিল হয়ে গেছে ইতিপূর্বেই। ইংলণ্ডের সুতাকাটুনিরা কোনমতেই বাংলার নারীতন্তুবায়ী সুতাকাটুনিদের দক্ষতার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না। গোমস্তারা তাঁতীদের ওপর জোর জবরদস্তি খাটিয়ে দৈহিক নিপীড়ন চালিয়েও ইংরাজ বণিকদের সন্তুষ্ট করতে পারছে না। কুঠিয়াল যা 'ইনভেষ্ট' করে তার বহুগুণ আদায় করার লক্ষ্য সাধিত না হলে গোমস্তাদের ওপরই ক্রমাগত সে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতো। 'ক্যালকাটা কাউন্সিল' লণ্ডনে কোম্পানীর সদরদপ্তরে অভিযোগ প্রেরণ করে, আরও অর্থের জন্য দাবী জানায়। কাউন্সিল যে লাভের চেষ্টার কসুর করে নি তার একটা চিত্রও একই সঙ্গে প্রেরণ করে। লণ্ডনে প্রেরিত বার্তাটি ছিল নিম্নরূপ বয়ানের (তারিখ ২০ সে আগষ্ট, ১৭৫৭) ঃ—

"Hitherto we have not been able to make any great progress in the investment of this season. The delay made by the late Nabob in performing his treaty and returning our goods seized by his orders this apprehensions were under a fresh future with and the want of sufficiency of cash to supply to owrungs with any large sums of money, were all of them so many inpediments to our commencing the provisions of investments."

১৭৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দে পর্যন্ত 'দাদনি মার্চেন্ট'দের মাধ্যমে মসলিন বস্ত্র প্রস্তুত করা এবং নামমাত্র মূল্য দিয়ে সংগ্রহ করার কাজ ইংরাজরা চালিয়েছে। কিন্তু এরপর গোমস্তারা কাজ আরম্ভ করলে 'ইনভেস্টমেন্ট' হ্রাস পায় রাজনৈতিক টালমাটাল অবস্থার জন্য।

১৭৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় মোট লগ্নীর পুঁজির পরিমাণ ৩৩, ৬৬০৫০ টাকা, যদিও ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এই পরিমাণ হ্রাস পেযে স্থির হয় মোট ১৯, ৬৮, ৪৪৫ টাকায়।

যে বছর ইংরাজরা বাংলা প্রদেশে ক্ষমতা দখল করে পলাশী হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিযে সেই ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বিভিন্ন আড়ংয়ে কোম্পানী নিম্নরূপ অর্থ বিনিয়োগ করে ছিল।

শান্তিপুর (Santıpore)	১,৬৮,৫০০ টাকা
কাট্টোরা (Cuttorah)	৬৪,০০০ টাকা
ক্ষীবপায় (Kheerpay)	২,৪৮,৬৭৫ টাকা
মালদা (Malda)	৩,১১,৪৫০ টাকা
হারিয়াল (Hurrıal)	৩,১১,৯৭০ টাকা
বুদ্দল (Buddaul)	৭১,৬৭০ টাকা
গোলাগড় (Golagore)	২০,৮০০ টাকা
বুরন (Burron)	১,০৪,৮০০ টাকা
সোনামুকী (Sonamookh)	১,০১.২২০ টাকা
হারিপল (Huripaul)	১,৫৪,৬৪৫ টাকা
কলকাতা (Kolkata)	১,৬৯,৭২০ টাকা
ঢাকা (Dacca)	১,০০,০০০ টাকা
পাটনা (Patna)	১,০০,০০০ টাকা

নবাব সিরাজ-উদ্-দৌল্লাকে নৃশংসভাবে হত্যা করাব ঘটনাবলীর ঠিক পরবর্তী বৎসব ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী 'ইনভেস্টমেন্ট' এর পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি কবতে শুরু করে। পলাশীযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত কোম্পানী বাংলার মসলিন সিল্ক সুতিবস্ত্রেব ব্যবসা করার জন্য ইংলণ্ড থেকেই পাউণ্ড আনতো যার গড় পরিমাণ বার্ষিক সাতলক্ষ পাউণ্ড। বৃটেনে এই নিয়ে ঝড় ওঠে। পার্লামেণ্টে অভিযোগ ওঠে যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে বাণিজ্য করতে যেয়ে ব্রিটেনকেই শেষপর্যন্ত নগ্ন করে ছাড়বে ("denuded Brıtıaın of her wealth")। পলাশীব যুদ্ধে বাংলাকে পরাস্ত করতে সক্ষম হওয়ায় ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীব সম্মান একলাফে বৃদ্ধি পেল। বিজয়ীর সম্মান লাভ ঘটলো বিদেশের মাটীতে উপনিবেশবাদী ইংলণ্ডের, পদানত হল বাংলা, ক্রমশঃ সমগ্র ভারতবর্ষ।

১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে শয়তান মীরজাফরের সঙ্গে ইংরাজ কোম্পানীর সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে মুর্শিদাবাদের কাশিমবাজারে প্রতিষ্ঠিত হলো কোম্পানীর ইংরাজ বেসিডেন্টের

দরবার এবং সদর কার্যালয়। প্রথমে বাংলা প্রদেশে 'চিফ অব্ ফ্যাক্টরীস' এবং 'রেসিডেন্ট'কে একই পদমর্যাদা ভূক্ত করা হলো।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর মোগল বাদশাহ শাহআলমের কাছ হতে বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার 'দেওয়ানী' লাভ করলো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। বাদশাহের পক্ষে এই তিন প্রদেশের প্রজাদের কাছ হতে রাজস্ব আদায় করবে কোম্পানী এবং সংগৃহীত রাজস্ব থেকে একটা অংশ মোগল দরবারে কোম্পানী জমা দেবে। এই বন্দোবস্ত হয়েছিল 'চিরস্থায়ী' ("In perpetuity on the East India Company")। এই ঘটনায় ব্রিটিশ জাতির মধ্যে আনন্দের ঢেউ বয়ে যায় কারণ ইংলণ্ডের আর্থিক অবস্থা এর ফলে আরও সমৃদ্ধিলাভ করবে। যে 'ইনভেস্টমেন্ট' নিয়ে কোম্পানীর লণ্ডন অফিসের দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না, সেই অফিসই ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পে লগ্নীর পরিমাণ এক লাফে বৃদ্ধি ঘটালো। পলাশীর যুদ্ধে বিজয়লাভের পূর্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে স্বীয় দেশ থেকে ব্যবসা বাণিজ্যের খাতিরে সোনার বাট ভারতবর্ষে আমদানী করতে হতো 'ইনভেস্টমেন্ট' এর জন্য, এখন তারাই ভারতবর্ষ থেকে লুঠ করা সোনার বাট ইংলণ্ডে দেদার প্রেরণ করতে থাকে। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে 'হাউস অব কমনস্' এর কাছে কোম্পানী প্রেরিত প্রতিবেদনে উল্লেখিত হয় যে, কোম্পানী আশা করে বাংলার তথা ভারতবর্ষে বাণিজ্যের উদ্বৃত্তের পরিমাণ চার মিলিয়ন ডলারে পৌছে যাবে। যা প্রকৃতপক্ষে পলাশী যুদ্ধের পূর্বের প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ। 'হাউস অব কমনস' এ খুশির বন্যা। পার্লামেন্ট জানালো বাংলা থেকে রাজস্ব বাবদ যে পরিমাণ মুদ্রা ইংলণ্ডে প্রেরণ করার কথা তা নগদে না পাঠিয়ে যেন সোনায় পরিবর্তিত করে প্রেরণ করা হয়। কারণ সোনার বাটের প্রয়োজন ইংলণ্ডে তখন অনেক বেশি।

উপনিবেশবাদী বণিকদের নিজেদের মধ্যে ইংলণ্ডে প্রবল উৎসাহের বন্যার মধ্যে মৃদু আপত্তি উঠেছিল শোষণ ও লুঠের পদ্ধতি নিয়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ষাটের দশকে যে ভাবে বাংলায় লুঠের রাজত্ব চলছিল তার গতি কিছুটা হ্রাস করে ধাপে ধাপে সহ্য করিয়ে লুঠ করার প্রতি জোর দিয়ে ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে 'হাউস অব কমনস' এ লর্ড নর্থ ব্রুক তাঁর ভাষণে ঘটনাটিকে তুলনা করলেন 'মুরগীর পেটে সোনার ডিম' গল্পটির সঙ্গে। মুরগীর পেটে সমস্ত সোনার ডিম একদিনে বার করার লোভে যে মুর্খ মুরগীটিকেই একেবারে হত্যা করে বসেছিল সেই উপাখ্যানটির বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেছিলেন "If you draw off in bullion the revenues of that country, you will kill the hen to get all her eggs at once."

কোম্পানীর লণ্ডনস্থ সদর দপ্তর থেকে এই পরিস্থিতিতে ক্যালকাটা কাউন্সিলকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে বাংলায় রাজস্ব আদায়ের ওপর সার্বিক জোর দিতে এবং আদায় করার যাবতীয় পন্থা অবলম্বন করতে ("to enlavege every channel for conveyıng to us as early as possıble, the annual produce of our acquısitıons")। এই নির্দেশ যায় ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে আর তারপর থেকেই শুরু হয়ে যায় দরিদ্র বঙ্গবাসীব কাছে সিপাই-শান্ত্রী নিয়ে রাজস্ব আদায় করার মর্মান্তিক অভিযান। রক্তাক্ত সেই ইতিহাসেব কথা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

❑ রাজস্ব আদায়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ❑

রাজস্ব আদায়ে যে কোন পন্থা অবলম্বনে কোম্পানীর 'কোর্ট অব ডিরেক্টরস' এর নির্দেশ অনুসারে মুর্শিদাবাদে প্রতিষ্ঠিত হলো Controllıng Councıl, সময়কাল জুলাই, ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ ('ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' এর বৎসর)। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে চালু হলো Controllıng Commıtee of Revenue কলকাতাস্থিত ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে 'কন্ট্রোলিং কাউন্সিল' তার দায়িত্ব সামাল দিত 'কন্ট্রোলিং কমিটি'র অধীনে। এভাবেই কার্য সমাধা করতে হতো। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে 'চিফ রেভিনিউ অফিস' বা 'খালসা' স্থানান্তরিত হলো মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় 'ফোর্ট উইলিয়ম' দুর্গে। এবপব থেকেই 'কনট্রোলিং কাউন্সিল' বজায় বাখাই নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ঐ কাউন্সিলেব অবলুপ্তি ঘটানো হয়। রাজস্ব আদায়ের মুখ্যকর্তা মহম্মদ রেজা খান এই সময়েই কোম্পানী কর্তৃক পদচ্যুত হন যিনি ইংরাজদের তুষ্ট করার জন্য বাংলার রায়ত প্রজা, ভূমিহীন কৃষক, তাঁতহীন তন্তুবায়ী যাবতীয় গ্রামীণ কারিগরের কাছ হতে রাজস্ব আদায়ে জোর জুলুম খাটানোর ব্যাপারে ইতিহাসে নজীর বিহীন কুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। যাঁর অত্যাচারে দেশের বুকে নেমে এসেছিল ১১৭৬ সনের ভয়াল দুর্ভিক্ষ 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে ইংলণ্ডের পার্লামেন্টে পাশ হলো 'ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট'। দেখা গেল ভয়াল দুর্ভিক্ষ সত্বেও বাংলা থেকে যে পরিমাণ রাজস্ব আদায় করা হযেছে তা নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছিল, অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিয়েছিল। 'ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট'য়ের মাধ্যমে ইংলণ্ডে ফোর্ট প্রশাসন রাজস্ব আদায়ে পূর্বেব থেকে অধিক প্রশাসনিক গুরুত্ব আরোপ করলো। গঠিত হলো কুখ্যাত "বোর্ড অব্ ট্রেড"।

"On passing of the India Act of 1773 the Directors sent out orders or the establishment of a Board of Trade in Bengal for the management of company's mercantile concern in that part of India. It consisted of eleven members and remained in existence from 1774 to 1786. It was replaced by another Board in 1786." (CD.28. Board to Trade, Rf. State Archives Guide Book)

"On the abolition of the controlling Council, The Resident corresponded with the Revenue Board of the whole council till the Provincial Councils of Revenue were. (State Archive, Guide Book) at the end of 1773 and begining of 1774" (p.1.9)

Provincial council এর দায়িত্ব ছিল রায়তদের কাছ হতে ভূমি রাজস্ব আদায় করা পাঁচভাগে বিভক্ত হয়ে যথা কলকতা, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, দিনাজপুর এবং ঢাকা"।

"In 1774, the Presidency of Fort William was given jurisdiction over the Presidencies of Madras and Bombay, The Centre of British Power was transferred from Madras to Calcuta and the latter became the seat of British Power the seat of Supreme Government of India" (Ibid).

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা প্রদেশের সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের সঙ্গে সামন্তশ্রেণীর গাঁটছড়া কঠিন হয়ে উঠলো। উভয় শোষক শ্রেণীর চাপে বাংলার মজুর-কৃষকের জীবনে সর্বনাশ ঘটে গেল। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ১১৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ভয়াবহ মারণ যজ্ঞে বিপুল সংখ্যক মজুর কৃষকের মৃত্যুর পর যে মহাশ্মশান সৃষ্টি হয়েছিল তার ওপর দাঁড়িয়েই ইংরাজ বণিকরা তাদের দালাল মুৎসুদ্দী গোমস্তাদের সাহায্যে ইউরোপের বাজারে বাংলার তাঁতীদের শ্রমে প্রস্তুত সূক্ষ্ম ও মোটা বস্ত্র, মসলিন বস্ত্র এবং সিল্ক ও রঙীন বস্ত্র রপ্তানি বৃদ্ধি করেছিল। ইংলণ্ডের 'কোর্ট অব্ ডিরেক্টরস' স্পষ্ট নির্দেশ ছিল ১৭৭০-৭১ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী যে পরিমাণ 'ইনভেষ্টমেণ্ট' করেছিল পরবর্তী দু-বৎসরের মধ্যে তার জন্য রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ অবশ্যই বৃদ্ধি করতে হবে। কাতারে কাতারে বাংলার মানুষ যখন মৃত্যুর মিছিলে, যখন শবদেহ দাহ বা কবরস্থ করায় কোন ব্যবস্থাই নেই পথে ঘাটে মাঠে ময়দানে মানুষের মৃতদেহ প্রকাশ্যে দিবালোকে শৃগালে-শকুনে গিলে খাচ্ছে এটাই যখন প্রাত্যহিকী তখন যে কটা পরিবার গ্রামে তখনও জীবিত ছিল তাদের পিটিয়ে, গৃহছাড়া করে রাজস্ব আদায় করা হয়েছে, যে সমস্ত গৃহ জনশূন্য তাদের স্থাবর অস্থাবর সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে মৃত পরিবারের কাছ হতে দেয় জোর পূর্বক আদায় করা

হয়েছে। এইরূপে দুর্ভিক্ষ সত্বেও কোম্পানী আদায়ীকৃত রাজস্বের পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় বৃদ্ধি পায়। ইংলণ্ডের 'কোর্ট অব ডিরেক্টরস বোর্ড' নির্দেশ এই ভাবেই কার্যকরী করে কাউন্সিল। হেস্টিংস থেকে রেজা খাঁর দস্যুবৃত্তির ফসল 'উদ্বৃত্ত রাজস্ব।' 'মন্বন্তর' এর পূর্ববর্তী বৎসরে লণ্ডনে 'ইণ্ডিয়া হাউস' কর্তৃপক্ষ কলকাতার 'ফোর্ট উইলিয়াম' কর্তৃপক্ষকে ১১ই নভেম্বর, ১৭৬৮ খ্রী এক পত্র দেয় যাতে তাঁতীদেব ওপর জোর জুলুমের স্বীকৃতি ছিল, তাদের ইংরাজ বণিকদের সম্পর্কে ঘৃণার ভাব যার জন্য ইংরাজদের ফরমায়েস মতো বস্ত্র বয়নে, বস্ত্রবিক্রয়ে অস্বীকৃতির কথা উল্লেখ করা ছিল। যার জন্য ১৭৬৯ খ্রী ১৭ই মার্চ থেকে ইংরাজ কুঠিয়ালরা সেইসব বেয়াদপ তাঁতীদের বন্দী করে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কেটে দেওয়ার অভিযান শুরু করে, অত্যাচারের বন্যায় ভেসে যায় তাঁতী আর তাঁতঘর। গ্রাম জনশূন্য হয়ে পড়ে। আর তার পরের বৎসর বাংলার আকাশ গাঢ় ঘন অন্ধকারে ঢেকে গেল।

১২ই এপ্রিল, ১৭৭৩ খ্রীঃ 'কোর্ট অব ডিরেক্টরস' বাংলায় 'বোর্ড অভ ট্রেড'কে পত্রযোগে শান্তিপুরের তাঁতীদের পাঠানো অভিযোগ সম্পর্কে নিম্নে তথ্যের অভিমত জানাতে নির্দেশ দেয় ঃ—

"The two annexed papers which the President formed for man examination into the complaints made to him by the weavers of Santipore and which he has every believe to be authentic, will show the present misarable situation of the weavers, since it appears that the prices given to them for the cloths provided on account of the Company's investment, amount to no more and in some instances less than the cost of materials and their labour is extracted from them without repayment." বাংলার তৎকালীন গভর্ণর হ্যারি ভেরেলেষ্ট 'ইণ্ডিয়া হাউস' এর এই বক্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করে পরিস্থিতির জন্য দেশীয় গোমস্তা ও কোম্পানী এজেন্টদের দায়ী করে উত্তর দেন ঃ—

"The gomostahs or agents of the Company were necessaraly entrusted with powers which they frequently abused to their own emolument; and an authority given to enforce a just performance of engagements became notwithstanding the utmost vigilance of the higher servants, a source of new oppression." (Cotton Weavers of Bengal by Dr. D. B. Mitra. P. 50-51)

'Freedom in Trade' ঘোষণার প্রতিক্রিয়া ঃ—আপাত দৃষ্টিতে উক্ত মন্তব্য পাঠে ধারণা হবে কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা বুঝি তাঁতীদের ওপর অত্যাচার করতো না। কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংস প্রবর্তিত 'Freedom in Trade' অনুসারে এদেশীয়দের ওপর অত্যাচারী গোমস্তাদের কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই ঐ নীতিগ্রহণ করা হয়েছিল ১২ এপ্রিল, ১৭৭৩ খ্রীঃ। 'Freedom in Trade' এর ঘোষণার মধ্যে তাঁতীদের কিছু স্বাধীনতার কথা অবশ্য ছিল। যেমন, ইচ্ছা করলে তাঁতী যাকে ইচ্ছা তার কাছেই উৎপন্ন বস্ত্রসম্ভার উপযুক্ত মূল্যের বিনিময়ে বিক্রী করতে পারবে বা 'অ্যাডভান্স' গ্রহণে জোর জবরদস্তি খাটানো চলবে না ইত্যাদি। ঘোষণায় চমৎকৃত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। যেমন—

"The weavers of the provinces of Bengal and Bihar should enjoy a perfect and entire liberty to deal with any person whom they pleased and that no person should use force of any kind to oblia the weavers or other manufacturers to receive advances to money or to fringe in contracts for the provision of cloths." (Proceeding of Board of Trade, 9th May, 1775)

'বাণিজ্যের স্বাধীনতা' (freedom in trade) নীতি ঘোষণার ফলে বাংলা ও বিহার জুড়ে কোম্পানীর কমার্শিয়াল রেসিডেন্টদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের দুটি ঘটনা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রশাসনিক কাজকর্মে আলোড়ন তুললো। প্রথমটি 'ফ্রিডম ইন ট্রেড' সংক্রান্ত ও ঘোষণা, দ্বিতীয়টি, 'প্রভিনসিয়াল কাউন্সিল' গঠন। ঐ 'কাউন্সিল' এর সংখ্যা ছিল পাঁচটি এবং এর প্রত্যেকটির প্রশাসনিক কর্তাপদে একজন 'চিফ' চার জন কোম্পানীর 'সিনিয়ার সার্ভেন্ট' এবং একজন 'নেটিভ দেওয়ান'। এই কাউন্সিল গঠনের মধ্য দিয়ে কোম্পানীর উদ্ভুত জটিল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে চাইলো। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের পর আর এই কাউন্সিলের অস্তিত্ব ছিল না।

'ফ্রিডম্ ইন্ ট্রেড' নীতি ঘোষণার ফলে মসলিন প্রস্তুতকারক তাঁতশিল্পীরা কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থায় পৌঁছে যায়। তারা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে মসলিন বিক্রী করতে গররাজী বা অস্বীকৃত হওয়ায় কোম্পানীর কর্মচারীরা সুতিবস্ত্র, কাটপিস এবং কাঁচা সিল্ক তন্তু (raw silk) নগদের বিনিময়ে সংগ্রহ করতে আগ্রহী হয়। তাদের 'বাড়া ভাতে ছাই' পড়ার মতো অবস্থা কমার্শিয়াল রেসিডেন্টরা ইংলণ্ডে বার্তা প্রেরণ করে অবিলম্বে এই অবস্থার প্রতিকার দাবী করে ব্রিটিশ ভারত সাম্রাজ্যে হৈ চৈ পড়ে যায়, পার্লামেন্টে হট্টগোল সৃষ্টি হয়।

পরিস্থিতি এইরূপ ঃ— Commercial Residents repeatedly wrote of the adverse effects of the 'free trade' on the public trade of the company. The weavers assumed a 'spirit of independence to the neglect of the company's business. The weavers around Dacca refused to be engaged for the company's since they got employment from other companys and private. Even those who received the Company's advances, refused to deliver goods and should not obey the summons of gomostahs (Proceedings of Board of Trade, 9th May, 1775).

ঢাকা শহরের তন্তুবায়ীরা ইংরাজ কোম্পানীর অধীনে তাঁতবস্ত্র বয়নে অস্বীকৃতি জানায়। তারা ইংরাজ ব্যতীত অপরাপর বিদেশী বণিকদের কাছে বস্ত্রবিক্রয়ে ইচ্ছুক। কারণ তাদের সে স্বাধীনতা আছে। ওদের কাছ হতে তাঁতীরা উৎপন্ন বস্ত্রের মূল্য তুলনামূলকভাবে বেশি পায়। যে সব তাঁতী ইংরাজ বণিকদের কাছ হতে পূর্বেই 'অগ্রিম দাদন' গ্রহণ করেছে এই সময়ে ইংরাজ বণিকদের বস্ত্র অর্ডার মতো ডেলিভারী দিতে অস্বীকার করে। ইংরাজ কুঠিয়ালদের আড়ংয়ে যোগ দিতে এককথায় অস্বীকার করে। তারা এজেন্ট বা গোমস্তাদেরকেও অমান্য করতে শুরু করে। ঢাকা ফ্যাক্টরীর কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট নিকোলাস গ্রুরেবার কোম্পানীর কাছে প্রস্তাব পাঠায় এই মর্মে যে, যেহেতু বৎসরের প্রারম্ভেই তাঁতীদেরকে 'অ্যাডভান্স' দেওয়া হয়ে গিয়েছে এবং, তারা দীর্ঘকাল যাবৎ কোম্পানীর অধীনে কাজ করছে, কাজেই তাদেরকে কোম্পানীর 'সার্ভেণ্ট' হিসাবে গণ্য করলে তাদের ওপর কোম্পানীর সার্বিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা সম্ভব হবে। ঢাকার নিকটবর্তী লাকিপুরের তাঁতীরা স্থির করলো তারা তাদের উৎপন্ন বস্ত্র সম্ভার কোন বিদেশী বেনিয়ার কাছে বিক্রী করবে না তাদের যা অল্প পুঁজি আছে তার দ্বারাই তারা যা নিজেদের ঘরে বসে উৎপন্ন করবে তাই তারা স্থানীয় বাজারে প্রাইভেট ট্রেডারদের কাছে বিক্রী করবে।

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রভাব ঃ— 'ফ্রি ট্রেড'এর অর্থ বাণিজ্যের স্বাধীনতার দাবী। প্রধানতঃ সুতিবস্ত্রের রপ্তানীর জন্য বাংলার প্রসিদ্ধি ছিল। 'র সিল্ক' এর ব্যবহার বা তা থেকে প্রস্তুত সুতা এবং বস্ত্র অষ্টাদশ শতাব্দীর মন্বন্তরের দু-তিন বৎসর পরও এক তৃতীয়াংশের বেশী রপ্তানী হতো না। সুতি-বস্ত্রের তন্তুবায়ীর সংখ্যা ছিল দেশে অনেব বেশি। তাঁত শ্রমিকদের মধ্যে এই অংশ আবার ছিল সবচেয়ে দরিদ্রতম। কিন্তু 'বোঝার ওপর শাকের আঁটি'র মত বাংলার তাঁত শিল্পীদের ঘাড়ে এসে পড়লো আমেরিকা

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা যুদ্ধ (১৭৭৯-১৭৮৩ খ্রীঃ) যার জন্য সুতি-বস্ত্র (কাটপিস গুডস্) ব্যবসায়ে দেখা দিল মন্দা, কাঁচা সিল্কের কারবারে রাতারাতি সমৃদ্ধির জোয়ার সৃষ্টি হলো। বাংলার হস্তচালিত তাঁতবস্ত্রসম্ভার ইংলণ্ডে রপ্তানী হতো, সেখান থেকে আবার পুনঃরপ্তানী হতো পশ্চিম আফ্রিকায়, ফিলিপাইন, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে সমগ্র মহাদেশে। আমেরিকায় স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য ইংলণ্ড থেকে অন্য কোন দেশে মহাদেশে সমস্ত প্রকার ভারতীয় বস্ত্র (যা প্রধানতঃ বাংলার) পুনঃরপ্তানী (re-export) র ওপর নিষেধাজ্ঞা যেমন ছিল তেমনি। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের 'ক্যালিকো প্রিণ্টার্স'রা পার্লামেন্টের নিকট লিখিত গণ আবেদন পেশ করে ভারতীয় বিশেষতঃ বাংলার উৎপন্ন যাবতীয় বস্ত্র সম্ভারের ওপর অতিরিক্ত কর ধার্য্যের দাবী জানায় যাতে ইংলণ্ডের বাজারে ইংলণ্ডের বস্ত্রশিল্পের দুর্দমনীয় অগ্রগতি কোনমতে বাধা প্রাপ্ত না হয়। ইংলণ্ডের বাজারে ইংলণ্ডের শিল্প কারখানায় ইংরাজ শিল্পীদের দ্বারা প্রস্তুত সিল্ক বা সুতি বস্ত্র বিক্রী হবে এর ফলে অব্যাহত গতিতে। ইংলণ্ড আর্থিক ক্ষেত্রে আরও উন্নতি করবে। গোটা বিশ্বে ইংলণ্ড হবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী তার পদতলে এশিয়া-আফ্রিকা লাতিন আমেরিকা পূর্ব ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি অসংখ্য দেশের বস্ত্রব্যবসায় পিষ্ট হবে।

'ক্যালিকো প্রিণ্টারস' দের দাবীর প্রতি লণ্ডনস্থিত 'কোর্ট অব্ ডিরেক্টরস্' সম্মতি জানায়। স্থির হয় বাংলা থেকে ছাপা বস্ত্রাদি ইংলণ্ডে আমদানী নিষিদ্ধ হবে চার বৎসরের জন্য। এই সিদ্ধান্তও নড়চড় হয়ে যায়। ইংলণ্ডের বাজারে বাংলার ছাপা তাঁতবস্ত্র রপ্তানী মোটেই ব্যাহত হয়নি। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কার্পাসতুলার বস্ত্র (কটন পিস গুডস) বাংলা থেকে ইংলণ্ডে রপ্তানী হয় ৪,৩৭,৮০২ পিস আর ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৭,৬৪,১৭৩ পিস। তার পূর্ববর্তী বৎসর ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে রপ্তানী হয়েছিল ৭,৬৮,২৮ পিস।

ওলন্দাজ কোম্পানীর বস্ত্র ব্যবসা 'অ্যাঙ্গলো-আমেরিকান যুদ্ধ' এর জন্য মন্থরগতি হয়ে যায়। পলাশীর যুদ্ধের পর ১৭৭০ খ্রীঃ পর্যন্ত ওরা তাঁতীদের 'অ্যাডভান্স' দিত। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সমাপ্তির পর ওলন্দাজদের যখন ঘুম ভাঙলো, তখন তাদের শূন্যস্থান দখল করে নিয়েছে ইংরাজ বণিকরা। কার্পাস তুলাজাত হস্তচালিত তাঁতে প্রস্তুত বাংলার সুতিবস্ত্রের তীব্র চাহিদার জন্য 'ফ্রি মার্চেন্ট' দের সঙ্গে ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিজস্ব কর্মচারীদের মধ্যে প্রায়ঃশই দ্বন্দ সৃষ্টি হতো।

১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস থেকে ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস এই এক বৎসর ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইউরোপের কোপেনহেগেন শহরে বাংলা থেকে মোট

নয়লক্ষ পিস্ বস্ত্র রপ্তানী করেছিল। কিন্তু ইংলণ্ডে কটন ইণ্ডাষ্ট্রি বিকশিত হওয়ার ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর সাতের ও আটের দশক জুড়ে বাংলা থেকে বস্ত্র রপ্তানীকে তীব্র প্রতিযোগীতার সম্মুখীন হতে হয়। বাংলার বস্ত্র উৎপাদনের ওপর বণিকদের দ্বন্দ্বের প্রভাব অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ শিল্পপতিরা কেবল সুতিবস্ত্র উৎপাদন করতে আরম্ভ করেন, তারা মসলিন বস্ত্র উৎপাদনেও অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে কয়েকটি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, বাংলা দেশের ভূমি রাজস্ব থেকে প্রাপ্ত বিশাল অর্থ কোম্পানী বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে নিজেদের অধিকার বিস্তার এবং বিভিন্ন যুদ্ধ বিগ্রহাদিতে প্রচুর পরিমাণে ব্যয় করে। এদেশের সাধারণ মানুষের হিতার্থে তারা কপর্দকও ব্যয় করতো না। 'দেওয়ানি' লাভের পর ইংরাজ কোম্পানীর হাতে সমর্পিত হলো এক প্রকার দ্বৈত শাসনব্যবস্থা। নবাবের হাতে ক্ষমতাহীন দায়িত্ব আর ইংরাজদের হাতে দায়িত্বহীন অধিকার। নবাবের রাজস্ব আদায় করার অধিকার থাকলেও আদায়ীকৃত রাজস্ব ব্যয় করার অধিকার ছিল একমাত্র ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর। ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ এবং ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের জন্য ইংরাজ কোম্পানী সামরিক খাতে যে বিপুল ব্যয় করে তা পূরণের জন্য বস্ত্রশিল্পেব রপ্তানী বাণিজ্যের ওপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে। ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে ভারতবর্ষের জনগণকে পদানত করতে যে ব্যয় হতো তৎসমুদয় ভারতবর্ষের জনগণের কাছ হতেই আদায় করে নিত। ক্রমে হিন্দুস্থানকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য ইংরাজ কোম্পানী কমার্শিয়াল ট্রেড থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ আর ট্রেডের পিছনে বিশেষ ব্যয় না করে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয কবতে থাকে। ইতিমধ্যে ইংলণ্ড বস্ত্রশিল্পের প্রচুব উন্নতি ঘটায়, সে দেশেই মসলিন বস্ত্র উৎপন্ন হতে থাকায় বাংলার বস্ত্র শিল্পের বাজার সঙ্কুচিত হয়ে পড়লো। ১৭৭৮ থেকে ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দেব মধ্যে হিন্দুস্থানের টেক্সটাইল শিল্পে ইংরাজরা আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ শুরু করে। ক্রম্পটন, কার্টরাইট, বার্থেলেট, বেল প্রভৃতি বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদেরা তাঁত যন্ত্রের নানা প্রকার ভেদ এবং ব্লিচিং বা পরিশোধনে ক্যালসিয়াম অক্সিজেন এবং ক্লোরিনের মিশ্রনে উদ্ভুত যৌগিক পদার্থের প্রয়োগ প্রভৃতি নানান আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের জন্য অভিনন্দন কুড়িয়ে নিল। ব্রিটিশ এবং ভারতীয় উৎপাদকশ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারণ করল। ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মনোভাব 'বিনাযুদ্ধে নাহি দিব সুচ্যগ্রমোদিনী'। সমগ্র হিন্দুস্থানে, বাংলা প্রদেশের অর্থনীতিতে ভয়ঙ্কর ঘুর্ণিঝড় সৃষ্টি করলো। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আকাশে স্বাধীনতার শেষ সূর্যও অপসৃত হলো। কেবল অন্ধকার, চতুর্দিক ঘন অন্ধকারে দেশ

ছেয়ে গেল। ছিয়াত্তরের গ্লানি মুছতে না মুছতে নতুন এক গ্লানি উপস্থিত হলো বিদেশী ইংরাজরা যখন থেকে এদেশের সার্বভৌম শক্তিতে পরিণত হলো তখন থেকেই। ব্রিটিশ কোম্পানীর কর্মকর্তাদের ভয়ঙ্কর দাপটে অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তিগুলি ভয়ে কুঁকড়ে গেল। নবাব সিরাজ-উদ-দৌল্লার রক্ত স্নাত বাংলা থেকে টিপুসুলতানের রক্তস্নাত মহীশূর সব স্বাধীনরাজ্য ইংরাজদের দখলে চলে গেল।

ভূস্বামী দালালশ্রেণীর ভূমিকা ঃ—অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতের স্বাধীনতাকামী শিখ, মারাঠা রাজারাও ইংরাজ সেনাবাহিনীর হস্তে পরাভূত হয়েছে। লর্ড ওয়েলেসলীর অনুসৃত 'অধীনতামূলক মিত্রতা' (Empire through Subsidiary Alliance) নীতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের লুঠেরাদের গুণ্ডামীর নীতির ফলে সারা হিন্দুস্থান ভারতীয়দের রক্তে সিক্ত হলো। স্বাধীন ভারত পরিণত হলো ব্রিটিশ উপনিবেশে।

ব্রিটিশরা ভারতের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় বস্ত্র শিল্পকে ধ্বংস করার পাশাপাশি নিজ দেশের শিল্পবিপ্লব জাত আধুনিক কলকারখানার স্বার্থে ভারতের কৃষিব্যবস্থার ওপরও আক্রমণ হানলো। সনাতনী খাদ্য ফসলের পরিবর্তে অর্থকরী বাণিজ্যিক ফসল। তৈরীর ওপর আদেশ হলো। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে 'চিরস্থায়ীবন্দোবস্ত' প্রথার মাধ্যমে সমাজের বুকে নতুন এক ভূস্বামী শ্রেণীর জন্ম দিল যাবা দরিদ্র কৃষক, রায়ত, গ্রামীণ কারিগরদের শোষণ ও শাসন ব্যবস্থা ইংরাজদের পক্ষে চালু রাখবে। যে কোন প্রকার বিদ্রোহ দমন করবে, যে কোন নিষ্ঠুরতার প্রতি ইংরাজদের সমর্থন ছিল অটুট। কৃষক বা রায়তদের নিজ জমির মালিকানা কেড়ে নিয়ে জমিদার ভূস্বামীদের হস্তে সমর্পণ করার সর্বনাশী কর্মসূচী মানবতাকে চরমভাবে লাঞ্ছিত করা শুরু করলো। ভারতবর্ষে কৃষিকার্য এবং বস্ত্রশিল্পের মধ্যে ইতিমধ্যেই ভয়ঙ্কর সমতা সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁতীরা তাদের পূর্বপুরুষের পেশা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়ে কৃষির ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় কৃষিতে নিদারুণ সঙ্কট সৃষ্টি হলো। জমির ওপর অত্যাধিক চাপ তা সত্ত্বেও ইংরাজদের নীতির জন্য জমিতে কেবলমাত্র বাণিজ্যিক ফসল তৈরীর হুকুমনামা এবং তা করতে কৃষকদের অস্বীকার সব মিলিয়ে কৃষি অর্থনীতিও লাটে উঠে গেল। শিল্প ধ্বংস হলো, কৃষি ধ্বংস হলো। স্বাধীন অর্থনীতি চুরমার হলো বাংলা তথা সমগ্র ভারতে শিল্প শ্রমিক ও কৃষকরা ক্রমে এক বিশাল সংখ্যক বিত্তহীন কর্মহীন দিনমজুর শ্রেণীতে পরিণত হলো। দেশের মধ্যশ্রেণী, ধনী ও অভিজাত শ্রেণী ইংরাজ আশ্রিত জমিদার, ভূস্বামী এবং তাদের নায়েব, গোমস্তা, দারোগা, প্রভৃতি কর্মচারীরা ইংরাজ তোষণে ছিল সিদ্ধ হস্ত। এরা ইংরাজদের প্রভুত্ব স্বীকার করে পোষা জীবের ন্যায় আচরণ শুরু করলো। এরা শুরু করলো দালালি, শয়তানি আর

গুপ্তচর বৃত্তি। গোপনে ইংরাজদের কাছে স্থানীয় বিদ্রোহের সংবাদ সরবরাহ করতো। এদের মনোভাব ছিল ইংলণ্ডে প্রস্তুত বস্ত্র বাংলার হস্তচালিত তাঁত বস্ত্র অপেক্ষা প্রিয় এবং রুচিকর। ইংরাজরা যখন ভারতীয় বস্ত্রশিল্পকে জাহান্নমে প্রেরণের জন্য মিলে উৎপন্ন বস্ত্রের মূল্য হস্তচালিত তাঁতবস্ত্র অপেক্ষা সুলভ করে দিল তখন ইংরাজদের অনুগৃহীত এই মধ্য, ধনী ও অভিজাতশ্রেণীর মানুষেরা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। কোম্পানীর অধীনে এদেরই সন্তানেরা 'আড়ং' এবং কুঠির কর্মচারীরা চাকুরী গ্রহণ করে দরিদ্র তাঁতশিল্পী, নীলচাষী থেকে গ্রামীণ কারিগরদের ওপর ভয়ঙ্কর স্বৈরাচারী পদ্ধতিতে নিপীড়ন, লাঞ্ছনা, অপমান এমন কি অতি উৎসাহী হয়ে শেষে হত্যার অভিযান শুরু করলো। উচ্চবর্ণের রাজা বা অভিজাত শ্রেণী, ভূস্বামী-জমিদার শ্রেণীর দৃঢ় মদতে গ্রাম বাংলার নবোদ্যত মজুর ও রায়ত কৃষকদের ওপর ইংরাজ কুঠিয়াল আর 'আড়ং' গুলোর ইংবাজ মালিকদের 'ইনভেস্টমেন্ট' এর হাড় কাঁপানো অত্যাচারের যেন আর শেষ ছিল না। গ্রামে এমন একজন মজুর কৃষক ছিল না যার চোয়ালের হাড় বার হয়ে পড়েনি। অর্থ আর সামবিক শক্তির জোরে বিদেশী হয়েও ওরাই তখন দেশের ভাগ্য বিধাতা রাজপুরুষ, সহায়সম্বলহীন লাখ লাখ মানুষ তাদের জীবনে হাসি ভুলে গেছলো। সম্বল ছিল রক্ত-ঘাম-কান্না। পরিশেষে বিদ্রোহ। মাথা পেতে মেনে নেয়নি বিদেশী বেনিয়া আর তাদের মুৎসুদ্দী দালাল অর্থবান-ভূস্বামী উচ্চবর্ণের লোকেদের অত্যাচারীর ভূমিকা। সামন্ত বুর্জোয়ারা লোভ আর প্রতিহিংসার বশে হাত মিলিয়েছিল সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে যাতে মজুর-কৃষক কৃষ্ণবর্ণের মানুষদের যৌবন সিক্ত সংগ্রামের রণধ্বনি তাদের কানে না বাজে। লক্ষ্য ছিল কেবল এই যে শ্রমিক এবং কৃষকদের মধ্যে যেন তারুণ্যের স্বভাবজাত বিদ্রোহী মনোভাবের ছোঁয়াচটুকুও না থাকে, থাকে শুধু বার্ধক্য। সার সার মাথাগুলো আড়ংযের কুঠিয়ালের কাছে যেন নীচু হয়ে থাকে, সোজা হয়ে দাঁড়াতে না পারে কারণ ওদের ঋজু দেহ তো ইতিমধ্যে ন্যুব্জ করে দেওয়া হয়েছে, খাদ্য, বস্ত্রের অভাব ঘটিয়ে দেওয়া গেছে।

কোম্পানীর 'ইনভেস্টমেন্ট' এর ফলাও কারবার যাতে নিরঙ্কুশ থাকে, অন্য কোন বণিক কোম্পানী যাতে নাক গলাতে বা কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ করতে না পারে তার জন্য ১৭৮৬ এবং ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে একরাশ 'রেগুলেশন' পাশ হয়। 'ইনভেস্টমেন্ট' এর বিনিময়ে যে পরিমাণ লাভ কোম্পানীর তহবিলে জমা পড়া উচিত তা কিছুটা হ্রাস পাওয়ায় ইংরাজ কোম্পানীর এবং 'কোর্ট অব ডিরেক্টরস্' দের মধ্যে কঠোরতা বৃদ্ধি পেল। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে এইরূপ একগুচ্ছ 'রেগুলেশন' কোম্পানী জারী করেছিল তাতেও যখন পরিস্থিতির উন্নতি হলো না তখন 'রেগুলেশনে'র কঠোরতা

বৃদ্ধি করার প্রক্রিয়া শুরু করলো। সর্বশেষ 'রেগুলেশন' অনুযায়ী 'আদালত' সৃষ্টি করা হলো। ইংরাজ কুঠিয়ালের অধিকার 'বস্ত্রব্যবসায়ে একচেটিয়া' রূপেই স্বীকৃত পেলো। 'ফ্রেঞ্চ', 'ডাচ', 'আর্মেনিয়ন', 'পর্তুগীজ' এদের কাছে কেউ যদি ইংরাজদের এড়িয়ে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করে, তবে সেই তাঁতীর জীবনে কারাবাস অনিবার্য। তার বাণিজ্যিক পণ্য, তো বাজেয়াপ্ত হবেই। কারাবাস ছাড়াও নগদ জরিমানাও জমা দিতে হবে। 'রেগুলেশন' অনুযায়ী তাঁতীর গায়ে হাত দেবার অধিকার ছিল সুরক্ষিত, কোন তাঁতীর বাড়িতে যদি একাধিক লুম থাকতো এবং ধার্য নির্দিষ্ট সময় মোতাবেক ইংরাজ কুঠি বা আড়ংয়ে উৎপন্ন বস্ত্র জমা না পড়লে ধার্য কোটার বস্ত্রের মোট মূল্যের শতকরা পঁয়ত্রিশ টাকা জরিমানা এবং এই সঙ্গে তাকে দেওয়া 'অ্যাডভান্স' অর্থ প্রত্যার্পণ করার নির্দেশজারী হতো। আইনের পরিভাষায় 'কিস্তিবন্দী', 'খাতাবন্দী', (bound by ındentire) যার অর্থহলো 'চুক্তি' দ্বারা আবদ্ধ করা। এসবের অর্থ নিরক্ষর, হতশ্রী তাঁতী জানুক বা না জানুক, 'চুক্তির' লগুড়াঘাতে 'প্রাইভেট ট্রেডারস্'দের ইংরাজ কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসায়ে অন্য ইউরোপীয় শক্তির অনুপ্রবেশ চিরতরে রহিত করার বাসনা সিদ্ধ হলো। আর এর ফলে নিপীড়িত অত্যাচারিত, শোষিত, অপমানিত তাঁত শ্রমিকদের দীর্ঘশ্বাস হ্রাস হওয়ার পরিবর্তে বৃদ্ধি পেল। ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ছত্রছায়ার মুনাফা শিকারী ইংরাজগণ ভারতে প্রবেশ করে তন্তুবায়ীদের আজন্ম কয়েদ করে রাখার যে পাপ ব্যবসা ফেঁদেছিল তারা ফেঁপে ফুলে ঢোল হয়ে উঠছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কাকে বলে তদানীন্তনকালের তাঁত শ্রমিকরা জানতো না। কিন্তু তারা ইংরাজদের বুলেট, বিশ্বাসঘাতকদের তরবারি, রক্ত, কারাগার, হতাশা আর বেইমানী এই সবই সহায় সম্বল করে পথে-পথে ঘুরে বেড়িয়েছে। কখনও বিদ্রোহীদের দলে যোগ দিয়েছে, কখনও ভবঘুরের জীবন বেছে নিয়েছে।

কালমার্কসের মন্তব্য ঃ—১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত মহান দার্শনিক, বিশ্বের সর্বহারা শ্রেণীর মহান সন্তান কালমার্কস তাঁর ভারতে ব্রিটিশ শাসন' প্রবন্ধে তাই নিম্নোক্ত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছিলেন ঃ—

"স্মরণাতীত কাল থেকে ইউরোপ ভারতীয় শ্রমের সৃষ্টি অপূর্ব বস্ত্র পেয়ে এসেছে এবং তার বদলে পাঠিয়েছে ধাতু।...ব্রিটিশ হামলাদাররাই এসে ভারতীয় তাঁত ভেঙ্গে ফেলে। ধ্বংস করে চরকা। ইংলণ্ড শুরু করে ইউরোপের বাজার থেকে ভারতীয় তুলা বস্ত্রের বিতাড়ন, অতঃপর সে হিন্দুস্থানে সুতা পাঠাতে থাকে এবং পরিশেষে তুলার মাতৃভূমিকেই কার্পাস বস্ত্র চালান দিয়ে ভাসিয়েছে।....১৮২৪ সালে ভারতে ব্রিটিশ

মসলিনের চালান ১০,০০,০০০ গজও নয়। অথচ ১৮৩৭ সালে তা ৬,৪০,০০,০০০ গজও ছাড়িয়ে যায়। অথচ একই সময়ে ঢাকার জনসংখ্যা ১,৫০,০০০ থেকে ২০,০০০ এ নেমে আসে।...সারা ভারতবর্ষ জুড়ে কৃষি ও হস্তচালিত শিল্পের যে ঐক্য ছিল বৃটিশ বাষ্প ও বিজ্ঞান তার মূলোৎপাটন করে দিয়েছে।...ইংরেজের হস্তক্ষেপে সুতাকাটুনির স্থান গ্রহণ করেছে ল্যাঙ্কাশায়ার এবং তাঁতীর স্থান রেখেছে বাংলায়....।'

কার্লমার্কসের উপরোক্ত মন্তব্য থেকে পরিস্ফুট হচ্ছে কি ভাবে বাংলা বা সমগ্র ভারতবর্ষের প্রধনতম শিল্পটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। ইংরাজরা ঐ ঘটনার জন্য যুদ্ধের পথ অবলম্বন করে। ইংরাজরা ভারতবর্ষে পদার্পণ করেছিলেন মার্কেটের সন্ধানে। ওরা সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ ও পরিদর্শন করেছে কিন্তু বাংলাই বস্ত্র শিল্প ব্যবসা বাণিজ্যের সর্বোত্তম কেন্দ্র হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। জল হাওয়া এবং স্থলপথ ও জলপথ পরিবহন ব্যবস্থার সুবিধাও ছিল সর্বোত্তম। তাছাড়া ছিল রাজকীয় সহায়তা, বাংলার মধ্যে আবার সর্বাপেক্ষা উত্তম স্থান হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল ঢাকা পরগণা। ঢাকার অন্তর্ভুক্ত সোনার গাঁ, কাপসিয়া এবং জঙ্গলবেরী এই তিনটি স্থানের আবহাওয়া বা জলবায়ু ছিল সমগ্র প্রদেশের মধ্যে সর্বোত্তম। অনুরূপভাবে সুতিবস্ত্র উৎপাদনের সর্বোত্তম কেন্দ্র বীরভূম এবং সিল্ক বস্ত্র, উৎপাদনের সর্বোত্তম কেন্দ্র ছিল মালদহ এবং মুর্শিদাবাদ।

নির্দিষ্ট বাণিজ্যকেন্দ্র এবং তাদের অবস্থান ঃ—

ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলার বস্ত্র শিল্প দখলেব লড়াইয়ের অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানীর এবং নেটিভ মার্চেন্টদেব পরাস্ত করার জন্য বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে কমার্শিয়াল রেসিডেন্সীর পত্তন কবে। কমার্শিয়াল রেসিডেন্সীর বেসিডেন্টের অধীনে থাকত 'আড়ং' এবং সংখ্যায় সেগুলি ছিল প্রচুর। ঢাকা পবগণায কমার্শিয়াল রেসিডেন্সী ছিল বৃহত্তম এবং সর্বোত্তম। রেসিডেন্সী এবং আড়ংগুলির নাম নীচে উল্লেখিত হলো।

রেসিডেন্সী ঢাকা ঃ—চিটাগাঁ (চট্টগ্রাম), লাকিপুর (নোয়াখালি জেলা), কুমারখালি (কুষ্টিয়ার Commerecolly) হরিপাল (রাজশাহী জেলা) গোলাগড় (হুগলী জেলা) রাধানগর (মেদিনীপুর জেলা), মেদিনীপুর, ক্ষীরপাই (Kheerpoy), সুরুল (বীরভূম)

এছাড়া পাটনা, গাজিপুর, বেনারস, এটাওয়া বাংলাব বাইরে উত্তর ভারতে ইংরাজ কমার্শিয়াল রেসিডেন্সী ছিল।

'আড়ং' এর নাম ঃ—১) ঢাকা রেসিডেন্টের অধীনে আড়ং ছিল ঢাকা, সোনার গাঁও, দুমকায়, তিতাবদ্দী, নারায়ণপুর, সোনারপুর, চাঁদপুর, জঙ্গলবেড়ী-বাজিতপুর।

২) চিটাগাঁ (বা চট্টগ্রাম) রেসিডেন্সীতে চিটগাঁ, মীরকাশরী, বানস্‌কোল্লী (Banscolly), হাজারীহাট, সন্দীপ, হাতিয়া, বোমীনী (Bommeenee), দুচিমেক।

৩) লাকিপুর রেসিডেন্সীতে লাকিপুর, চুরপাট্টা, বুল্লুয়া, রাজেগঞ্জ, কাম্পাটা, দুরুমগঞ্জ, দুকেল, সাভাজপুর (Dukkensavazpore) ওমরাবাদ, বিদরাবাদ, দান্দোরা, বক্সীগঞ্জ।

৪) হরিয়াল রেসিডেন্সীতে বেলকোচি, নওগাঁ, তিতুলীন, বীরতারা, আকুয়া, আলিঙ্গী শাজাদপুর।

৫) মালদা রেসিডেন্সীতে-কালিগঞ্জ, সিংঘিয়া, জগীনাটপুর, স্বরূপগঞ্জ, মালদুয়ার মীরচিন্দাপুর, পুদ্দীল, তানোর

৬) শান্তিপুর রেসিডেন্সীতে শারণ, শান্তিপুর, সোনাবাতবারা, কালিগঞ্জ, দুলপুর, খুলসী, মনোহরগঞ্জ, নিরনিয়া, সাতবার্থ, সিবাথী, সিদ্দিপানায়।

৭) হরিপাল (হুগলী) রেসিডেন্সীতে দ্বারহাট্টা, হারিপল, ধনিয়াখালি, মায়াপুর, চান্দুলি, খুরসরই (Khursrroy)

৮) গোলাগড় (হুগলী) রেসিডেন্সীতে গোলাগড়, গৌলপুর, খানপুর (Khawnpore), গুড়ুপ, সাজেনান, হুগলী এবং বরানগর।

৯) ক্ষীরপাই (Kheerpoy-মেদিনীপুর জেলা) রেসিডেন্সীতে চান্দরকোলা, ক্ষীরপায়, রাধানগর, ঘাটাল, রামজীবনপুর, বালি, সুমন্ত এবং নাড়াজোল। এইরূপ রংপুর, সুরুল (বীরভূম) প্রভৃতি আর কয়েকটি স্থানে কমার্শিয়াল রেসিডেন্সী স্থাপিত হয়।

আবহাওয়ার প্রভাব ঃ— ঢাকার আবহাওয়া সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্রের জন্য এবং বীরভূমের আবহাওয়া মোটা সাদা ছাপা সুতি বস্ত্রের জন্য চিহ্নিত বহুকাল যাবৎ। ঢাকার তাপ প্রবাহ পশ্চিমের জেলাগুলি থেকে বেশ কম। তবে ঢাকার জলবায়ুর মধ্যে আর্দ্র বা স্যাঁতসেঁতে ভাব একটু বেশি এবং এটাই যাবতীয় সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্রের পক্ষে উপযুক্ত। বিপরীতে শুষ্ক নীরস জলবায়ু বীরভূমে এবং তা মসলিন বস্ত্রের পক্ষে অনুপযুক্ত। (most damp climate of Dacca and dry atmosphere of Birbhum)

পর্যটক ঐতিহাসিক রবার্ট ওরমে (ORME) তার Historical Fragmants of the Mughal Empire গ্রন্থে লিখেছেন যে, বাংলা প্রদেশে এমন একটা গ্রাম দেখা যায়নি যেখানে স্ত্রী-পুরুষ এবং তাদের শিশুরা তাঁত বস্ত্রের কাজে নিয়োজিত নেই (When at some distance from the high road or a principal town, it is

dificult to find a village in which everyman, woman and child is not employed in making a piece of cloth), ঘটনাও তাই। 'স্পিনিং' এবং 'উইভিং' অষ্টাদশ শতাব্দী জুড়ে সমগ্র বাংলায় জাতীয় বৃত্তি বা পেশা রূপে পরিগণিত হয়েছিল। তাঁতী ছাড়াও আরও অনেকে অন্যপেশা বা জীবিকার মানুষ সপরিবারে এই জীবিকা জীবন ধারনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করেছিল।

'When England was learning the art of weaving, Bengal was manufacturing muslins which had become the wonder at world' (Dr. D. B. Mitra, The Cotton weavers in Bengal)।

তাঁতীরা যুগ যুগান্ত একই স্থানে বসবাস করতো ঘনসন্নিবন্ধ হয়ে। ইংরাজবণিকরা সাম্রাজ্য বিস্তারের লোভে জাহাজের চূড়ায় ইংলণ্ডের রাজকীয় পতাকা উড়িয়ে বাংলায় যখন প্রবেশ করেছিল তারপর থেকেই তারা লক্ষ্য করেছিল কোথায় কি উৎপন্ন হয়। প্রাকৃতিক সম্পদ কোথায় সহজ লভ্য সেই অনুযায়ী মনুষ্যবসতি বিশেষতঃ তাঁতী অধ্যুষিত গঞ্জ, কমার্শিয়াল রেসিডেন্টের আড়ংগুলো আছে সেই এলাকায় মনুষ্যবসতি স্থাপন করে। তারা লক্ষ্য করে জলপথ পরিবহনের সুবিধার সঙ্গে তুলা কার্পাস চাষ হয় কোথায় বিপুলভাবে। শিল্পীদের তাঁতবস্ত্র বয়নের জন্য বাংলা প্রদেশে মোট যে সুতার প্রয়োজন হতো তা কখনই ভিন্ প্রদেশ থেকে আমদানী করতে হতো না। ইংরাজ উপনিবেশবাদীদের আগমনের পরে যখন ইংরাজরা, ফরাসীরা, ডাচেরা, পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদীরা এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, পূর্ব ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের দেশে দেশে বাংলার মসলিন, বাংলার সিল্কবস্ত্র রপ্তানী শুরু করলো তখন এ প্রদেশে উৎপন্ন কাঁচা তুলায় ঘাটতি দেখা দিল। প্রয়োজন হলো হিন্দুস্থানের অন্য প্রদেশ থেকে তুলা আমদানীর। বালাসোর এবং সুরাটই ছিল আমদানীর প্রধান কেন্দ্র। পরে মাদ্রাজ, দোয়াবও যুক্ত হয়। (at first all the worth eastern factories of East India Co. from Balasore onthe Orissa Cost to Patna in the heart of Behar belonged to the 'Bengal Establishment' which later on included the whole of East India Company's possession in North and Eastern India" (Ref. State Archives' Guide Book)

ঢাকা পরগণার সোনার গাঁ, কাপসিরা, জঙ্গলবেড়ীর মাটি কার্পাস তুলাচাষের পক্ষে ছিল সর্বাপেক্ষা উপযোগী। মেঘনা নদীর অবস্থান, অদূরেই সমুদ্র থাকার জন্য যে ভাবে সমগ্র পরগণা প্লাবিত হতো তার ফলে বালি ও নোনামাটির আস্তরণ গড়ে উঠতো যা উত্তম কার্পাস তুলা চাষের উপযোগী। ইংরাজরা ঐ তুলার নামকরণ করে 'ফোট

কটন' (Phottee Cotton)। এই প্রকারে তুলা থেকেই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মসলিন বস্ত্রগুলি প্রস্তুত হতো।

অনুরূপভাবে মালদায় উৎপন্ন হতো তিন প্রকারের তুলা। যথা বারাবুঙ্গা, বিরেট্টা এবং নূরমা। এই তিন প্রকারের তুলার মধ্যে বারাবুঙ্গা ছিল সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বৎসরের উৎপন্ন ছিল প্রায় ২৫০০ মন। বাকী দুটির উৎপন্নের পরিমাণ ছিল গড়ে ৪০,০০০ মন যার মধ্যে উঃ প্রদেশে অন্ততঃ ১০,০০০ মন ইংরাজরা রপ্তানী করে দিত। বর্ধমান জেলায় উৎপন্ন হতো সূক্ষ্মতম মসলিন বস্ত্র উৎপাদন উপযোগী 'নূরমা' তুলা। মসলিন বস্ত্র 'নয়নসুক', 'শ্রীবাতি', 'দুবিস্' যে গুলি বাদশাহ্ নবাব পরিবারের জন্য প্রস্তুত হতো তার জন্য প্রয়োজন 'নূরমা' তুলা। বর্ধমান জেলায় উৎপন্ন হতো আরও উৎকৃষ্ট দুই প্রকারের তুলা যথা 'মহরী' এবং 'বনগা'। 'মহরী' তুলা থেকে প্রস্তুত সুতার দ্বারা প্রস্তুত হতো নগা অতি সুন্দর ধুতি। আর 'বনগা' তুলার সাহায্যে তৈরি হতী কুঠিয়ালদের রপ্তানীর জন্য পাঁচ মেশালী বস্ত্র 'গুরাহ' (Gurrah)। 'বনগা' তুলার সুতার উৎকর্ষতা তুলনা মুলকভাবে ছিল নিকৃষ্টমানের। মেদিনীপুর জেলার রাধানগর রেসিডেন্সী এলাকায় তিনপ্রকারের তুলা উৎপন্ন হতো। যেমন কাউর, মুহরী এবং ভোগী। সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সুতা প্রস্তুত হতো 'কাউর' তুলা থেকে। বৎসরে রাধানগরে তুলার উৎপাদনের পরিমাণ ছিল পনেরো থেকে সতেরো হাজার মণ।

শান্তিপুর রেসিডেন্সীতে বিপুল চাষ হতো কার্পাসের চার ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট গুল্মাকৃতি কার্পাস গাছ। বৎসরে উৎপন্ন হতো তিন হাজার পাঁচশত মণের মতো। খুবই উৎকৃষ্ট মানের সুতায় বস্ত্র প্রস্তুত হতো শান্তিপুরের আড়ংয়ে। রপ্তানী বাণিজ্য ও আভ্যন্তরীন চাহিদা পূরণ না হওয়ায় প্রতি বৎসর প্রায় চারশত মণ সুতা আমদানী করা হতো বর্ধমান থেকে শান্তিপুর আড়ংয়ে।

হারিপাল রেসিডেন্সী এলাকায় 'বোগা' ও 'কোড়ি' এই দুই প্রকার তুলা উৎপাদন হতো। বোগা তুলা থেকে উৎপন্ন সুতায় কোম্পানীর আড়ংয়ে রপ্তানীর জন্য বস্ত্র প্রস্তুত হতো আর 'কোড়ি' তুলার সুতা থেকে প্রস্তুত বস্ত্র ব্যবহার করতো গরীবরা।

বাংলার তাঁতশিল্পীদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ ঃ—বাংলার তাঁতশিল্পের সঙ্গে যুক্ত তন্তুবায়ীরা কৃষকের কাজও করতো। প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠ গ্রামীণ কারিগর ছিল তাঁতী। কিন্তু কৃষিবসঙ্গে সম্পর্ক থাকার কারণে 'রায়ত' হিসাবেও গণ্য হতো। তাঁতী এবং কৃষক ছিল অভিন্ন স্বার্থের মানুষ। যেন হাত ধরাধরি করে চলতো। বহুক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রী উভয়েই ছিল পেশায় তাঁতী। তারা নিজেরাই নিজেদের সামান্য জমি চাষাবাদ করতো। কিন্তু আংশিক সময়ের

জন্য কাজ করে অতি সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র মহাজন বা গোমস্তাদের চোখ এড়িয়ে উৎপাদন করা ছিল অসম্ভব ব্যাপার। 'সান্ধ্য শিশির' ('সবনম'), আররোঁয়া, সুরনাম (উষার নীহার) ইত্যাদি অতি উৎকৃষ্ট মসলিন বস্ত্র প্রস্তুতের জন্য একজন তাঁতীর দক্ষতার পরিমাপ ছিল অসামান্য তার পরিমাপ করা ছিল এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার।

দুনিয়ার তাবৎ বিশেষজ্ঞরা বাংলার হস্তচালিত তাঁত শিল্পীদের নৈপুণ্য দর্শনে বিভিন্ন সময় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। মসলিন বস্ত্রের বিস্ময়সৃষ্টিকারী সৌন্দর্য এবং গুণ বা কোয়ালিটি বিশ্বের বিস্ময়। বাংলার তাঁত শিল্পীদের স্পর্শদ্বারা অনুভূতির ক্ষমতা, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বস্ত্রের ওজন উপলব্ধি করার ক্ষমতা এবং পেশীশক্তির একক প্রকাশ করার ক্ষমতা এই সব গুণাবলীর জন্যই শিল্পীদের দক্ষতার মান এত ঊর্ধ্বে ওঠার কারণ— 'The Bengali weavers was endowed with a fine sensibility of touch, a nice perception of weight and he had also a singular command over muscular action (P. 174, Dr. D. B. Mitra's Cotton Weavers in Bengal)

ইউরোপীয় তাঁতীদের হাতের আঙ্গুলগুলো হস্তচালিত তাঁত বস্ত্র উৎপাদনের উপযোগী ছিল না। ইংরাজদের আঙ্গুলগুলোয় পরস্পরের মধ্যে কোন কোন ফাঁক থাকতো না। এ সম্পর্কে রবার্ট ওরমে তাঁর 'Historical Transactions of the British Nation in Hindostan" গ্রন্থে লিখছেন—"As much as an Indian is born deficient mechanical strength so much is in the whole frame endowed with an exceeding degree of sensability and plaintness, he hand sat an Indian cook which shall be modelicete than that of an European beauty, the skin and features of a porter shall be softer than those of a professed. The rigid clumsy figures of a European would scarcely be able to make a piece of canvass with the mustrmcus which are all that an Indian explory in making a piece of Cambric," 174, 1 bid)

. বাংলার তাঁতশিল্পীদের হাতের আঙ্গুলের দ্বারা মহামূল্য মসলিন বস্ত্র উৎপাদনের কাহিনী বিভিন্ন কাব্যে, লোক কথায় ও গল্প কথায় ছড়িয়ে আছে। ইংরাজরা নিজেদের যন্ত্রের সাহায্যে বস্ত্র উৎপাদন শিখলো ফলে তারা আর হাতে তৈরি করতেই পারে না। বিশ্বের দেশে দেশে বোম্বেটেগিরি করতে যারা পারদর্শী তারা শোষণ আর অত্যাচারে পিছিয়ে থাকবে কেন? ওরা তবু ছিল রাজার জাত তাই আঙ্গুলগুলো ছিল বড় সুন্দর।

ওরা তাঁত বুনবে নিজের হাতে? প্রভু আর গোলামের সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাহলে কি ঘটতো?

ইংরাজ বেনিয়ারা সঙ্ঘবদ্ধভাবেই ভারতে প্রবেশ করেছিল। তাদের মধ্যে গুণ্ডামী ছিল বড় বেশি। সঙ্ঘবদ্ধভাবেই তাঁতশ্রমিকদের ওপর তাঁরা আক্রমণার্থে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস যখন 'ফ্রিডম অব ড্রিম' এর নীতি ঘোষণা করেছিল তখন সেটা ছিল মস্ত এক বড় মাপের ধাপ্পা।

❑ তাঁত শিল্পী নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে টানা পোড়েন ❑

বাংলার তাঁতীদের দখল নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেলো অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইংলণ্ড আর ফ্রান্স হলো মুখোমুখি। এর আগে সংঘাত বেধেছিল ইংলণ্ড আর হল্যাণ্ডের মধ্যে। দরিদ্র তাঁতশিল্পীরা সাম্রাজ্যবাদীদের যুপকাষ্ঠে বলি হতে থাকে। গরু ছাগলের হাটে জন্তু ক্রয় বিক্রয়ের মতো ঘটনা! ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ ফরাসী যুদ্ধ শুরু হলো।

১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সাম্রাজ্যের বণিকরা ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পদাঙ্ক অনুসরণ করতো। 'দাদনী'রা 'ইনভেস্ট' এর মুখ্যদায়িত্ব পালন করতো। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে দুই বেনিয়াদল নিজেদের মধ্যে সম্পর্কের তিক্ততার কারণে ফরাসীরা কোণ ঠাসা হলো। পলাশীর যুদ্ধে ইংরাজ বর্বরতার জয়লাভ ঘটায় ফরাসীদের অবস্থা হলো আরও মন্দ। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে থেকে ফরাসী বাণিজ্য আবার কিছুটা স্থান করে নেওয়ার ইংরাজরা নড়েচড়ে বসে। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীরাজ্য ভারতে ফরাসী কোম্পানীকে নির্দেশ পাঠায় এই মর্মে যে, তারা এখন 'ফ্রি ট্রেড' করুক। ফ্রান্স থেকে তাদের যে সমস্ত আর্থিক সুযোগ সুবিধা প্রেরণের কথা তারা (অর্থাৎ ফরাসী সরকার) আর তা পাঠাতে সক্ষম নয়। অর্থাৎ ফরাসী বণিকদের নিজেদের পথ নিজেদেরই বাছাই করে নিতে হবে। এই নির্দেশের ফলে ফরাসী কোম্পানীগুলো প্রকৃতপক্ষে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে।

১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীরা পুনরায় ইংলণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে আর সেই যুদ্ধ চলে পাঁচ বছর ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। ডাচ এবং স্পেনীয়রাও জড়িয়ে পড়ে ঐ যুদ্ধে। আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে গেলে ১৭৮৩ খ্রীঃ থেকে ১৭৮৬ খ্রীঃ ইংলণ্ডে শিল্প প্রসার আধুনিক যন্ত্রের প্রয়োগ চলেছে দুরন্ত গতিতে। ফ্রান্স সেখানে পিছিয়ে পড়েছে। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের মধ্যে স্বাক্ষরিত হলো ভার্সাই সন্ধিচুক্তি। চুক্তিগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল যুদ্ধারম্ভের পূর্বে ফ্রান্স যেভাবে

'মুক্ত বাণিজ্য নীতি' বাংলায় তাঁতশিল্প ক্ষেত্রে অনুসরণ করতো তাদের সেই পুরানো অধিকার থাকবে। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীন ইংরাজরা তাদের কোন অধিকার দিতে সম্মত হলো না। ইংরাজদের বক্তব্য হলো তারা লড়াই করে দেশটা দখল করলো আর সেই দেশে ইউরোপের প্রতিবেশী শত্রু দেশকে বাণিজ্য করে মুনাফা লোটার অধিকার দিতে হবে? দেশটাকে নিঙরে শুষে নেওয়ার আর লুঠপাঠ চালানোর কারবারে কাউকে ভাগ বসাতে দিতে ইংরাজ কোম্পানী একেবারেই নারাজ।

মারাত্মক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটলো ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে। হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত বজবজে ইংরাজদের দুর্গ। বজবজে চালু করা হয়েছে কাষ্টমস্ চেক পোষ্ট। যে সমস্ত ইউরোপীয় শক্তি ইংরাজদের সমসাময়িক কালে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তারা হুগলী নদীতে জাহাজ ভাসালে ইংরাজ কোম্পানীর 'কাস্টমস্ চেক পোষ্ট'য়ে 'কাস্টমস্ ডিউটি' দিতে বাধ্য ছিল। কিন্তু ফরাসী জাহাজ 'এস পারেন' এর ক্যাপ্টেন ঐ শুল্ক দিতে অস্বীকার করে চলে যেতে চাইলে বজবজ দুর্গ থেকে ইংবাজরা ঐ জাহাজের ওপর গুলিবর্ষণ করে। এর ফলে ক্ষয়ক্ষতির কোন বিবরণ জানা না গেলেও চন্দননগরস্থ ফরাসী উপনিবেশ থেকে কলকাতায় ইংরাজ গভর্ণমেন্টের কাছে জোরালো প্রতিবাদ পত্র চলে আসে।

১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ পরবৎসরেই কলকাতা থেকে গভর্ণর জেনারেল এব কাউন্সিল ফরাসী প্রতিবাদের প্রত্যুত্তরে কর্ণেল ক্যাথকটি নামে একজন দূতকে মরিশাস দ্বীপে ফরাসী গভর্ণর জেনারেলের কাছে বিরোধ মীমাংসার জন্য প্রেরণ করে। দূতেব দৌত্য সফল হয়। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে বিরোধের মীমাংসা ঘটে। মীমাংসার চারটি প্রধানশর্ত স্থির ছিল নিম্নরূপ ঃ—

১) বাংলা, বিহার, উড়িষ্যাসহ ভারতবর্ষের যে স্থানেই ফরাসীরা বসবাস শুরু করেছে সেখানেই তাদের মুক্তবাণিজ্যের অধিকার।

২) কোন ফরাসী জাহাজে যদি লবণ চোরা চালান বা যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র ও উপকরণ আছে সন্দেহ হয় তবে তা পরীক্ষা করার ব্যাপারে ইংরাজদের অধিকার

৩) লবন রপ্তানী-আমদানী বাণিজ্যেও ফরাসীদের অধিকারের স্বীকৃত লাভ

৪) বাণিজ্যে স্থানীয় শুল্ক প্রদানের ক্ষেত্রে ফরাসীদের অব্যাহতি দান

ইঙ্গ-ফরাসী চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল মরিশাস দ্বীপে অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক কনভেনশানের মাধ্যমে। চুক্তির সামগ্রিক প্রভাবে ফরাসীরা কিছুটা আত্মরক্ষা মূলক অবস্থায় ছিল। বাংলাব রাজনৈতিক ক্ষমতার শীর্ষে তখন ইংরাজরা এবং কিছুটা দয়া করছে ফরাসীদের ক্ষেত্রে

ভাবখানা এইরকম। ভারতবর্ষে ক্ষমতার শীর্ষে যখন লর্ড কর্ণওয়ালিস তখন ফরাসীরা আরও নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। ফরাসীরা তাদের রাজকীয় পতাকা তাদের উপনিবেশে ওড়াতে চায় প্রথম মালদায়। আর মালদার ইংরাজ কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট মিঃ উদনী তাইতে আপত্তি তোলেন এবং কলকাতায় কাউন্সিলের অনুমতি পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে ফরাসীদের অনুরোধ করেন। পতাকা উত্তোলনে ফরাসীদের ইচ্ছাপ্রকাশের ঘটনা সেই ছিল প্রথম।

মরিশাসে অনুষ্ঠিত ইঙ্গ-ফরাসী কনভেনশান অনুযায়ী ফরাসীরা ভারতে অবস্থিত তাদের যে কোন উপনিবেশ, ফ্যাক্টরী এবং কুঠি বা বাণিজ্য ভবনগুলির শীর্ষে ফরাসী পতাকা উত্তোলন করতেই পারে। কিন্তু কলকাতা থেকে ইংরাজ গভর্ণর জেনারেল জানালেন ফরাসীরা তাদের আদি পাঁচটি উপনিবেশে (বা ফ্যাক্টরী আছে এমন পাঁচটি স্থানে) যথা চন্দননগরে, ঢাকা, পাটনা, কাশিমবাজার এবং বালাসোর ফ্যাক্টরী বা কুঠির শীর্ষে রাজকীয় পতাকা উত্তোলন করতে পারবে, অন্যত্র নয়।

ভারতের গভর্ণর জেনারেলের উক্ত প্রতিক্রিয়া বা সিদ্ধান্ত কোম্পানীর পার্টনারদের ইংরাজ কোং বুঝিয়ে দিল যে ইংরাজরা ফরাসী উপনিবেশগুলো ব্যতীত অন্যত্র কোথায়ও তারা ফরাসী রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্বীকার করবে না।

পতাকা উত্তোলন করা নিয়ে ফরাসীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করার পিছনে কিছু ঘটনা ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর আটের দশকে ফরাসী গোমস্তারা বাংলার তাঁতীদের কাছ হতে রপ্তানীর উদ্দেশ্যে উৎকৃষ্ট মসলিন সংগ্রহ করতে থাকে। তাঁতীদের অনেকে ইংরাজ বণিকদের কাছ হতে অগ্রিম বা অ্যাডভ্যান্স গ্রহণ করেছিল। কিন্তু বস্ত্রের দাম দেওয়ার ক্ষেত্রে ইংরাজ বণিকদের অপেক্ষা ফরাসীরা অনেক বেশি দেওয়ায় বাংলার তন্তুবায়ীরা ইংরাজ কুঠিয়ালের কাছে বস্ত্র বিক্রয়ে অস্বীকার করে। এইরূপ একাধিক ঘটনার জেরে ক্ষিপ্ত ইংরাজ কমার্শিয়ালরেসিডেন্ট বহু তাঁতীর ঘরে পিয়ন বসিয়ে দেয়। পথচলতি কোন স্থান থেকে বস্ত্রসম্ভার জোর করে কেড়ে নামিয়ে নেয়। মালদা, চন্দ্রকোণা, হারিপাল, কাল্লিকোলা, শান্তিপুর প্রভৃতি কুঠি এবং আড়ংয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে তাঁতীদের জানিয়ে দেওয়া হয় ইংরাজ কোম্পানী ছাড়া অন্যদের কাছে কোন তাঁতী তার উৎপন্ন তাঁতবস্ত্র বিক্রী করতে পারবে না। তা যতবেশী মূল্যই অন্য ইউরোপীয়রা দিক না কেন।

ফরাসী কোম্পানী ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পনীকে সুস্পষ্টভাবে স্মরণ করিয়ে দেয় এই মর্মে যে মালদায় তারাই প্রথম তাঁত বস্ত্র বুননের কাজের পত্তন ঘটিয়েছিল। আর এখন তাদের বাণিজ্যে যে কোন উপায়ে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে। ফরাসীরা ইংরাজ

কমার্শিয়াল রেসিডেন্টের কাজের সমালোচনা করে কারণ ইংরাজ কোম্পানীর বা রেসিডেন্টের কর্মচারীরা ইংরাজ 'প্রাইভেট ট্রেড' এর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। কর্মচারীরা নিজেদের স্বার্থে তাঁতীদের কাছ হতে বস্ত্রসম্ভার ক্রয় করে রপ্তানী করছে। কাজেই ফরাসীরা ন্যায়সঙ্গতভাবেই অভিযোগ করে যে, ইংরাজ কোম্পানীর তাঁতীদের কাছ হতে নয় 'প্রাইভেট ট্রেড' এর সঙ্গে যুক্ত তাঁতীদের কাছ হতে তারা বস্ত্র ক্রয় করলে অন্যায়টা কোথায়? ফরাসী বণিকদের প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে প্রাইভেট ট্রেডের সঙ্গে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে নয়।

ফরাসীরা ইংরাজ কোম্পানীর সঙ্গে দ্বন্দে জড়াতে চায় না এই কারণে যে, ইতিমধ্যে ফ্রান্সে 'ফরাসী বিপ্লব' শুরু হয়ে গিয়েছিল। তার প্রভাবে বাংলায় কেন, বিভিন্ন দেশে ফরাসী বণিকদের ব্যবসা বাণিজ্যে ভয়ঙ্কর মন্দা সৃষ্টি হযেছিল। ভারতে কোন ক্রমে 'ট্রেডিং' টিকিয়ে রাখতে হচ্ছিল। এর মধ্যে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে পণ্ডিচেরী দখল হয়ে গেছিল। কিন্তু বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে ফরাসী পুঁজিপতিদের বহু সম্পদ বাজেয়াপ্ত হওয়ায় ভারতে বাণিজ্যে প্রায় ইতির টান পড়ে।

ওলন্দাজদের সঙ্গে ব্রিটিশদের লড়াই ঃ—হল্যাণ্ড (ডাচ বা ওলন্দাজ) সাম্রাজ্যবাদীরাও তাদের হিংস্র থাবা বসিয়েছিল অফুবন্ত সৌন্দর্য আর সম্পদের অধিকারী বাংলার বুকে। এরাও উল্লসিত হয়েছিল তাঁত শ্রমিকদের বিশাল সংখ্যা আর দুর্লভ মসলিন বস্ত্র প্রস্তুতের বিস্ময়কর দক্ষতার সন্ধান পেয়ে। ইংরাজ বেনিয়াদেব মতো আচরণে ডাচেরাও পিছিয়ে থাকে নি। এমনকি তাঁতীদের ভাগাভাগী করা নিযে ইংরাজ কোম্পানীর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় স্থানীয় লড়াইয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। তাঁতীরা তো জন্তু, তাদের দখল নিয়ে লড়াই, ওলন্দাজ আর ইংরাজ পরস্পর মুখোমুখি।

ইংরাজ বেনিয়াদের সঙ্গে রণে ভঙ্গ দেওয়ার মানুষ ওরা ছিল না। ফরাসীরা যখন ক্লান্ত বাণিজ্যে অর্থের টান, ডুপ্লের পর উপযুক্ত সংগঠক বা উত্তরাধিকারীর অভাবে ভুগছে তখন ডাচেরা চুটিয়ে বাংলার বুকে প্রথম আফিম তারপর লবণ ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল। আফিম রপ্তানী করতো। বাংলার এমন কতকগুলো প্রসিদ্ধ বাণিজ্যিক এবং ঘনবসতিপূর্ণ শহরের দখল ওরা নিয়েছিল সে সকল স্থানে বাণিজ্য দ্রব্য উপকরণ সংগ্রহে কোন ঘাটতি ছিল না। যেমন, পিপলি ও বালাসোর (উড়িষ্যা), পাটনা, ঢাকা, মালদা,

কাশিমবাজার, চুঁচুড়া, বরানগর, লাকিপুর। এই সব বাণিজ্যকেন্দ্রে ইংরাজরা এবং ফরাসীরাও অধিষ্ঠান করতো। কিন্তু ইংরাজদের মুখ্য প্রতিদ্বন্দী ফরাসীরা নয়, ছিল ওলন্দাজেরা।

পলাশী যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ওলন্দাজেরা বস্ত্রব্যবসায়ে প্রবেশ করেনি। ঐ যুদ্ধের পরে পুতুল নবাব মীরজাফর ইংরাজদের লবণ ব্যবসায়ের ওপর একচেটিয়া অধিকার দিয়ে পরোয়ানা বার করে, ফলে ওলন্দাজেরা লবণ ব্যবসা পরিত্যাগ করে বস্ত্রশিল্পে হাত দেয়। ওলন্দাজদের অর্থের অভাব প্রথম থেকেই না থাকায় ইংরাজদের এমনকি ফরাসীদের থেকেও ফ্রি-ট্রেড মার্চেন্টদের ওলন্দাজদের ওপর বেশি আস্থা ছিল। ডাচ বণিকদের বিল কখনও বাকি বকেয়া থাকতো না। ইংরাজ কুঠির কর্মচারীদের ও ওলন্দাজদের ওপর বেশি আস্থা ছিল। কিন্তু ইংরাজকুঠিয়ালদের নির্দেশ মতো ওলন্দাজ বণিকদের পণ্য সামগ্রী ঘেরাও হতো, পথিমধ্যে কেড়ে নেওয়া হতো। 'দাদন' গ্রহীতা তাঁতীর ঘরে ঢুকে ওলন্দাজদের গন্ধ পেলে মাকু থেকে সুতা বা ঠকঠকি থেকে মসলিন বস্ত্রটাই কেটে অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় তুলে নিয়ে চলে আসতো। গঞ্জে-বাজারে পথিমধ্যে ইংরাজ ওলন্দাজ কুঠির কর্মচারীদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ছিল নিয়মিত এবং যেন তুচ্ছ ব্যাপার। ক্রমাগত বাধাপ্রাপ্তির জন্য ডাচদের বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে।

বাংলার প্রথম ইংরাজ গভর্ণর হ্যারি ভেরেল্যাস্ট (১৭৬৭-৬৯ খ্রীঃ) এর আমলেই বাংলার তাঁতীদের জীবনে সর্বাপেক্ষা বেশি দুর্যোগের ঘনঘটা নেমেছিল। দুর্যোগ যে পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পর থেকেই শুরু হয়েছিল একথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই মন্বন্তরের জেরে আর ইংরাজ বণিকদের কাছ হতে শ্রমের বিনিময়ে মজুরীর পরিবর্তে দৈহিক নিপীড়নে তাঁতীরা লাখে লাখে হয় মৃত্যুর মুখে পড়ে শেষ হয়ে গেছলো অথবা গ্রাম ছাড়া দেশ ছাড়া হয়ে পাগলের মতো জীবন জীবিকার সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগলো সেখানেই তাদের মৃত্যু ঘটতো। ফলে তাঁতীর সংখ্যা ভয়ঙ্কর ভাবে হ্রাস পেল।

ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদীদের সদর চুঁচুড়া থেকে কলকাতায় ইংরাজ গভর্ণর জেনারেলের কাছে ডাচেরা অবাধ বাণিজ্যে বাধাদানের ঘটনার তদন্ত করার দাবী পরিত্যাগ করে তাঁতী ভাগাভাগি (Partition of weavers)র দাবী জানায়। ইংরাজ কুঠির কুঠিয়ালদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে অভিযোগ সম্বলিত যে পত্রটি কলাকাতায় যায় তার কিয়দংশ নিম্নরূপ ঃ-

"The English gomostahs and dallals engaged themselves to work for nobody than for the English, beating and tormenting

all of them that made bold to deliver any goods to us, cutting, down from the weaver's looms the cloths that were to be made forms."

(N. L. Chatterjee's article Anglo-Dutch Disputes in Bengal' in the "Proceedings of Indian History Congress." 1959, p. 1439 Ref. Dr. D. B. Mitra's 'Cotton Weaver's in Bengal' p.99)

'Partition of weavers' প্রসঙ্গ ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। একই আকাশে যেমন দুই সূর্য থাকে না, তেমনই একই বাংলার আকাশে দুই সাম্রাজ্যবাদী শাক্তিতে শ্রমিক ভাগাভাগি করে অবস্থান করবে তা অসম্ভব। গভর্ণর ভেরেল্যাস্ট সোজাসুজি ডাচ গভর্ণরকে জানিয়ে দিলেন কোম্পানীর অসম্মতির কথা। বাংলার নবাবের কাছ হতে বিজয়ী হিসাবে পুরস্কার, কৃতজ্ঞতার দান হিসাবে বাংলার ওপর কর্তৃত্ব করার যে একচেটিয়া অধিকার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আছে তা ক্ষুণ্ণ হতে দিতে তিনি চান না। তাছাড়া 'ইনভেস্টমেন্ট' ইংরাজ এবং ওলন্দাজ উভয় কোম্পানী যা করে থাকে তার আনুপাতিক হারের কোন পরিবর্তনেও তাঁর সম্মতি নেই।

ওলন্দাজ বণিকেরা ইংবাজ গভর্ণরের পত্রে বর্ণিত ব্যাখ্যায় ক্ষুণ্ণ হলো, কলকাতা আর চুঁচুড়ার মধ্যে পত্র যুদ্ধের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল, সবই ঘটলো কিন্তু ডাচেরাই শেষ পর্যন্ত গুটিয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত কলকাতা ইংরাজ কাউন্সিল চুঁচুড়ার ডাচ কাউন্সিলের কথায় কর্ণপাত করাই বন্ধ করে দিল। সাম্রাজ্যের একচেটিয়া অধিকার ইংরাজদের, সেখানে অন্য সাম্রাজ্যবাদী প্রবেশ করতে পারে না।

ডাচেরা ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে আর একবার শেষ চেষ্টা করেছিল। চুঁচুড়ায় তারা ওলন্দাজ রাজকীয় পতাকা উত্তোলন করে। ইংরাজদের ক্যালকাটা কাউন্সিলের কাছে বাণিজ্য করার অধিকাব পুনরায় সম্মতি দাবী করে। মোগল আমলে যে চার ইউরোপীয় দেশ যথা ইংলণ্ড, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড এবং পর্তুগালের ভারতে বাণিজ্য করার ফরমান এবং সনদ ছিল তা বজায় রাখার দাবী জানায়। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা দৃঢ়তার সঙ্গে ক্ষমতার ভাগাভাগি হওয়ার আশঙ্কায় বাণিজ্য করার ডাচেদের কোন অধিকার দিতে অসম্মতি জানায়। 'মরণের ব্যবসায়ী' হিসাবে ইংরাজ কোম্পানী ইতিমধ্যেই খ্যাতি অর্জন করেছে। সে খ্যাতির অংশীদারীত্ব ছাড়তে হেস্টিংসও রাজি হন নি।

ওলন্দাজ বণিকদের সঙ্গে ইংরাজ কোম্পানীর সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটে মালদায়। ওলন্দাজ বণিক কোম্পানী নিযুক্ত তিনজন গোমস্তাকে ইংরাজ কোম্পানী নিযুক্ত গোমস্তারা প্রাণনাশের হুমকী দেয়। তাদের সমস্ত বস্ত্রসম্ভার কেড়ে নিয়ে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে

দেওয়ার হুমকী দেয়। মালদায় ইংরাজ রেসিডেন্ট মিঃ চার্লস গ্রান্টের বিরুদ্ধেও ডাচ কোম্পানী গুরুতর অভিযোগের আঙ্গুল উত্থাপন করে। চার্লসের বিরুদ্ধে অভিযোগের সারবত্তা ছিল। যে সমস্ত গ্রামে ডাচেরা তাঁতীদের কাছে বস্ত্র ধোয়ার জন্য দেয় বা বস্ত্র ক্রয় করে সেখানেই ইংরাজ রেসিডেন্ট গোমস্তা, হাবিলদার এবং সিপাই প্রেরণ করে। তারা ডাচ গোমস্তাদের বস্ত্র ধোয়ার অধিকারটুকুও হরণ করে তাঁতীদেরও পিটিয়ে আসে। আক্রান্ত হতো তাঁতীরা, ডাচেদের নিশ্চয়ই আর্থিক ক্ষতি হতো কারণ তারা তাদের 'ইনভেস্টমেন্ট' এর বিনিময়ে কিছু পেতো না। যে সময়ের ঘটনা তখন দেশে মন্বন্তর আর মহামারী চলেছে। ইংরাজরা সেদিকে আদৌ দৃষ্টি দিচ্ছে না। তাদের নিয়োজিত গোমস্তাদের সে অধিকারও ছিল না। অন্যান্য কোম্পানীগুলির কর্মকর্তারা তাঁতীদের প্রতি কিছুটা নমনীয় ছিল যা ইংরাজদের পক্ষে ছিল অসহনীয়, অবশ্য দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই আগ্রহ প্রকাশ করেনি। যখন 'একবাটি ফ্যান দাও মা' বলে তোবড়ানো বাটি থালা হাতে বাড়ি বাড়ি ঘুরত হতভাগ্য তাঁত শ্রমিকবা, কৃষক ঘরের সন্তানরা তখন কি ইংরাজ, কি ওলন্দাজ, কি ফরাসী কেউই কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। এক মুঠো ভাতের জন্য কান্না যখন বাংলার বাতাস ভারী হয়ে উঠতো তখন হতভাগ্য মানুষগুলোর দিকে কেউই ফিরে তাকায় নি। তাদের সকলেরই লক্ষ্য ছিল বাণিজ্য, মুনাফা আর লুঠপাট। নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ ব্যতীত অপর কোন উদ্দেশ্য ছিলনা। দরিদ্র নিরক্ষর তাঁত শ্রমিক কেবল বেগার খাটতো, বিনিময়ে তারা যৎসামান্য যা পেতো তার সাহায্যে তাদের উদরের ক্ষুণ্ণিবৃত্তি হওয়া সম্ভব ছিল না।

ইংরাজডেনিস বণিকদের সম্পর্ক তুলনামূলক ভাবে নরম ছিল। ডেনমার্কের কোম্পানীগুলো কলকাতা ও অন্যান্য শহর থেকে বস্ত্রসম্ভার শ্রীরামপুর শহরে রপ্তানীর জন্য আমদানী করতো। অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষ ডেনিসরা ইংরাজ কোম্পানীর সহায়তায় কয়েক লক্ষ টাকার বস্ত্র কলকাতা বন্দর থেকেই বিদেশে রপ্তানী করেছে। ব্রিটিশ প্রাইভেট ট্রেডারসদের বাণিজ্যের পরিমাণও ১৭৯৭-৯৮ খ্রীষ্টাব্দ অবধি যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। অনুরূপভাবে স্পেনীয় এজেন্টদের সঙ্গেও ইংরাজ কোম্পানীর বাণিজ্যিক সম্পর্ক উন্নততর ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দী জুড়ে ইউরোপের বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী বণিক কোম্পানীগুলি 'ইনভেষ্টমেন্ট' এর ডালি নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল দিল্লীতে আর বাংলার মোগল নবাবী শাসনে শোষিত ভারতবাসীর সম্মুখে এক হাতে 'অ্যাডভান্স' এর তোড়া, অপর হাতে নিপীড়নের যাবতীয় অস্ত্র। রক্তস্নাত হলো বাংলাই সর্বপ্রথম। স্থানীয় মজুতদার, খাদ্যচোর,

মহাজন জমিদার-জোতদার পুঁজিপতি, গোমস্তা নায়েব-দারোগা-হাবিলদার-সিপাই এইসব একত্রিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেছিলো অন্য উপনিবেশবাদীদের ঠেলে সরিয়ে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীদের পাশে। নিজ দেশের অধিবাসীরা যখন এক মুঠো অন্নের আশায় দিবারাত্র অন্ধকার তাঁতঘরে বসে পৃথিবীর বিস্ময় মসলিন বস্ত্র প্রস্তুত করে যায় একটার পর একটা তখনও তাদের হৃদয় কেঁপে ওঠেনি। একের পর এক গ্রাম খাঁ খাঁ করতে থাকে। শকুনিরা দলে দলে গ্রামে প্রানের শূন্যস্থান পূরণ করতে থাকে। জাতীয়তাবাদের পতাকা পরবর্তীকালে এদেরই হাতে শোভা পেয়েছিল। অবশ্য অনেকেই সোজাসুজি ইংরাজদের স্বার্থবাহী ভূমিকা সুন্দর ভাবে দক্ষতার সঙ্গে পালন করে 'Companion to Indian Empire' or C. I. E. উপাধিতে ভূষিত হয়েছিল।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মনোবাসনা বাংলার সুপ্রাচীন শিল্পটিকে ধ্বংসসাধন (deindustrialisation) পূর্ণ হতে সময়ের প্রয়োজন হয়েছিল পলাশীর যুদ্ধের পর ছিয়াত্তর বৎসর। ১৮৩৩ খ্রীঃ মোটামুটি এই সময়ে হস্তচালিত তাঁতশিল্পের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটে। ফলে বাংলার অর্থনৈতিক বুনিয়াদে ধ্বস নামে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কারণ, বাংলার কয়েক লক্ষ পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের একমাত্র উপায় ছিল বাংলার মসলিন ও সুতিবস্ত্র। একই সময়ে বিদেশে যেমন চীনের অর্থনীতি নির্ভরশীল ছিল সিল্কবস্ত্র, মিশরে লিনেন, ইংলণ্ডে ছিল উল, বাংলার মসলিন সিল্ক ও সুতিবস্ত্র উৎপাদনের উপর নির্ভরশীলতা সহস্রাধিক বৎসরের প্রাচীন। বাংলায় 'স্পিনিং' এবং 'উইভিং' ববাবরই জাতীয় জীবিকার মর্যাদাভুক্ত ছিল।

বাংলার মসলিনের খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া। দিল্লীর শাহেনশাহ আকবর বাদশাহের আমল থেকে ঔরঙ্গজীব এবং দ্বিতীয় শাহ আলম পর্যন্ত প্রত্যেক ভারত সম্রাট এবং তাঁদের সাম্রাজ্ঞীরা কদর করতেন মসলিন ও সিল্ক বস্ত্রেব। আকরবর বাদশাহর রাজত্বকালের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন বিখ্যাত সভাসদ আবুল ফজল তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আইন-ই-আকবরী'তে আবুল ফজল লিখেছিলেন বাদশাহ কর্তৃক ঢাকার মসলিনের গুণকীর্তনের কথা। পরবর্তীকালে সাম্রাজ্ঞী নূরজাহান সম্পর্কে জানা যায় তিনি তো তাঁর অন্দরমহলের নারীদের পোষাকের ডিজাইনই স্থির করেছিলেন মসলিন বস্ত্রেব। সম্রাট শাহজাহান, সম্রাট ঔরঙ্গজেবের উচ্চপ্রশংসা এসবই ঠিক ছিল। বাংলা ছাড়াও অযোধ্যার নবাব-বেগমরাও পরিধান করতেন বাংলার মসলিন। বাদশাহ বা নবাবের সঙ্গে যাঁরা সাক্ষাৎ প্রার্থী হতেন কোন বিচারের আশায় তাঁরাও খালি হাতে না যেয়ে উপহার স্বরূপ সঙ্গে নিয়ে যেতেন মসলিন বস্ত্র আর সঙ্গে কোন উপঢৌকন বা উপহার যা দিয়ে 'উচ্চবর্ণ'

বা উচ্চপদস্থ বা অভিজাত নৃপতির সঙ্গে সাক্ষাত করতে যাওয়া ছিল সামাজিক প্রথা।

জনজীবনে তীব্র শ্রেণীবিভাজনের জন্য শ্রমিকদের দুরাবস্থা ছিল চরমে। ধনী অভিজাত রাজপুরুষদের মনোবাসনা, ভোগসুখ বা তৃপ্তির রসদ যারা উৎপন্ন করতো আর অর্ডার মতো যোগান দিত সেই শ্রমিকরা মৃত্যু বরণ করতো ক্ষুধার জ্বালায়। চিকিৎসার অভাবে এদের কথা কেউ কখনও চিন্তা করতো না। যারা ভোগ করতো, অঙ্গের শোভা বৃদ্ধি করতো সেই সকল সামন্ত প্রভুদের যেন কোন সামাজিক দায়বদ্ধতা ছিল না। ভোগই ছিল ভোগবাদীদের চরম তৃপ্তি। এযুগে গড়ে উঠেছিল 'গিল্ড্ এবং এবং 'কারখানা। কিন্তু শৃঙ্খলার নামে শৃঙ্খলের জোর ছিল অনেক বেশি। আগ্রা, দিল্লী, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, অযোধ্যা সর্বত্রই বাদশা, নবাব আর তাঁদের বেগম মহলের সৌন্দর্যক্ষুধা পরিতৃপ্তির জন্য যোগানদার বা রসদ বেগার বা গোলাম ব্যতীত অন্য কোন অভিধায় ভূষিত হয় নি। ঐতিহাসিক ডঃ যদুনাথ সরকার বলেছেন—"The nobles had to present the rarest products, both natural and manufactures. The nobles therefore, employed the best local artisans to them articles worthy of presentation the time for their next visit to the Court." (Modern Review, June, 1992)

ক্রমহ্রাসমান শ্রমিক সংখ্যা এবং শিল্পের মৃত্যুঘণ্টা

যে তাঁতশ্রমিকদের বিস্ময়কর নৈপুণ্য নিয়ে বাদশাহ নবাব এবং তাঁদের বেগম মহলে এত প্রশংসার বন্যা, উৎকৃষ্ট বস্ত্র উৎপাদনে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা তাদের সংখ্যা হ্রাস শুরু হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। উনবিংশ শতাব্দীতে শ্রমিক সংখ্যা ভীষণ হ্রাস পায়। ঢাকা পরগণার বিভিন্ন আড়ংয়ে কেবল ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গোমস্তারাই নন, বাণিজ্যে নেমেছিল অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানীর সঙ্গে গ্রীসদেশের বণিকরা, এশিয়ার আর্মেনীয়ও, আরবীয়রা। এদের ব্যবসা-বাণিজ্যে বাধাসৃষ্টির জন্য ইংরাজরা তাদের নির্দিষ্ট করা শিল্পী-শ্রমিকদের জন্য নম্বর যুক্ত টিকিট ইস্যু করতো যাতে তারা ইংরাজ কোম্পানীকে অগ্রাহ্য করতে বা এড়িয়ে অন্য কোম্পানীকে বস্ত্র সরবরাহ করতে সাহস না পায়। ইংরাজ কোম্পানী নির্দিষ্ট শ্রমিকদের নামের পরিবর্তে কেবল ক্রমিকসংখ্যা বা ইংরাজী নাম্বার ধরে ডাকা হতো। শ্রমিকরা পরিণত হয়েছিল কেবল নাম্বারে।

ঢাকা শহরের বুকে মসলিন বস্ত্র ব্যবসায়ে (তৈয়ারী ও বিক্রয় কার্য্যে) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত লোক সংখ্যা ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ছিল আটচল্লিশ হাজার।

কিন্তু যদি তাঁতীশিল্পীর হিসাব ধরা হয় তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর নয়ের দশকে সর্বোচ্চ সংখ্যা ছিল ৬২১৯ (১৭৯১) এবং সর্বনিম্ন সংখ্যা ছিল ৪৯৫১। ১৭৯১ খ্রীঃ থেকে ১৭৯৯ খ্রীঃ এই আটবৎসরে প্রায় দেড় হাজার জন তাঁত শিল্পী কর্মচ্যুত এবং প্রতি বৎসরেই কয়েক শত তাঁতশ্রমিক জীবিকা হারিয়ে সন্ন্যাসী বৈরাগীর দলে ভীড়ে হারিয়ে যায়।

কেবল ঢাকা আড়ংয়ে ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁতশিল্পী সংখ্যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছিল একহাজার ছয় শতে। ঢাকার সোনারগাঁও আড়ংয়ের তাঁতীরা আড়ংয়ের গোমস্তা এবং আমলাদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে কোম্পানীর কাছে অভিযোগ দায়ের করে এই মর্মে যে, গোমস্তার ক্রিয়াকলাপের (ভয়ঙ্কর শ্রমিক বিরোধী) জন্য তাঁত শিল্পী সংখ্যা ১২০০ থেকে ১০০০ এবং আরও হ্রাস পেয়ে মাত্র ৫৫০টি পরিবারে সীমাবদ্ধ হয়েছে। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সোনার গাঁওয়ে জনসংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। এই সোনারগাঁও আড়ংয়েই প্রস্তুত মসলিন বস্ত্র নিয়ে উচ্ছসিত প্রশংসা করেছিলেন সম্রাট আকবরের বিখ্যাত সভাসদ আবুল ফজল এবং ইংরাজ পর্যটক র‍্যালফ ফিচ্। সোনার গাঁওয়ের শিল্পীদের অধিকাংশই মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত আর সেখানে পাঁচ হাজার জনসংখ্যার মধ্যে তাঁত শিল্পী সংখ্যা মাত্র তিনশত। ব্রহ্মপুত্র নদীর এক শাখার তীরে অবস্থিত ঢাকা শহরের বিশমাইল পশ্চিমে ডুমরয় আড়ংয়ের তাঁতীরা অধিকাংশই হিন্দু ধর্মাবলম্বী। এরা অতি সূক্ষ্ম সুতার কাজে দক্ষ ছিল। ছয় হাজার লোক সংখ্যা অথচ তাঁতীর সংখ্যা মাত্র তিন শত। তিতাবদ্দী ঢাকা পরগণার এক বিখ্যাত গ্রাম এবং সেখানে যে আড়ংটি ছিল তার অবস্থান খ্যাতির দিক থেকে শীর্ষে। অত্যন্ত উন্নতমানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র উৎপাদিত হতো এই আড়ংয়ে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁত শিল্পী-শ্রমিকসংখ্যা হ্রাস পেতে পেতে দাঁড়িয়েছিল দুইশতে।

জঙ্গলবেড়ি ঢাকা পরগণার অতি সমৃদ্ধশালী গ্রাম, ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত, বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবেও খ্যাতি ভারতব্যাপী। এমনকি ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে দেশ বিদেশে জঙ্গলবেড়ি গ্রামের মসলিন বস্ত্রের চর্চা আর সুনাম বিস্তৃত। এই গ্রামের সাতশত পরিবার সিরাজ-উদ-দ্দৌলার নবাবী আমলে আমলাদের অত্যাচারে গ্রাম ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায়। কারণ ব্রিটিশ ঐতিহাসিক উইলিয়ম বোল্টস তাঁর 'Consideration of Indian Affairs' গ্রন্থে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। সিরাজ-উদ-দ্দৌলার বিরুদ্ধে ব্রিটিশ মাত্রেই তীব্র বিদ্বেষ মনোভাব পোষণ করতো। তবে ঐতিহাসিক জেমস টেলর লিখেছেন যে, ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জঙ্গলবেড়ি গ্রামে তাঁতী পরিবারের সংখ্যা হ্রাস পেতে পেতে একশতে দাঁড়িয়ে গেছলো।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে বাণিজ্য সংক্রান্ত নতুন বিধি রচনার পর খোদ ঢাকা শহরের বুকে তাঁতীর সংখ্যাও হ্রাস পেতে থাকে। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা শহরের জনসংখ্যা ছিল দুই লক্ষ। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সেই সংখ্যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়ে ৬৮ হাজার। জনসংখ্যাবৃদ্ধির নিয়মানুসারে বর্তমান কালে তো প্রতি বৎসরই বৃদ্ধি পায়। ঢাকা শহরের বাসিন্দা বলতে হিন্দু ও মুসলমান সমান সংখ্যায়, আর্মেনিয়ান, ইংরাজ, গ্রীক এবং পর্তুগীজ বংশধরেরা। এদের মধ্যে তাঁতী পরিবারের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছিল মাত্র সাড়ে শতে।

ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আক্রমণাত্মক ভূমিকার ফলে সমৃদ্ধশালী তাঁতী পরিবারগুলি ক্রমাগতই ধ্বংস হতে থাকে। ঢাকাব সন্নিকটে হরিপাল ফ্যাক্টরী (হুগলী জেলার হরিপাল নয়)র অধীন আড়ং গুলোয় অর্ডার ক্রমেই কমতে থাকে। অনুরূপভাবে মউ, আজিমগড়, লাকিপুর ফ্যাক্টরী সর্বত্রই কোম্পানী তার রেজিষ্টার্ড তাঁতী সংখ্যা দারুনভাবে হ্রাস করে। প্রতিটি ফ্যাক্টরীর অধীন যে সমস্ত আড়ং ছিল এবং আড়ংয়ে পূর্ববর্তী সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ মাত্র কর্মে নিযুক্ত হয়। বাকী দুই তৃতীয়াংশের 'চরে খাওয়ার' মতো অবস্থা দাঁড়ায়। তখন আর তাদের পূর্বের মতো অন্য ইউরোপীয় কোম্পানীর বা দেশীয় বণিকদের কাছে বস্ত্রবিক্রয় করলে বাধা দেওয়া হতো না। নাম মাত্র লাভে স্থানীয় হাট-বাজার বা মহাজনের কাছে বিক্রী করে দিয়ে আসে। খাট্টোরা, চান্দুলিয়া, শান্তিপুর, সোনামুখি, গোলাগড় প্রতিটি ফ্যাক্টরীর অধীন আড়ংগুলোয় প্রায় অচলাবস্থা দেখা দেয়। কোম্পানী নতুন আইন অনুসারে আর 'অ্যাডভান্স' সহজে দেয় না। হুগলী জেলার গোলাগড় ফ্যাক্টরীর রেসিডেন্ট জানান যে, চন্দননগরের চৌদ্দশত তাঁতীর মধ্যে মাত্র দুই শত থেকে তিন শত তাঁতী হুগলী আড়ং থেকে 'অ্যাডভান্স' গ্রহণ করেছিল। বাকী একহাজার থেকে বারোশত তাঁতী কিছুতেই 'অ্যাডভান্স' গ্রহণ করতো না।

১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই ফেব্রুয়ারী 'বোর্ড অব ট্রেড' এর কার্যবিবরণীতে চন্দননগরের অতি উত্তম বস্ত্রবয়নের কথা উল্লেখ আছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ চন্দণনগরের ফরাস-ডাঙ্গার সেই দক্ষ তাঁতশিল্পীরা ঊনবিংশ শতাব্দীর পর্দাপনের কালেই ইংরাজ বণিকদের রক্তশোষণ নীতির দৌলতে তাদের কাছ হতে আর 'অগ্রিম দাদন' গ্রহণ করতেই অস্বীকার করতো, শেষে তারা পেশাই ত্যাগ করতে থাকে। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে চন্দননগরে আদমসুমারী রিপোর্টে উল্লেখ আছে ঐ সময়ে লোকসংখ্যা ছিল ৪১,৩৭৭ জন। বর্তমানের চন্দননগরে ফরাসডাঙ্গায় এখনও কয়েকটি তাঁতী পরিবারের বাসবাস আছে। এক সময় যখন সরস্বতী নদী সুপ্রশস্ত এবং নাব্য ছিল তখন অন্যান্য দেশের সঙ্গে সরস্বতী নদীর উজানে সপ্তগ্রাম বন্দরের মধ্য দিয়ে চন্দননগরের সিল্ক-বস্ত্রের ব্যবসা বাণিজ্য চলত।

গোলাগড় ফ্যাক্টরীর অধীন খানপুর আড়ংয়ের ৭০০ জন, গৌরিপুরের ১০৫২ জন, গুড়াপের ৪৭০ জন, গোলাগড় আড়ংয়ের ১৪০০ জন এবং মাজেনানের ৩৮০ জন তাঁতী সম্মিলিত ভাবে, ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে কলকাতা স্থিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 'বোর্ড অব ট্রেড' এর নিকট তাদের দুরাবস্থার কথা জানিয়ে এক গণদরখাস্ত পেশ করে। ঐ বৎসরের ১৭ই আগষ্ট 'বোর্ড অব্ ট্রেড' এর প্রসিডিংস্ বা কার্যবিবরণীতে ঐ গণদরখাস্ত নথিভুক্ত করা হয়। মোট ৪০০২ জন তাঁতীর স্বাক্ষর সম্বলিত ঐ গণদরখাস্ত পেশ করা গণবিক্ষোভ প্রদর্শনের এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

মালদহে ফ্যাক্টরীর চতুর্দিকে তাঁতীর সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। এখনকার শিল্পীরা পাতলা 'মলমলখাস' মসলিন এবং পাগড়ীর কাপড় উৎপন্নে অসাধারণ দক্ষ ছিল। লুমের সংখ্যা হ্রাস পেতে দাঁড়িয়ে ছিল ঐ সময়ে ৩৬০য়ে।

তৎকালীন শাহাবাদ জেলায় ৭০২৫ টি গৃহে মসলিন ও সুতিবস্ত্র প্রস্তুত হতো, লুমের সংখ্যা ছিল ৭৯৫০টি। তাঁতশিল্পীর সংখ্যা ছিল ঐ সংখ্যা থেকে ঢের বেশি। কিন্তু তারা বয়ন কার্য পরিত্যাগ করে চাষের কাজে প্রবেশ করেছিল।

চিটাগাঁং ফ্যাক্টরীর অধীন আড়ংয়ের সংখ্যা ছিল অনেক। বৎসরে তাঁতশিল্পীরা উৎপাদন করতো চল্লিশহাজার পিস মসলিন (Gurrali এবং Baftaes) যার মূল্য তৎকালীন সময়ে ছিল একলক্ষ টাকা (Duss Massa) আর তার অর্ধেকও তারা ইংরাজ কোম্পানীকে সরবরাহ করতো না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকের কথা।

ইংরাজ বণিকরা যখন ভারতবর্ষে শোষণ আর অত্যাচারের যন্ত্রগুলো উত্তমরূপে চালু করতে পারেনি তখনও বাংলার মসলিন ও সিল্ক বস্ত্রের বহির্বাণিজ্য চালু ছিল একদিকে আরব অপরদিকে ফিলিপাইন, বার্মা ও পূর্ব এশিয়ার দেশে দেশে, আফ্রিকা থেকে চীনে সমুদ্রপথে। ভারতীয় মসলিন তখন খ্যাতির শীর্ষে। ঐতিহাসিক পিরাড (PYRAD) বলেছেন—"Every one from 'Cape of Good Hope' to China, man and woman is clothed from head to foot, in the products of Indian Looms." (W. H. Moreland : India at the Death of Akbar)। ইউরোপ ও ভারতবর্ষের মধ্যে যাবতীয় বাণিজ্যের জন্য তৎকালে উত্তমাশা অন্তরীপ ব্যবহৃত হতো।

ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ বা নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের জন্য ইংলণ্ডের বাণিজ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশক এবং উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে ভয়ঙ্কর শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল যার ফলে ফ্যাক্টরী এবং আড়ংগুলোর আওতাধীন রেজিস্টার্ড তাঁতীদের পূর্বের মতো 'অ্যাডভান্স'

দেওয়া আর সম্ভব হচ্ছিল না ইংরাজ কোম্পানীর পক্ষে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ছিল ঠিক এর বিপরীত অবস্থা। ঢাকা পরগণা বা ডিভিসনের তাঁত শিল্পীদের দুরাবস্থা চরমে ওঠে যখন কোম্পানী 'ইনভেষ্টমেন্ট' এর পুরাতন নীতির খোলনলচে বদলে দেয়। পূর্বেকার সেই বাধ্যবাধকতার বা 'দাদন' নেওয়ার জোরজুলুমের কোন অস্তিত্ব ছিল না।

'অ্যাডভান্স' করার পূর্বতন নীতি বদলে দেওয়ার ফলে তাঁতশিল্পীরা সঙ্কটের আবর্তে পড়ে যায়। ঢাকা বিভাগের প্রতি কোম্পানীর প্রথম থেকেই দৃষ্টি ছিল। তাঁতশিল্পীরা যখন পুরাতন পেশা পরিত্যাগ করতে আরম্ভ করে তখন ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর তরফ থেকে নিম্নোক্ত প্রতিবেদন পেশ করা হয় ঃ—

".....We apprehend that the decrease of the horrible Company's investment, a decrease severely felt by the manufacturers, and rise in the price of cotton (from three rupees to eight rupees per mand) from the failure of the crops for the last two yars, has most materially contributed to injure this branch of commerce; and on the whole, we are of opinion, that in the want of investment for this as well as other articles of export (its prime source of riches), this dicision has essentialy suffered by the long continuance of the war and that the complete revival of its trade and manufactures can easily be looked for in the lapse of years of un interrupted peace."

মেদিনীপুর থেকে ম্যাজিষ্ট্রেট ষ্ট্র্যাচি ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী ইংলণ্ডে 'হাউস অব কমনস' এর কাছে প্রদত্ত রিপোর্টে যুদ্ধের জন্য কোম্পানীর ইনভেস্টমেন্ট ক্ষমতা হ্রাস বা বিলীন হওয়ার ফলে বাংলার তাঁতীরা খোরাকী বা ভরণপোষণ ব্যয়ের সহায়করূপে যে অগ্রিম অর্থ পেতো তাও বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে তাঁতীদের তাঁতবস্ত্র বয়ন কার্য পেশা হিসাবে ত্যাগ করার উল্লেখ করেন। হুগলী থেকে ম্যাজিষ্ট্রেট ব্রুক তাঁর প্রদত্ত রিপোর্টে উল্লেখ করেন যে, শিল্পে যে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তার ফলস্বরূপ তাঁতীরা পেশা ত্যাগ করে দলে দলে দেশত্যাগ করছে। যারা ম্যানুফ্যাকচারার তারাও পেশা ত্যাগ করে যাচ্ছে।

নদীয়ায় জজ এবং ম্যাজিষ্ট্রেট ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই জানুয়ারী লিখিত পত্রে একই চিত্র তুলে ধরেছিলেন। হুগলী এবং নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেটগণ বিশেষভাবে জোর দেন 'stagnation of trade' এই পরিস্থিতির ওপর। নদীয়ার রিপোর্টেও তাঁতশিল্পীদের

সংখ্যা ক্ষয়প্রাপ্তির কথা উল্লেখ ছিল। কোম্পানীর ব্যবসা প্রকৃতপক্ষে বন্ধ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছলো।

শান্তিপুরের কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট জে, জবলিউ, প্যাক্সটন কলকাতার 'বোর্ড অব ট্রেড' কে প্রদত্ত রিপোর্টে তাঁতীদের দুরাবস্থার কথা উল্লেখ করেন। তিনি জানান যে, বহু তাঁতশিল্পী পরিবার শান্তিপুর থেকে পলায়ন করেছে। অভাবের তাড়নায়, অনেকে আত্মগোপন করেছে, খুবই স্বল্প সংখ্যক তন্তুবায়ী এলাকায় বাস কবছে যারা লগ্নী পুঁজির ছিটে ফোঁটা পেয়েছে। টানা চার পাঁচ বৎসর যাবৎ ফ্যাক্টরীতে পুঁজির নিদারুণ অভাব শুরু হয়েছিল আর সেই অভাব নিয়মিত ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। শান্তিপুরের মতো শহরের ফ্যাক্টরীগুলো শেষ পর্যন্ত তো তাঁতীবিহীন, শুনশান, প্রাণহীন রূপ পরিগ্রহ্ করেছিল।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ শে জুলাই 'বোর্ড অব্ ট্রেড' এর কার্যবিবরণীতে পাওযা যায় যে, গোলাগড় ফ্যাক্টরীর কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট হেনবী উইলিয়াম হাউস অব্ কমনসে প্রেরিত প্রতিবেদনে তাঁতশিল্পীদের শোচনীয় অবস্থার কথা উল্লেখ করেছিলেন। রেসিডেন্ট জানাচ্ছেন, এক নাগাড়ে চার পাঁচ বৎসর ফ্যাক্টরীতে কোন অর্থলগ্নী হয় নি। 'ইনভেস্টমেন্ট' এর টাকাই এসে পৌছায় নি, ফলে বকেয়া যেটুকু আদায় হয়েছিল তাই দিয়েই 'দিন আনি দিন খাই' চলছিল। ফলে উৎপন্ন বস্ত্রের গুণগত মানও খারাপ হচ্ছিল।

সোনামুখি (বাঁকুড়া) ফ্যাক্টরীর রেসিডেন্ট জন চীপ 'বোর্ড অব্ ট্রেড' এর নিকট অনুযোগ প্রকাশ করে জানান (বোর্ড কার্যবিবরণী ১লা আগষ্ট, ১৮০৬ খ্রীঃ) যে, 'আড়ংয়ের নিয়মানুযায়ী কেবল উচ্চগুণসম্পন্ন বস্ত্রগুলি গ্রহণ করা হয়। অপেক্ষাকৃত ত্রুটি যুক্ত বস্ত্রসম্ভার ফেরৎ দেওয়া হয়। গত তিন বৎসর যাবৎ 'ইনভেস্টমেন্ট' এর পরিমাণ ক্রমশঃই হ্রাস পাচ্ছিল, যার জন্য 'ফ্যাক্টরী' রুগ্ন হয়ে পড়ে। এব ফলে তন্তুবায়ীরা অধিকাংশই কর্মহীন হয়ে পড়ে। যদি কোন তাঁতী একবার কর্মহীন হয়ে পড়ে তাবে আর লুমে ফেরানো খুবই কঠিন ব্যাপার।

'হাউস অব্ কমনস্' এ প্রেরিত প্রতিবেদনে তন্তুবায়ীদের কর্মহীনতার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয় ঃ— "The inconveniences arising from the want of employment for this useful class of our native-subjects may be hereafter most severely felt and prove highly detrimental to our commerce, for should the blessing of peace be once rested or any other circumstance occur to ocoasion an increased demand for peace goods in Bengal, it may be found impracticable to meet

it, for when a weaver once quits his loom resorts to any other mode of employment which shall yield him where that to live upon, it may be appiehended that he will feel no induement of return to his 100ms. (Parliamentaly Papers 1812-13A. D.)

১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী 'প্রাইভেট ট্রেডারস'দের মসলিনবস্ত্র উৎপাদন, ব্যবসা ও বাণিজ্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে উন্নতমানের বস্ত্রের যান্ত্রিক উৎপাদন শুরু হয়ে গিয়েছে। বাংলার মসলিন বস্ত্রের কোয়ালিটি যাতে অপরিবর্তিত থাকে বা বিভিন্ন গুণ সম্পন্ন বস্ত্রের গুণানুপাতিক মান স্থির থাকে সেই পদ্ধতিতে বস্ত্রবয়ন ও সংগ্রহে কোম্পানী অবিচল থাকার কথা ঘোষণা করলো, তবে ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে সূক্ষ্মতা সম্পর্কে প্রতিদ্বন্দিতাই বন্ধ হয়ে যাওয়ায় 'ইনফিরিয়র কোয়ালিটি'র উৎপাদন বাড়তেই থাকে।

বেনারসের কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট সি. আর. ক্রোমোলিন কলকাতাস্থিত বোর্ড অব্ ট্রেড' এর নিকট প্রেরিত বার্তায় ইংলণ্ডের দ্রুত পরিবর্তনশীল বস্ত্র শিল্পের ফলে মসলিন বস্ত্র উৎপাদন বয়ন ও বাণিজ্য কিভাবে পরপর কয়েক বৎসর ব্যাহত হচ্ছে তার উল্লেখ করেন। যে ভাবে 'প্রাইভেট মার্চেন্ট'রা ব্যবসায়ের ময়দানে নেমেছে তার ফলে মার্চেন্টদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতা বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু উৎপাদন, নৈপুণ্য প্রদর্শনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তখন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। 'ইনভেস্টমেন্ট' ও কার্যত বন্ধ, অগ্রিম দাদন প্রদানপ্রক্রিয়াও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মসলিন তন্তুবায়ীরা কর্মহীন হয়ে পড়তে থাকে, দেশীয় তুলাজাত নিকৃষ্ট মানের বস্ত্র উৎপাদনের জন্য তখনও কিছু তাঁতশিল্পী যুক্ত থাকে।

মার্চ ১৮০৮ খ্রীঃ মেদিনীপুর জেলার ক্ষীরপাই, চন্দ্রকোণা এবং রাধানগর আড়ং গুলোর রেজিষ্টার্ড ৮৪ জন হেড তাঁতী 'বোর্ড অব্ ট্রেড' এর নিকট গণদরখাস্ত পেশ করে। তারা জানায় যে, গত বৎসর অর্থাৎ ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে থেকে কোম্পানীর 'ইনভেস্টমেন্ট' এর পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় তন্তুবায়ীদের আর্থিক কষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং চরম ক্ষতির সম্মুখীন। ইতিমধ্যে 'ইনভেস্টমেন্ট' পুরাপুরিই বন্ধ। দ্বিতীয় 'অ্যাডভান্স' দেওয়াও এরপর বন্ধ। তন্তুবায়ীরা জানাচ্ছে যে, অগ্রিম দাদন বা অ্যাডভান্স পুরাপুরি বন্ধ হবে না এই আশ্বাসে তারা বিভিন্ন প্রাইভেট মার্চেন্ট দের কাছ হতে ঋণ গ্রহণ করেছিল। এখন সমূহ বিপদ উপস্থিত কারণ কোম্পানী অগ্রিম দাদন বা অ্যাডভান্স দেওয়াই স্থগিত অথবা বন্ধ করে দিয়েছে। এইরূপ পরিস্থিতি শিল্পীদের বিপদগ্রস্ত করেছে, হতাশা সৃষ্টি করেছে। অনেকেরই অবস্থা এখন চরম আকার ধারণ করেছে যে তারা গৃহত্যাগ করে পথে পথে

ভিক্ষা বৃত্তি গ্রহণ করেছে (for want of Company's advances, many weavers have left their houses, begging from place to place and many were starving (Ref. Dr. D. B. Mitra's The Cotton weavers in Bengal p. 76)'

হরিয়াল ফ্যাক্টরীর অধীন ১৪১ জন প্রধান তাঁতী(হেড উইভার্স) ফ্যাক্টরীর কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট হেনরী উইলিয়ামের কাছে নিজেদের আর্থিক দুরাবস্থার বিস্তৃত বিবরণ পেশ করে এক গণদরখাস্তের মাধ্যমে। তাঁতীদের বক্তব্য ছিল ঐ ফ্যাক্টরীর অধীন আড়ং গুলোয় ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার পিস মসলিন বস্ত্র তৈয়ার হচ্ছিল। তাঁতের সংখ্যা ছিল ৫২০০। ১৮০৭ সালেও তাঁতগুলো মোটামুটি চলছিল। কিন্তু ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৩৪৮০ পিস মসলিনের অর্ডার এসেছে। যার জন্য তাঁতপিছু আট থেকে দশ পিসের বেশি মসলিন উৎপন্ন করা যাচ্ছিল না। তাঁতীরা কোম্পানীর কাছে প্রেরিত আর্জিতে জানায় যে তাদের পূর্বপুরুষগণও কোম্পানীর অধীনে বা তারও পূর্বে এই পেশায় নিযুক্ত ছিল। এখন তারা সম্পূর্ণ কর্মহীন হয়ে পড়েছে। সংসার প্রতিপালন অসম্ভব হয়ে পড়েছে তন্তুবায়ীরা দাবী করে ইনভেস্টমেন্টের পরিমাণ বৃদ্ধি করার। কিন্তু কোম্পানী বাংলার মসলিন বস্ত্রের বিদেশে রপ্তানী নীতি ইতিমধ্যেই সঙ্কুচিত করেছে। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দ সেই বছর যেখান থেকে বাণিজ্য সঙ্কোচন নীতি কোম্পানী কার্যকরী করতে উঠে পড়ে লাগে। কারণ ইতিমধ্যেই মসলিন উৎপন্ন যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। লড়াই করতে করতে মসলিনের উৎপাদনকারীদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে। শ্রমের কোন মূল্য সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদীরা যে কোন যুগেই স্বীকার করে না ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় অবশ্য সে চিন্তা করার সময় আসেনি শ্রেণীচেতনাহীন তৎকালীন যুগের তাঁত শ্রমিকদের। বৎসরের প্রায় অর্ধেক সময় তাঁত শিল্পীদের যে কোন কাজ থাকে না তা কলকাতাস্থিত 'বোর্ড অব ট্রেড' কে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন শান্তিপুর ফ্যাক্টরীর কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট চার্লস বেইলি। শান্তিপুরের মসলিন উৎপাদনকারী তন্তুবায়ীরা এর পর সস্তায় বস্ত্র, ছিট বস্ত্র যার গুণগত বৈশিষ্ট্য প্রায় নেই বললেই হয় সেই সব প্রায় নিকৃষ্টমানের বস্ত্র সম্ভার প্রস্তুত এবং তা স্থানীয় বাজারে বিক্রয়ের মাধ্যমে যৎসামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় নির্বাহ করে আর কিছু তাঁতী অর্থসংকটে জর্জরিত হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে অথবা বৈরাগী সন্ন্যাসীদের দলে যোগ দিতে দেশত্যাগ করেছিল।

ঢাকা, চট্টগ্রাম, শান্তিপুর, হারিয়াল, হরিপাল, গোলাগড়, মালদা, সোনামুখী সর্বত্র বাংলার মসলিন উৎপাদনের জন্য ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে ফ্যাক্টরীগুলির

রেজিষ্টার্ড তন্তুবায়ীদের নিয়ে আর এখন ইংরাজ বা ডাচদের মধ্যে দড়ি টানাটানি চলে না। ফরাসী, আর্মেনিয়ান, পর্তুগীজ, গ্রীক প্রভৃতি বণিক সংস্থাগুলির মধ্যে আর তেমন গরজের বালাই নেই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের প্রারম্ভেই তাঁত বস্ত্র আর বাণিজ্যিক উপকরণ নয়। বৈদেশিক বাণিজ্যের রমরমা স্তিমিত। তাঁতীদের এখন এক হাতে তাঁত অপর হাতে চাষের লাঙ্গল। যারা মহিলা তাঁত শিল্পী তারা সকলেই জীবিকাচ্যুত। অর্ধউলঙ্গ বুভুক্ষু শিশু ও কিশোররা কেন উদাসদৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। অনেকের পিতা মাতা তাদের পরিত্যাগ করে গ্রাম ত্যাগ করে পলাতক। এখন আর জোর করে 'দাদন' ধরিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটে না। 'আড়ং'গুলোয় তাঁতীদের আনাগোনা আর নেই বললেই চলে।

১৮১৮ সালেই ঢাকা এবং শান্তিপুরের সমস্ত ফ্যাক্টরী এবং ১৮১৯ সালে পাটনা ও অপরাপর ফ্যাক্টরীগুলির দরজা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হলো। ১৮২৫ সালের মধ্যে সমস্ত বাকী ফ্যাক্টরীগুলো বন্ধ হয়ে যায়। যন্ত্রণা ভোগ করেও তন্তুবায়ীরা তাঁতবস্ত্র বয়নের মাধ্যমে যৎসামান্য হলেও পরিবারের অন্নসংস্থান করছিল ধীরে ধীরে সে প্রদীপও নিভে গেল। ইংরাজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, পর্তুগীজ, গ্রীক, আরবীয়, আর্মেনীয় বণিকরা সর্বোপরি ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁত শিল্পীদের সাতপুরুষের হস্তশিল্প দখল নিতে, দখলে রাখতে যে নিপীড়ন চালিয়েছিল তারই অনিবার্য পরিণতিতে শিল্পটার ঢাকিশুদ্ধ বিসর্জন হয়ে গেল।

এভাবেই শেষ হলো বাংলার মসলিন বস্ত্রের বাজার দখলের জন্য ইংরাজ এবং ইংরাজ ব্যতীত অন্যান্য ইউরোপ, পূর্ব এশিয়া ও আরব বণিকদের মধ্যে দীর্ঘতম লড়াইয়ের ইতিহাস। এ লড়াইয়ে জয়ী হয়েছিল ইংরাজ উপনিবেশবাদী-সাম্রাজ্যবাদীরা। যুদ্ধে কেবল বিপক্ষ শক্তিদেরই ওরা পরাস্ত করে নি শিল্পটাবই নাভিশ্বাস তুলে দিয়েছিল। এরপরও যৎসামান্য বাকি ছিল। এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পরও যে অল্পসংখ্যকের অস্তিত্ব বজায় ছিল তাহাই সম্বল করে বিংশ শতাব্দীতে বাংলার তাঁতশিল্পীরা পদার্পণ করে। ওরা যেন অমর, অক্ষয়, অজেয়, কিন্তু মসলিন বস্ত্রের উৎপাদনের লগ্ন শেষ হয়ে গিয়েছে তার পূর্বেই। মসলিন শিল্পী যদি কেউ জীবিত থাকেন, তবে তাঁকে হন্যে হয়ে খুঁজে বের করতে হয়। পূর্বপুরুষদের লড়াইয়ের ইতিহাস হয়তো তাঁরও অজানা। তাঁতশিল্পী অধ্যুষিত পুরাতন সেই 'আড়ং' গুলোয় বা ফ্যাক্টরীগুলোর কোন চিহ্নই আর নেই। এখন একবিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ ঘটেছে। এখনও মহাজনশ্রেণী আছে বহাল তবিয়তেই আর আছে তাঁতবিহীন তন্তুবায়ীদের বিশাল এক বাহিনী। গ্রামে পাখীর কলতান আছে। আছে গাছ গাছালি,

শুষ্কনদী, নেই তাতে জলের দীর্ণ বিদীর্ণ শব্দ। নদী পথে বাণিজ্য পোত আনাগোনার কাহিনী এখন জনশ্রুতি, গল্প। নদীতে নেই খরস্রোত। নদী এখন নালায় পরিণত। এখনও যে সব গ্রামে কিছু তাঁতি আছে, তাঁত আছে তাদের কাছে মসলিন যুদ্ধের ইতিহাসের কথা এক অপূর্ব অনাস্বাদিত ঐতিহাসিক কাহিনী।

মসলিন বস্ত্র উৎপাদন এবং বিপননে বাংলার তাঁত শিল্পীদের খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া। কিন্তু ইংরাজগণ ভারতে পদার্পণ করার এবং বাণিজ্য করার সনদ প্রাপ্তির পর থেকেই সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশবাদী শিবিরে আলোড়ন পড়ে। সে সপ্তদশ শতকের কথা। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিশেষতঃ পলাশীযুদ্ধের ঘটনাবলীর অব্যবহিত পর থেকেই ইংরাজরা বাংলার মসলিন বস্ত্রের বাণিজ্য ও বিপণন থেকে মুনাফা সংগ্রহ করতে যেয়ে প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করে উজ্জ্বল গৌরবের অধিকারী বাংলার তাঁতশিল্পীদের বিরুদ্ধেই। পঞ্চাশ বৎসরের দীর্ঘ লড়াইয়ে ইংরাজরা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে অক্ষম দস্যুরূপে আখ্যায়িত হয়ে তাঁতী আর তাঁত সবশুদ্ধ ধ্বংস করে দিল। এইভাবে ভাবতবর্ষের মাটিতে পুঁজিবাদ জন্মদিল নতুন এক সর্বহারা শ্রেণীর, ইংলণ্ডে বাণিজ্যিক বুর্জোয়াশ্রেণী রূপান্তরিত হলো শিল্পবুর্জোয়াশ্রেণীতে অন্যদিকে ফ্যাক্টরী বা শিল্পী-কাবখানা প্রতিষ্ঠা হওয়ার সৃষ্টি হলো কর্মরত শ্রমিক শ্রেণীর। অফিস কর্মচাবী, বাণিজ্যিক কর্মচারী, প্রযুক্তিবিদ এইরূপ অগণিত শ্রমজীবি মানুষের। এ সম্পর্কে কার্লমার্কস এবং এঞ্জেলস তাঁদেব 'কমিউনিষ্ট ইশতেহার' গ্রন্থে বুর্জোয়াদেব ভূমিকা বিশ্লেষণ কবে লেখেন ঃ—"বুর্জোয়ারা তাদের পণ্যের বাজার নিরন্তব বাড়াতে গোটা বিশ্বে ছুটে বেড়াচ্ছে। তাকে সর্বত্র ঘাঁটি গড়তে হবে। সর্বত্র বসতি স্থাপন করতে হবে। সর্বত্র-যোগাযোগ গড়ে তুলতে হবে।" এই ভাবে ইংলণ্ডের লগ্নীপুঁজি বিশ্বায়নের পথে প্রাচ্যে একের পর এক দেশে ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল। ভারতবর্ষের মাটীতে সমৃদ্ধশালী এক বাজারের সন্ধান লাভ করার পর আরও অন্ততঃ একশতবৎসর অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শেষাবস্থা থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ করার মধ্য দিয়ে বাংলার তথা ভারতবষের বুকে যে পুঁজিবাদের উদ্ভব হলো তারা গাঁটছড়া বাঁধলো এদেশের শোষক সামন্তশ্রেণীর সঙ্গে। পুঁজিবাদী শোষণ যন্ত্রণার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উৎপাদন যন্ত্রের আধুনিকীকরণ ঘটতে থাকে। হস্ত চালিত তাঁত বস্ত্রের মর্যাদা ধুলায় লুণ্ঠিত হলো। শ্রেণীবিভক্ত সমাজব্যবস্থায় সপ্তদশ শতকে ভারতবর্ষের মাটীতে সম্পত্তিবান ও সম্পত্তিহীন শ্রেণীর মধ্যে যে তীব্র সংঘাত, বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দুই বিপরীত মেরুসদৃশ শ্রেণীর মধ্যে বৈরীতা থেকে সমাজের আভ্যন্তরীণ সংকট সৃষ্টি করলো, শ্রমিক শ্রেণীর জীবন ধারণের মানেরও চবম অবনতি ঘটলো। সমাজের

সমস্ত সম্পত্তির মালিক হয়ে বসলো বিদেশী ইংরাজ আর তাদের অনুগত দেশীয় নৃপতি ও ভূস্বামীদের দল। লাগামহীনভাবে তন্তুবায়ী সমাজ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। প্রযুক্তিগত বিপ্লব সুখীসমাজ গড়ে তুললো ইংলণ্ডের বুকে আর তার ধাক্কায় বাংলা তথা ভারতবর্ষে চিরন্তন বুনিয়াদী শিল্পটি একেবারে মুখ থুবড়ে পড়লো। মজুরী প্রাপ্ত (বা উৎপন্ন বস্ত্রেরমূল্য বাবদ) শ্রমিকরা অন্যান্য শ্রমজীবি মানুষ এমনকি কৃষকও ভূমিহীন কৃষকদের সঙ্গে মিশে গেল। নির্দিষ্ট পেশার অগণিত মানুষগুলো নিজেদের পেশা পরিত্যাগ করে শ্রমিক শ্রেণীর মজুদবাহিনীর সঙ্গে মিশে গেলো। ইউরোপীয় পুঁজিবাদ রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক তিনদিক দিয়েই অভূতপূর্ব আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে বাংলাকে সর্বাগ্রে শ্মশানে পরিণত করে ছাড়লো। পাশাপাশি 'ইনভেস্টমেন্ট' এর নাম করে ইংরাজ কোম্পানী ভারতবর্ষের বাজার থেকে অধিক মুনাফা সংগ্রহের আশায় যে তহবিল ইংলণ্ডে গড়ে তুলেছিল তাতেও টান পড়লো। শেষ পর্যন্ত হস্তচালিত তাঁত বা হ্যাণ্ডলুমের স্থানটি এককথায় দখল নিল উন্নত সভ্যতা বা প্রযুক্তিগত বিপ্লবের উন্মাদনাসৃষ্টিকারী ব্রিটিশ পুঁজিবাদীরা আর তাদের সৃষ্ট দেশীয় জমিদারশ্রেণী এই সময় ভারতবর্ষের রাজ্যে রাজ্যে সর্বত্র সর্বহারা শ্রেণী অস্তিত্বের নিরাপত্তাহীনতার সংকটের আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। ইংলণ্ড যখন শিল্প বিকশিত একটি দেশে পরিণত হয়ে গর্বোদ্ধত শিরে বিশ্বময় দাপিয়ে বেড়াতে শুরু করে তখন ভাবতবর্ষ শুষ্ক মুখে শুষ্ক কণ্ঠে ছিন্ন জীর্ণ ময়লা পোষাক পরিহিতা উপনিবেশবাদীদের দ্বারা লাঞ্ছিতা জননীর প্রতিরূপ ব্যতীত অন্য কোন অভিধায় তাকে অভিহিত করা যেতো না।

২৭

গোলাগড় ফ্যাক্টরীর অধীন ৪০০২ জন তাঁতীর গণদরখাস্ত যা ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই আগষ্ট কলকাতাস্থিত 'বোর্ড অব ট্রেড' (কমার্শিয়াল) নিকট পেশ করা হয় তাতে কিছু স্বাক্ষরকারীর নাম 'ষ্টেট আর্কাইভস' বা রাজ্য লেখ্যাগারে পাওয়া যায়। নামগুলি ইংরাজীতে বর্ণিত আছে এবং মূল দরখাস্তের ইংরাজী অনুবাদেব সঙ্গে সংরক্ষিত করা আছে। হুবহু তাই এখানে তুলে দেওয়া হলো। সুবিধার জন্য নামের বাংলা শব্দ বন্ধনীর মধ্যে আমরা উল্লেখ করলাম।

Fort William, The 17th August, 1804
Petitioners of Golagore Factory.

Tonoo Das (টুনু দাস), Mothoor Gooyeen (মুথুর গুঁই), Ramjoy Pall (রামজয় পাল), Prasad Nandy (প্রসাদ নন্দী), Mohon Pall (মোহন পাল), Crishna Nandy (কৃষ্ণনন্দী), Conny Pall (কোনী পাল), Pacheowrhy Gooyeen (পাঁচৌরী গুঁই), Nubbye Purohit (নুবী পুরোহিত), Banchharam Daas (বাঞ্ছারাম দাস), Shib Ram Dutt (শিবরাম দত্ত), Ram mohan Pall (রামমোহন পাল) and others.

1052 weavers of Factory Gouripore.

Gooroo Persad Pramanick (গুরুপ্রসাদ প্রামাণিক), Choytan Dass (চৈতন দাস), Ram Bhudder Dutt (রাম ভদ্র দত্ত), Becharam Dutta (বেচারাম দত্ত) Ram Chunder Dass (রামচন্দ্র দাস) Goyaram Day (গয়ারাম দে) and others.

200 weavers Inhabitant of Khan Poor. Ramtonoo Dalai (রামতনু দালাল), Gopal Dalal (গোপাল দালাল) Raghoonath Nandy (রঘুনাথ নন্দী) Lalbeharry Daas (লালবিহারী দাস) Choyton Choron Dass (চৈতনচরণ দাস) and others.

470 weavers of Goorap Gooroo Persad Pramanick (গুরুপ্রসাদ প্রামানিক) Narohorey Daas (নরহরি দাস) Gour Lo (গৌর লো) Shuneur Nundy (সুনের নন্দী) and others.

1400 weavers of Golagore, Dhurmadas Daas (ধর্মদাস দাস) Nitye Pramanick (নিত্য প্রামানিক) Tono Nundy (টুনু নন্দী) Ram Kishore Nundy (রামকিশোর নন্দী) Lakkhun Putter (লক্ষ্মণ পাত্র) and others.

380 weavers of Majenan

A true Translation

W. C.

Ordered that a copy of the avove petition be transmitted to the Resident at Golagore with directions to investigate the severel complaints there in enumerated and to furnish a seperate report on each charge as prepared by the petitioners inserting for the sake of easier reference his remarks oposite to the charge to which they related.

Translation of a Petition from Naaloo Bhur & c. a. weavers of Dooarhattah factory, 1801, recorded in the Proceedings of the Board of Trade (Commercial) 3rd March, Proceedings No. 17.

"We are unwilling to weave cloths for the Horible Company. The gomostah has given us advances to put us to great expense for peancharges and will not pay us the Balances due to us. He places pens over those who are in Balance to the Factory and Collects the outstanding balances in this manner. We, therefore pray that the Board will order Mr. Philpot, the Resident at Doorhattah to receive what ever balances stand against us after giving us credit for what is due and excuse us for receiving advances.

Signed Naaloo Bhur (নালু ভড়) Doolal Daas (দুলাল দাস) Cauloo Dass (কালু দাস) Birjo Coondoo (ব্রজ কুণ্ডু) Dadhoo Condoo (দাদু কুণ্ডু) Sobeer Dutto (সুবীর দত্ত) Mudun Chundo (মদন চন্দ) Brigo Chundo (ব্রজ চন্দ) Ram Mohan Coondoo (রামমোহন কুণ্ডু) Ram Kishore Bhur (রাম কিশোর ভড়) Saluck ram Pall (শালুকরাম পাল)

Ordered that the petition be referred to President and he be desired to state such Information There upon as he may be able to afford.

Fort William, the 3 maich, 1801

ইংরাজ কোম্পানী কর্তৃপক্ষের কাছে উক্ত আবেদন পত্রে নারী শ্রমিকের নাম পাওয়া যায় নি। যদিও কিছু নাম উল্লেখ করার পর আরও সহস্রাধিক শ্রমিকের কথা এক গোলাগড় গ্রাম থেকেই স্বাক্ষর দানের কথা বলা হয়েছে। ইংরাজদের তলপীবাহক গোমস্তারা তৎকালীন যুগে সমাজের বুক প্রচণ্ড প্রতিপত্তিশালী এবং অত্যাচারী ছিল। তাদের সেই শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে গণ প্রতিবাদপত্রে স্বাক্ষর করা তৎকালীন যুগে নিঃসন্দেহে বলিষ্ঠ সাহসের পরিচয়।

বাংলার সুপ্রাচীন হস্তচালিত তাঁত শিল্পের অবস্থা ইদানীং বড়ই মুমূর্ষু। তাঁত শিল্পীরা এখন প্রকৃতপক্ষে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে ব্যস্ত। তাঁতশিল্পের রুগ্নতা কাটিয়ে তোলার জন্য সরকারী উদ্যোগ গতানুগতিক। বৃহদায়তন বস্ত্র মিলে উৎপন্ন বস্ত্রের সঙ্গে

এখন অসম প্রতিযোগীতার সম্মুখীন হস্তচালিত তাঁতশিল্প। উদার আমদানী নীতির জন্য হস্তচালিত তাঁতশিল্প চরম সংকটাপন্ন।

এই গ্রন্থের আলোচ্য সময়কাল বাংলার মধ্যযুগ থেকে পলাশীর যুদ্ধের ঘটনাবলী পার হয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত। তবে দুর্ভিক্ষ প্রসঙ্গ আলোচনার জন্য কেবল ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের ছিয়াত্তরের মন্বন্তরেই নয়, বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের পন্বন্তর (১৩৫০ বঙ্গাব্দ) পাঁচ ও ছয়ের দশক এবং সাতের দশকের দুর্ভিক্ষের কথা আলোচনা করা হয়েছে।

অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলার কয়েকটি 'ইংলিশ ফ্যাক্টরী'র আওতাধীন আড়ংগুলোয় রেজিষ্টার্ড তন্তুবায়ীর নাম যা রাজ্য লেখ্যগার থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে তা পাঠে এই সত্য প্রতীয়মান হয় যে সমাজে উচ্চবর্ণের পরিবারগুলোর মধ্যে তাঁতবস্ত্র উৎপাদন এই জীবিকার প্রচলন ছিল না। দীর্ঘকাল যাবৎ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত লোকজনের নাম তালিকার মধ্যে একজনও নেই। যদিও কোন কোন গবেষকের মতে সমাজের সমস্ত বর্ণের ধর্মের মানুষ মাত্রেই তাঁতবস্ত্র উৎপাদনের প্রক্রিয়া জানতো। উৎপাদনের উপকরণে সমাজের সকলেবই ওপর সম্পূর্ণ দখল ছিল। শ্রম বিভাজনের ক্ষেত্রে তন্তুবায়ীরা যুগযুগ ধরে মহাজনের শোষণের যাঁতাকলে পেষাই হতো।

বাংলার বুকে দুর্ভিক্ষ যত হয়েছে তার প্রত্যেকটি আঘাত করেছে সর্বস্তরের কৃষকদের এবং তাদেব মধ্যে আবার সবচেযে বেশি আঘাত পেয়েছে তাঁতীরা। ইতিহাসের মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত হস্ত চালিত তাঁত শিল্পীদের ওপর যে শোষণ, যন্ত্রণা, নিপীড়নের বন্যা বয়ে যায় তা নিয়ে কোন মাথাব্যথা প্রাক্ স্বাধীনতা যুগেও পরবর্তীকালে জাতীয় নেতাদের মধ্যে ছিল না। ভারতে মোগল শাসন, ব্রিটিশ শাসন এবং স্বাধীনতার কালে কংগ্রেসী শাসনে হতভাগ্য তাঁতশিল্পীবা তাদের নৈপুণ্যতার জন্য কোনকালে প্রশংসিত না হয়ে বরং নৃশংসতাবই শিকার হয়েছে। অথচ মসলিন বস্ত্রের খ্যাতি ছিল পৃথিবী জুড়ে। এখন টাঙ্গাইল জামদানি শাড়ির সুখ্যাতি সর্বত্র। কিন্তু 'ঘবানির ঘরফুটো' প্রবাদ বাক্যের ন্যায় তাঁতশ্রমিকরাও বস্ত্রের অভাবে জেববার তন্তুবায়ী নারী শ্রমিক বা তন্তুবায়ীর ঘরের রমনীরা লজ্জানিবারণের জন্য কোন এক নাম গোত্রহীন শাড়ি পরিধান করতো।

সোনামুখী ফ্যাক্টরীর তন্তুবায়ীগণ তাদের উৎপন্ন বস্ত্রের যথার্থ মূল্য লাভে ক্রমাগত বঞ্চিত হযে উপায়ান্তর না দেখে অগত্যা আদালতের কাছে আর্জি পেশ করেছে। বর্ধমানাস্থিত আদালতে সেই আর্জি সোনামুখীর কমার্শিয়াল রেসিডেন্টের কাছে বিবেচনার জন্য প্রেরণ করলে রেসিডেন্ট সমগ্র বিষয়টি কলকাতাস্থিত 'বোর্ড অব্ ট্রেডে ব নিকট

সুপারিশ সহ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আবেদন করেন। আদালতের নিকট যারা আর্জি পেশ করেছিল তাদের নামসহ ইংরাজী বয়ানটি উল্লেখ করা হলো।

From Resident at Soonamuky :–28th November 1789 to the Board of Trade, 28th November, 1789.

Gentleman,

The weavers of the Soonamooky aurungs having presented arzees to the Judge at Burdwan on the subject of the price of the cloths which he forwarded to me that I might endeavor to settle the matter. I accordingly have exerted every influence in my power with them to accommodate the business and to must their wishes but as the accomodation I have a offer from My self will not answer and as I do not consider Myself authorized to increase the price more especially of Transaction alredy entered in the Factory Books and as that was the prime object of their petition, I offered to give them a letter to you covering their arzee which a deputation of ten persons should carry to the presidency but as they conceive that my going down with those persons will be of use to them and as they seem so much but on that purpose rather than dissatisfy them, I provise to make you acquainted with their request and with your pemission shall repair to the Presidency.

I am anxious to rececive your Orders as earrly as possible, as I can not get them to return to their Houses and attend to their looms until such time as I set off. and as there is nearly a third of the aurungs assembled here, If an object of the utmost Consequence for me, to depart as early as possible.

General petition and my ansewers annexed, I have the honuor to forward to translates :-

I am with
Repee & C. A.
J. Cheap
Resident Soonamooky

সুরুলের যে সমস্ত তন্তুবায়ী আদালতের নিকট আর্জি পেশ করে তাদের নামের তালিকা নিম্নে উল্লেখিত হলো। নামের বানানের সঙ্গে উচ্চারণের অমিল হতে পারে এই আশঙ্কায় আর্কাইভসে রক্ষিত ভল্যুমে ইংরাজী বানান আছে তেমনি বানান বজায় রাখা হলো।

Soorool
The 28th November 1789

Roycharn Dols
Guddadhur Dutt
Nyan Dols
Guluck Day
Telock Dols
Praun dols
Panchoo Dols
Sam Chund
Duchyram Day
of Burdwan

Ram Camoy Dols
Bhum Dols
Hipencont Paul
Bullockram Dols
Omur gopee
Narayın Nundy
Ram Kanta Dutt
Bulloy Gobee
Sookbde Dols
of Beerbhoom

Bungbul Law
Ramdebe Corr
Bullukram Corr
of Bıstupore

& all the weavers of Soonamooky awrungs to the gentleman of Adaulut at Burdwan.

সোনামুখি সুকলে ও বিষ্ণুপুরের আড়ংগুলোয রেজিস্ট্রিভুক্ত তন্তুবাযীবা যথেষ্ট সাহসেব সঙ্গে ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছ হতে উৎপন্ন বস্ত্রের ন্যায্যমূল্যেব দাবীতে আদালতের দ্বারস্থ হয়। এইরূপ বিরল ঘটনার জন্য প্রচলিত আইনের যথার্থতা বা তাব সুষ্ঠু প্রয়োগের ক্ষমতা কত অন্তঃসাবশূন্য তা প্রমাণিত হয়ে যায়। তাঁত শ্রমিকদের মধ্যে যারা আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেছে তাদের পববর্তীকালে কোন শাস্তিভোগ করতে হয়েছে কিনা জানা নেই। তবে যেভাবে দরিদ্র তন্তুজীবিরা ইংরাজ রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে জোট বেঁধে আদালতে আর্জি জানিয়েছিল তাই থেকেও এই সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া যায় যে, সোনামুখী ফ্যাক্টরীর তাঁতশ্রমিকদের মধ্যে চিন্তা ও চেতনার মান যথেষ্ট উন্নত ছিল। কোম্পানীর বেসিডেন্ট নিয়োজিত ফ্যাক্টরী ও আড়ংয়ের ম্যানেজার, গোমস্তা, নায়েব, দারোগা, পাইকারদের পিয়নের মাধ্যমে অত্যাচার চালানোর বিরুদ্ধে সোনামুখী ফ্যাক্টরীব অধীন তন্তুবায়ীরা বারে বারে বিক্ষোভের ঝড় তুলেছিল। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইংলণ্ডে যেমন 'ট্রেড গিল্ড' বা 'ক্রাফট্ গিল্ড' গঠন করে বণিকরা বাজারে প্রতিদ্ব

ও পণ্যের মান বজায় রাখার জন্য সমিতি গঠন করেছিল, সোনামুখিতে শিল্পী ও 'জার্নিম্যান'দের সেইরূপ কোন সংগঠন গড়ে উঠেছিল কিনা জানা যায় নি। হিন্দুস্তানের বাদশাহ্ নবাবরা উৎকৃষ্ট মসলিন বস্ত্রের কদর জানতেন। উৎকৃষ্টতম বস্ত্র (সিল্ক, সুতি, বা মসলিন) প্রস্তুতের জন্য তাঁতীদের সম্মুখে পিছনে চাবুক আর বিচুটি গাছের বেত হাতে ধরে থাকতো বাদশাহ্ নবাব দরবার ও মহল্লা নিয়োজিত সিপাহীরা। দুর্ভিক্ষে যখন তাঁতশিল্পী ও শিল্প দুইই ধ্বংস হচ্ছে তখনও ভূস্বামী সামন্ত প্রভু ও ইংরাজ বেনিয়াদের যৌথ রক্তচক্ষু স্তিমিত হয়নি। এক ফোঁটা চোখের জল ফেলা তো দূরস্ত্। প্রাক্ ব্রিটিশ যুগে যত দুর্ভিক্ষ হয়েছে বাংলায় তার থেকে অনেক বেশি হয়েছে ব্রিটিশ যুগে। তবে ব্রিটিশ ওপনিবেশিক শাসনের অবসানের পরও পশ্চিমবাংলায় বুকে দুর্ভিক্ষ বা দুর্ভিক্ষের ছায়া দেখা দিয়েছে। একাধিকবার এতথ্য পূর্বেই পরিবেশিত হয়েছে।

গত ৪ঠা মার্চ, ১৯৯৯ (খ্রীঃ) বিভিন্ন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় সংবাদ মাধ্যমে 'প্রেস ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়া' সংক্ষেপে পি. টি. আই. পরিবেশিত একটি সংবাদের শিরোনামা ছিল এইরূপ।

''সামাজিক বিকাশে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ চান অমর্ত্য সেন'' (গণশক্তি)। ঐ সংবাদ সূত্র জানায় যে, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বলেছেন যে পৃথিবীর দেশে দেশে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থাই দুর্ভিক্ষের সুতিকাগার এবং ভারতে শেষ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল ১৯৪৩ সালে। ডঃ অমর্ত্য সেন অত্যন্ত সঠিক ভাবেই দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির জনক হিসেবে ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন। তবে তার জন্য শতাব্দী শেষে ব্রিটিশ সরকার এজন্য দুঃখ প্রকাশ করেনি। ওরা এক হাতে 'ইনভেস্টমেন্ট' এর থলি, অপর হাতে বিচুটি গাছের ছালে তৈরী বেত নিয়ে তাঁতশিল্পীদের পরপর প্রজন্মগুলোকে কান্না ঘাম আর রক্তের স্রোত ভাসিয়ে দিয়ে গেছে।

তবে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার অবসানের পরও স্বাধীনভারতে বারংবার পশ্চিমবাংলার বুকে খাদ্যের দাবীতে আন্দোলন আছড়ে পড়েছে। ১৯৫১, ১৯৫৩, ১৯৫৯, ১৯৬৬, ১৯৭৪ এই সালগুলিতে কতশত মানুষ যে দুর্ভিক্ষের প্রকোপে প্রাণ হারিয়েছে তার সঠিক হিসাব জানা নেই। ঐ বৎসর গুলিতে পশ্চিমবাংলা এবং সমগ্র ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতার অধিষ্ঠিত ছিল স্বৈরাচারী সরকার। তারা গণতন্ত্রকে টুঁটি টিপে হত্যা করেছিল। হত্যার আগে বলাৎকার করেছিল। বাংলার তন্তুবায়ীরা ব্রিটিশ শাসন এবং কংগ্রেসী জমানা কোনসময়েই গণতন্ত্রের আস্বাদ পায় নি। উৎপাদনের উপকরণ হিসাবে তারা ব্যবহৃত হয়েছে। কখনও স্বাধীনতা কি বস্তু তারা তা জানতে পারে নি। নিজেদের শক্তি সামর্থ্য

অনুযায়ী বা পছন্দমতো দৃষ্টিনন্দন বস্ত্রসৃষ্টিতে কোন অধিকার তাদের ছিল না। ঔপনিবেশিক যুগে যেমন কৃষকের ফসল উৎপাদনে কোন স্বাধীনতা ছিল না। খাদ্যশস্য চাষ নয়, জোরপূর্বক নীল চাষ করতে বাধ্য করানো হয়েছিল কোম্পানী আমলে। কংগ্রেস সরকার স্বাধীন দেশের বুকে এক স্বৈরাচারী শাসনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছে। স্বৈরাচারী শাসনের ছত্রছায়ার ফ্যাসিবাদ পুত্রেপুষ্পে বিকশিত হয়েছিল। ভূস্বামী ও মহাজনী শোষণ ব্যবস্থা, মহাজনের লোলুপদৃষ্টি তাঁত শিল্পকে 'ছিবড়ে' করে ছেড়েছিল। স্বাধীন দেশের শাসনক্ষমতায় অধষ্ঠিত উপনিবেশবাদী শাসকদের সার্থক উত্তরসুরি ওরা।

মধ্যযুগে বিশ্বের বিস্ময় বাংলার মসলিনবস্ত্রের বাজার দখল করার জন্য ইংরাজরা একদিকে এদেশের তাঁতশিল্পীদের বিরুদ্ধে অন্যদিকে ফরাসী. পর্তুগীজ, স্পানিশ, ডেনিস, ডাচ প্রভৃতি উপনিবেশবাদী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। যুদ্ধ করতে হয়েছে হিন্দুস্তানের বিভিন্ন রাজ্যের রাজা নবাব আর শেষে ভারত সম্রাটের বিরুদ্ধেই। ইংলণ্ডের সম্রাটের বিশ্বব্যাপী উপনিবেশ সাম্রাজ্যের মধ্যমণি ছিল হিন্দুস্তান। সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ মসলিন। তাই সাম্রাজ্যকে সুরক্ষিত রাখার প্রয়াস সফল হলে চতুর্দিকে মসলিনের বাজারও দেশীয় নৃপতিদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ পরিচালনা করতে হয়েছে। বাজার দখলের জন্য মিশর ও সমগ্র পূর্ব পশ্চিম দক্ষিণ আফ্রিকায়, পূর্ব দিকে মালয়, বর্মায় সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য ইংরাজদের অস্ত্রধারণ করতে হয়।

ইংরাজ কোম্পানীর বহু পূর্বেই বাংলার মাটিতে পর্তুগীজরা পদার্পণ করেছিল। তাদের আচরণ ছিল জলদস্যুর মতো 'ফিরিঙ্গী' বণিক নামেই এরা অভিহিত হতো। প্রথমে এরাও এসেছিল পাদ্রী বেশে। ব্যাণ্ডেলে গীর্জা স্থাপন এদের কীর্তি। এরাও মসলিনও, সুতিবস্ত্রের ব্যবসা বাণিজ্য করতো এবং বাংলার বাইরে হিন্দুস্তানের বাইরে রপ্তানী করতো। কিন্তু ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যখন অষ্টাদশ শতাব্দীতে মসলিন বাজার দখল নিয়ে যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়েছিল তখন পর্তুগীজরা তো বটেই, ফরাসী ডাচ, ফরাসী, ডাচ, ডেনিস, স্পানিশরাও ইংরাজদের পিছু নিয়েছিল। ফরাসী পাদ্রীরা ফ্রান্সে থেকে পূর্বেই এদেশে পৌঁছে গিয়েছিল। ইউরোপীয় বণিকদের পূর্বসুরী এশিয়ার আর্মেনিয়া দেশ দেখে আর্মেনিয় পাদ্রীরাও বাংলায় এসে গীর্জা নির্মাণ শুরু করেছিল।

বাংলায় যখন আরও সুদূর অতীতে স্বাধীন মুসলিম রাজাদের রাজত্ব ছিল তখন তাদের বশ্যতা স্বীকারের জন্য দিল্লীর বাদশাহরা এই প্রদেশে প্রেরণ করেছিলেন ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে গড়ে তোলা 'আউলিয়া'দের দলে দলে। তাদের পিছনে পিছনে রওনা

দিয়েছিল সৈন্য বাহিনী সহ যুদ্ধবাজ সেনাপতিরা। ইউরোপ থেকে এই ভাবেই বিশেষতঃ ফরাসী, পর্তুগীজ পাদ্রীরা ইংরাজ পাদ্রীদের আগেভাবেই এদেশের বুকে এসে উপস্থিত হয়। ফরাসীরা বার্মায় ইংরাজদের পূর্বেই পৌঁছে গিয়েছিল। যখন তারা প্রচার করতে থাকলো যে তারা ব্যাঙ্ক খুলবে, রেললাইন বসাবে, খনির কাজ করবে তখন ইংরাজদের টনক নড়লো। এদেশের বুকে তাদের কায়েমী স্বার্থ যাতে অটুট থাকে ভোগ্য পণ্য ও বাণিজ্যিক পণ্যের বাজারের ওপর দখল বজায় থাকে তারই জন্য তারা বারংবার তামাম হিন্দুস্থানের বুকে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দী ব্যাপী যুদ্ধ বিগ্রহে জড়িয়ে পড়ে, নানান বিদ্রোহ দমনের জন্য ইংরাজ কোম্পানী সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে। এভাবেই ভারত উপনিবেশে ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মসলিন যুদ্ধে বিজয়ী হয়। বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষে দক্ষ হস্তচালিত তাঁতশিল্পীদের সঙ্গে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ ও অন্যান্য ইউরোপীয় বণিক ও শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে যখন 'মসলিন নিয়ে যুদ্ধ' চলছিল সেই সময় কালের ঘটনাবলীর আরও তথ্যানুসন্ধান প্রয়োজন।

বাংলা প্রদেশে ভিটা থেকে উৎখাত হওয়া কৃষক ও তন্তুবায়ী পরিবারগুলোর মৃত্যুবরণ অথবা বিদ্রোহে যোগদান করা বা সন্ন্যাসী, ফকির, বাউল বা ভবঘুরের দল গ্রাম ছাড়া হলো সেই স্থান পূরণ করলো জলা জঙ্গলের বিভীষিকা। জনবহুল গ্রামগুলিতে দিবালোকেই হিংস্র ব্যাঘ্রের দর্শন মিলতো। শ্বাপদসঙ্কুল গ্রামগুলোর অধিকার, সমস্ত জমিজিরেতের অধিকার অর্পিত হয়েছিল ভূস্বামী জোতদার বা মহাজন শ্রেণীর হাতে। ক্ষমতা ও সম্পদের কেন্দ্রীভবন ঘনীভূত হলো। এই সময়েই দেখা দিয়েছিল বঙ্গীয় বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে শিক্ষা ও সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে রেনেসাঁসের আন্দোলন। জমিদাররা সেই আন্দোলনে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে কেউ প্রগতিশীলতার পক্ষে কেউবা বিপক্ষের স্রোতে দাঁড়ে টান দিয়েছে নিজেদের শ্রেণীচরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখার তাগিদে। উচ্চবর্ণের প্রতিনিধিত্বের পরিচয় ছিল অক্ষুণ্ণ। ইংরাজদের ভাষা, ও সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলা ও সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন নিয়ে আলোড়িত বঙ্গ সমাজে ব্রাত্য হয়েছিল গ্রামীণ কারিগর কুলচূড়ামনি তন্তুবায়ীগণ।

সমাপ্ত